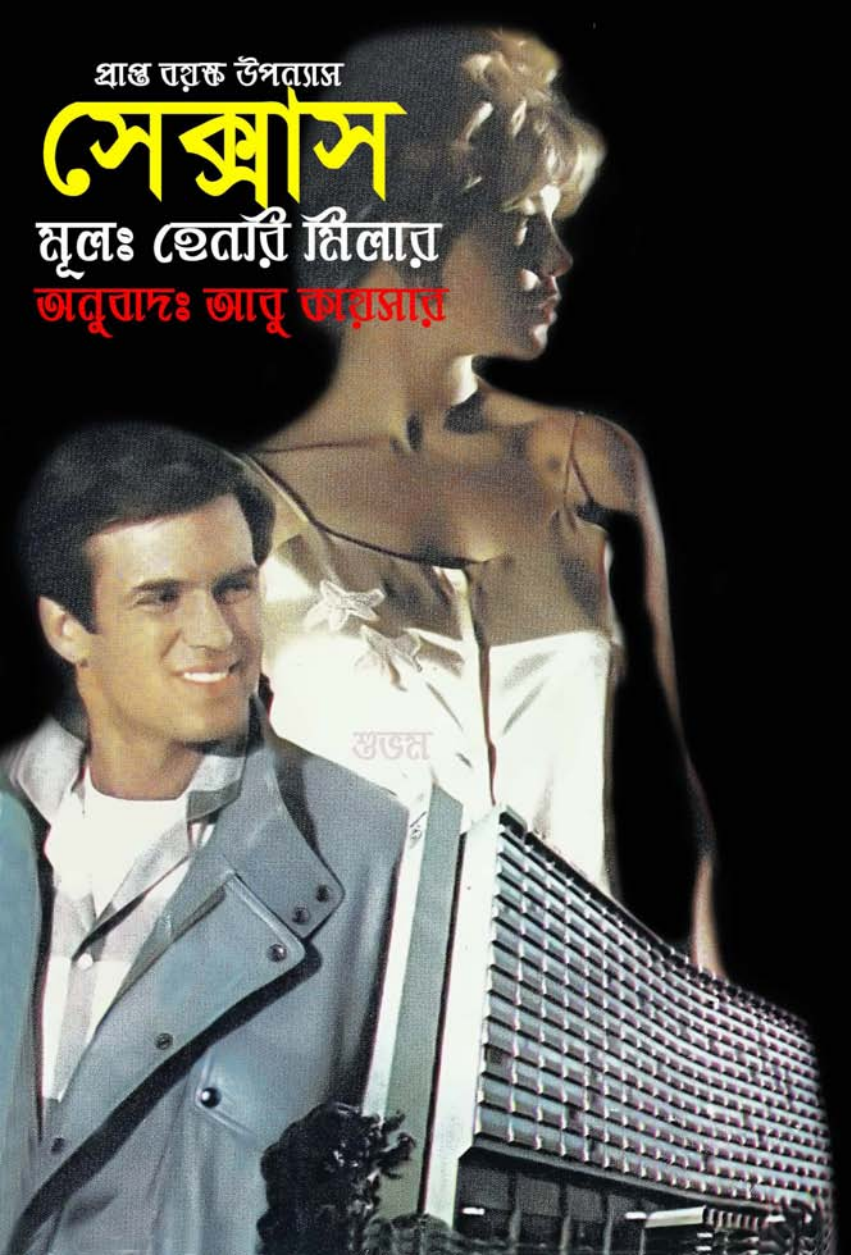
প্রাপ্ত বয়স্ক উপন্যাস

সেক্সাস

মূলঃ হেনরি মিলার

অনুবাদঃ আবু কাওসার



প্রাপ্ত বয়স্ক উপন্যাস

সেক্সাস

মূলঃ হেনরি মিলার

অনুবাদঃ আবু কায়সার

সেক্সাস। নামেই যার পরিচয়। হেনরী মিলারের 'দি রোজি ক্রুশিফিক্সিয়ন' শীর্ষক ট্রিলজির প্রথম এবং স্বয়ং সম্পূর্ণ উপন্যাস 'সেক্সাস' বহু ভাষায় অনূদিত হয়ে লাখ লাখ কপি বিক্রি হলেও বাংলা ভাষায় এই প্রথম। বিষয়বস্তু এবং আঙ্গিকের দিক দিয়ে সেক্সাসের জুড়ি নেই।

সমালোচকদের তুখোর সমালোচনায় অতিরিক্ত যৌন-বিবরনের অভিযোগ এনে বইটিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলেও গুনীজনদের চাপে সেই ঘোষণা প্রত্যাহার করা হয়।

প্রসাদগুন সম্পন্ন এ উপন্যাসে শিল্পময়তার সঙ্গে উন্মোচিত হয়েছে মানব মানবীয় জীবন-রহস্য।

প্রসাদ-নগরী নিউ ইয়র্কের পট-ভূমিতে লেখা এই উপন্যাসে অকপটে বিধৃত হয়েছে সদ্য ত্রিশোত্তর এক মার্কিন যুবার দৈনন্দিন রেখাচিত্র। যৌনতায় সে স্বতস্ফূর্ত। কিন্তু দেহ-সর্বস্ব নয়। নারীর শীৎ-কারের ভিতর থেকে সে চয়ন করে নেয় সোনালি সিংহের জীবন-দর্শন।

শুধু মাত্র প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য

সেক্সাস

হেনরী মিলার

ভাষান্তর আবু কায়সার

(দ্য রোজি ক্রুশিফিক্সিয়ান ট্রিলজীর প্রথম উপন্যাস)



প্রকাশকাল :
ফেব্রুয়ারী ১৯৮৭

অনুবাদস্বত্ব প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রকাশক

অধুনা প্রকাশনের পক্ষে
ফরিদ আহমেদ
২০ শেখ সাহেব বাজার
আজিমপুর, ঢাকা—১২০৫

মুদ্রণ :
সুরমা আর্ট প্রেস
ঢাকা

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা :
হামিদুল ইসলাম

দাম :
২০ টাকা

পরিবেশক :
কারেন্ট নিউজ, ঢাকা কলেজ গেট, ঢাকা। ষ্টুডেন্ট ওয়েজ, ডানা পাবলিশার্স, বিদ্যাপ্রকাশ, বড়াল প্রকাশনী বাংলাবাজার ঢাকা। এ-ছাড়াও দেশের সর্বত্র লাইব্রেরী, ম্যাগাজিন কর্নার ও বুকস্টল-সমূহে পাওয়া যায়।

নিবেদন

তাঁর মতো আর কাউকে নিয়ে এতো বিতর্কের ঝড় ওঠেনি লেখার জগতে। তাঁর মতো আর কেউ সমকালীন মার্কিন সমাজের গোপন, যৌনতা আক্রান্ত দিকগুলো এমন দুঃসাহসী ভাবে তুলে ধরতে পারেনি। মধ্য ষাটে এক বৃদ্ধ যাজক উত্তেজিত হয়ে এক সমাবেশে চিৎকার করে বলেছিলো, 'এই বেজন্মা লেখক আমাদের যুব সমাজকে নষ্ট করছে। তাদের দেখাচ্ছে পাপের রাস্তা। এ এক অশুভ ব্যাপার।'

এক শিক্ষক সমাবেশে তাঁর নামে নিন্দাবাদ নেয়া হলো এই বলে যে, টিন এজের ছেলে মেয়েরা তার উত্তেজক লেখায় অনুপ্রাণিত হয়ে অনায়াসে নিষিদ্ধ জীবনের প্রতি আগ্রহী হচ্ছে।

অন্য দিকে দক্ষ সমালোচকরা বল্লেন—এই লেখক একজন চিকিৎসকের মতো। আমাদের গোপন রোগকে চিহ্নিত করছেন। তিনি প্রকারন্তরে সমাজের মঙ্গলের জন্যে এসব পাপকে উন্মোচিত করছেন। কেননা সমাজে যতো বেশি খোলামেলা আলোচনা হয়, ততো বৃদ্ধি পায় উদারতা।

সব মিলিয়ে বিতর্কিত এক লেখকের নাম হেনরী মিলার। যার বই বিক্রির দিক থেকে সৃষ্টি করেছে এক অতুলনীয় রেকর্ড। পাঠকরা সাগ্রহ অপেক্ষা করেছে কখন তার নতুন বই প্রকাশিত

হবে। যা তাদের নিয়ে যাবে অন্য এক ভুবনে। সেই অতল অন্ধকারের জীবন। যেখানে শরীর সাড়াশীর মতো আনন্দের লোভে অন্য শরীরকে ধরে পেঁচিয়ে। মানুষ কি তাহলে রহস্যময় কোন জন্তু—যার চেতনা শুধু কাম তাড়িত। মিলার প্রবেশ করতে চেয়েছেন আরো গভীরে। কেন এই উন্মাদনা? কেন এই নীতি বিসর্জনের তুমুল পালা? কেন শিৎকারের শব্দে ভরে থাকা নারকীয় ভুবন? এক প্রবল যন্ত্রনায় অস্থির হয়ে সত্যাদেষ্টী লেখক মিলার দু'সাহসী নাবিকের মতো যাত্রা করেছেন জীবনের রহস্যময়তার দিকে। যদিও তার ব্যাপক অংশ জুড়ে নগ্ন শরীরের সোনালি উদ্ভাসন।

সমকামিতার মতো অস্বস্তিকর এক বিষয়কে পর্যন্ত মিলার তার অপূর্ব রচনা শৈলীর গুনে সাহিত্য পাঠের উপযোগী করে তোলেন। দুজন পুরুষ বন্ধুর মধ্যে অস্বাভাবিক সম্পর্ক তার কাছে এক গোপন আর্তি হয়ে ধরা দেয়।

মিলারের লেখাতে ছিলো সেই স্বাদু গুন যা মোহিত করে রাখে মানুষকে। তাই দোকানে লাইন দিয়ে লোকে কেনে তাঁর বই। বিক্রী হয়ে যায় গরম কেকের মতো।

একজন চিত্রাভিনেতার মতো জনপ্রিয়তা অর্জন করেন তিনি। একের পর এক লিখে চলেন মার্কিন সমাজের ভয়াবহ সব যৌনতার বিবরণ। ক্রুদ্ধ হয় পাদ্রীরা। বলে—এ লোক নষ্ট করছে তরুনদের। নোংরামোকে দিচ্ছে ছড়িয়ে। বিষাক্ত থাবার মতো হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে।

প্রচুর নিন্দাবাদের ঝড় বয়ে যায় তার উপর দিয়ে। কখনো

কখনো তার বিরুদ্ধে উচ্চারিত হয় ঘৃনা। কিন্তু প্রত্যয়ী মিলার জানেন তিনি ক্যানসার আক্রান্ত এক সমাজের ক্ষতকে চিহ্নিত করছেন।

তবে কি তার ভূমিকা চিকিৎসকের? নাকি প্রদর্শকের? এর উত্তর জানতেন শুধু মিলার।

প্রসাদগুন সম্পন্ন এই লেখকের জন্ম ব্রুকলিনে—১৮৯০সনে। পূর্ব পুরুষ জার্মান হলেও মিলারের জন্ম এবং বেড়ে ওটা আমেরিকায়।

মিলারের প্রায় প্রতিটি বই-ই প্রথম প্রকাশের সাথে সাথেই তুমুল ঝড় তোলে। অভিযোগ আসে অশ্লীলতার। এক সময় নিষিদ্ধ ঘোষনা করা হয়। আবার পাঠকদের চাপে প্রত্যাহার করে নেওয়া হয় সেই ঘোষনা। 'সেক্সাস' বইটিও এরকম নিষিদ্ধ উপন্যাসের একটি।

হেনরী মিলারের "দি রোজি ক্রুশিফিক্সিয়ন" শীর্ষক ট্রিলজীর প্রথম বই 'সেক্সাস'। বাকী বই দু'টি অর্থাৎ নেক্সাস ও প্লেক্সাস ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত হবে অধুনা থেকে।

পরবর্তীতে মিলারের অন্য বইগুলিও প্রকাশের আশা রাখে অধুনা।

১

ওর সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয় নাচের আসরে। বেস্পতি-বারের এক রাত্তিরে। অমন ধুন্ধুমারের পর দু'ঘণ্টার বেশী ঘুমোতে পারিনি। তার পর অফিস। দিনটা চলে গেলো যেন স্বপ্নের মতো। ডিনারের পর ঘুমিয়ে পড়লাম কৌচের ওপর। ঘুম ভাঙ্গলো সকাল ছ'টায়। মনটা ঝরঝরে লাগছে। একদম তরতাজা। মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে একটা চিন্তাই। যে কোন মূল্যেই হোক—ওকে পেতে হবে। পার্কের মধ্যে হাঁটা হাঁটি করতে করতে ভাবছিলাম, যে বইখানা ওকে পড়তে দেবো বলে কথা দিয়েছি, তার সঙ্গে কী কী ফুল পাঠাবো? আমি এইতো এবার পা দিয়েছি তেত্রিশ বছরে। এই বয়সেই ক্রুশবিদ্ধ হন যীশুখ্রীস্ট। আমার সামনে পড়ে রয়েছে আস্ত একটা নতুন জীবন। যে কোন রকম ঝুঁকি নেবার এই তো সময়। এখন আমি দাঁড়িয়ে আছি মইয়ের ঠিক পয়লা ধাপটিতে। সোজা কথায়—আক্ষরিক ভাবে ব্যর্থ।

সেদিন ছিলো শনিবারের সন্ধ্যা—সপ্তাহের যে দিনটিকে আমি শ্রেষ্ঠ দিন বলে মনে করি। অন্তত বিগত সাতটি বছর যাবৎ।

দিনটি সেরা দিন কেন, এ সম্পর্কে অবশ্য কোনো ধারনা আমার নেই। দিনটিকে মনে হতো গটনাবহুল। সেদিন যা খুশী তাই করা যায়। ভেঙ্গে চুরমার করা যায় সব কিছুই। বিশেষ করে বিনাশর্তে আত্ম সমপর্ণ করা চলে প্রিয়তমা নারীর কাছে।

সকালটা কাটালাম ডাইনে বাঁয়ে ধার করে। বই আর ফুল পাঠালাম ডাক যোগে। তারপর লেখতে বসলাম একটা মস্ত বড়ো চিঠি। এটি অবশ্য বয়ে নিয়ে যাবে একজন বিশেষ বার্তাবহ। আমি ওকে বলেছিলাম, দুপুর নাগাদ একবার টেলি-ফোন করবো। দুপুরের আগেই অফিস থেকে বেরিয়ে এলাম আমি। চলে গেলাম সোজা বাসায়। কিন্তু সময় যেন কিছুতেই কাটছিলো না। পাঁচটা অব্দি অপেক্ষা করা আমার জন্যে যেন সত্যি একটা অত্যাচার। পার্কের দিকে গেলাম। লেকের পানিতে বাচ্চারা ভাসিয়ে দিচ্ছে কাগজের নৌকা। দূরে কোথায় ব্যাণ্ড বাজছে। সে আওয়াজ আমাকে মনে পড়িয়ে দেয় শৈশবের স্মৃতি। অতীতের ক'জন বিশিষ্ট ব্যক্তির কথা মনে আসে, যাঁরা আমার এ বয়েসেই পেয়ে গেছেন প্রতিষ্ঠা। কিন্তু আমি? আমার আকাঙ্খা? সে সব কোন্ চুলোয় গেছে, কে জানে? আপাততঃ তার হাতে নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে সমর্পণ করা ছাড়া আমার কোনো উচ্চাশা নেই। সর্বো-পরি, আমি শুনতে চাই তার কণ্ঠস্বর। জানা দরকার, সে এ মুহূর্তে বেঁচে আছে। প্রমাণ পেতে হবে, সে আমাকে

ভোলেনি। দিনে একবার টেলিফোনে তার গলায় হ্যালো শোনাই আমার জন্যে যথেষ্ট। সে যদি তার কথা রাখে তাতেই আমি খুশি। দুনিয়ার আর কোথায় কী ঘটলো, তাতে আমার কিছুই যায় আসে না।

ঠিক পাঁচটার সময় তাকে টেলিফোন করলাম। কিন্তু মনটা ধক করে উঠলো। ওখানে অচেনা কণ্ঠস্বর। জানালো, সে বাড়িতে নেই। ভাবলাম, জিজ্ঞেস করি, ক'টার, সময় সে ফিরবে। কিন্তু ওপ্রান্তে রিসিভার রেখে দিয়েছে। ওর সঙ্গে কথা হচ্ছে না ভাবতেও যেন খারাপ লাগছিলো আমার। দুঃখে মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করছিলো আমার। বাসায় বউকে ফোন করেই জানালাম, রাত্রে বাসায় খাচ্ছিনা। জবাবে তার স্বভাব সিদ্ধ কটুবাক্যে সে আমাকে আপ্যায়িত করলো। এতে বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয় যে, আমি কোথায় খাই না খাই, তাতে তার কিছু যায় আসে না। 'গোল্লায় যা কুত্তী' চিবিয়ে চিবিয়ে উচ্চারন করলাম। মনে মনে বললাম, 'অতন্তঃ আমি তো জানি, আমি তোকে চাই না, তোর শরীরের একটা অংশও চাই না!' একটা ট্রলি এগিয়ে আসছিলো। কোন কিছু না ভেবেই তাতে উঠে পড়লাম। কিন্তু কোথায় যাবো ঠিক নেই। ট্রলিতে চড়ে ক'ঘন্টা ঘুরেছি তার হিসেব ছিলোনা। নদীর তীর ঘেষে দাঁড়ানো আরবী আইসক্রিম পার্লারটা দেখে জায়গাটা চিনতে পারলাম আমি। গোল্ডেন গেট ব্রীজের নীচে নৌচলাচলের শব্দ। ওপরে যান বাহনের

আওয়াজ। মনটা হতাশায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে। কিন্তু হাতে এখনো অনেকটা সময়। নাচের আসরে যাবার আগে আমাকে আরো অনেকটা সময় খরচ করতে হবে। কম্পাসবিহীন জাহাজের মতোই এলোমেলো পায়ে লক্ষ্যহীন হাঁটাহাঁটি করতে থাকলাম আমি। যেন শূন্যতার মধ্যে হাতড়ে বেড়াচ্ছে একটা প্রেত। বসা না বসা, সিগারেট খাওয়া বা না খাওয়া, শ্বাসপ্রশ্বাস নেয়া বা না—নেয়া সবকিছুই আমার কাছে মনে হচ্ছে নিরর্থক। সবকিছু সমান। তোমার পেছনের মরে পড়ে থাকা লোকটা তোমাকে মাড়িয়ে চলে যাচ্ছে। রিভলভারের গর্জন। আরেকটি লোক তোমার দিকে গুলি ছুঁড়ছে। তুমি মড়াটাকে ওঠালে। আশ্চর্য—লোকটার ফুসফুস কী সতেজ, শক্তিশালী। পূবে ও পশ্চিমে যান বাহন ছুটছে। এক মিনিটের ভেতর ওগুলো আবার উত্তর দক্ষিনে ছুটবে। সবকিছু চলছে সঠিক ভাবে, নিয়ম মাফিক। কিন্তু কোথাও পৌঁছুচ্ছে না। চারদিকে ওঠা আর নামা, এগুনো আর পেছুনো। এ কাজ ও কাজ সে কাজ। কতো হাজার ধান্দা। যেন তোমার মগজ বেরিয়ে আসবে। আগামীতে আমি যেন একটা শকুন হয়ে জন্মাই। যেন মৃত্যুর গন্ধ পাবার সঙ্গে সঙ্গে উঁচু উঁচু দালান গুলোর ওপর থেকে গুলির মতো ছুটে নিচে নামতে পারি। আমি এখন শিস দিয়ে বাজাচ্ছি একটি আনন্দ দায়ক সুর। আমি যেন বলছি: 'হ্যালো মারা! তুমি কেমন আছো?' আর সে দু হাত বাড়িয়ে আমার

দিকে হাসিমুখে এগিয়ে আসছে আমাকে উষ্ণ আলিঙ্গন করার জান্য। কিন্তু আসলে সে কোথায় এখন? নাচ কখন শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু কোথায় সে? সে কি বিছানায় শুয়ে শুয়ে বই পড়ছে? কোনো কৃতী যোদ্ধার সঙ্গে প্রেম করছে? নাকি সে একটা মাঠের ওপর এক পাটি জুতো পায়ে প্রান পনে দৌড়ুচ্ছে? কর্নকব নামের লোকটি অমন চোটপাট করছে কেন? সে কোথায় কি করছে—সে সম্পর্কে আমার কোনো ধারনাই নেই। এ ব্যাপারে আমি অন্ধকারে আছি। বস্তুতঃ নাচঘরে তার অনুপস্থিতি আমাকে দিশেহারা করে ফেলেছে। ওর চেনা কোনো মেয়েকে জিজ্ঞেস করবো কি, মারা কখন আসবে? কিন্তু যাকে জিজ্ঞেস করলাম, সে বললো, এ নামের কোনো মেয়েকে সে চেনেনা। সে তার নামই নাকি শোনেনি জীবনে। আর একটি মেয়েকে সে-ই জিজ্ঞেস করলো মারার কথা। মেয়েটির সঙ্গে খানিকটা নাচলাম। ওর নাম ফ্লোরি। মুখটা বড়ো। কিন্তু ঠাণ্ডা। মনে হয় সারা দুপুর সে প্লাবিত ছিলো যৌন সঙ্গমে। তার মতে মারার হয়তো আর কারো সঙ্গে ডেট রয়েছে অন্য কোথাও। ওই গ্রীকটাকে জিজ্ঞেস করলে কেমন হয়—সে ইঙ্গিত করলো। বললো—এ লোকটা দুনিয়ার সব খবর রাখে।

গ্রীকটা বললো, হ্যাঁ, মিস মারা আসবেন।...হ্যাঁ, এই অল্প কিছুক্ষন অপেক্ষা করুন। অপেক্ষা করতে লাগলাম আমি। মেয়েগুলো যেন তুষারাচ্ছাদিত মাঠের মধ্যে বাষ্প সৃষ্টি করে

চলেছে অবিরাম। মধ্যরাত। কিন্তু মারার পাত্তা নেই। আমি যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও—খুব শ্রান্ত শরীরে নাচঘরের দরজার দিকে পা বাড়ালাম। পুয়ের্টোরিকান ছোকরাটা ফ্লাইয়ের বোতাম লাগাচ্ছে সিঁড়ির প্রথম ধাপের ওপর দাঁড়িয়ে।

আমি আমার দৃষ্টি শক্তি পরখ করবার জন্যে দূরের বিজ্ঞাপন-গুলোর দিকে তাকালাম। আমার কি ঠিক মতো শ্বাস প্রশ্বাস বইছে? দুরু দুরু করছে বুক? আমার কি বাত হয়েছে গিঁঠে গিঁঠে!' সাইনাস ট্রাবল আছে কি নেই? পাইয়োরিয়াও কি নেই? তা হজম টজম ঠিক মতো হচ্ছে তো? অথবা লাঞ্চের পরে সেই ক্লান্তি। চোঁয়া ঢেকুর ওঠে কি? প্রচণ্ড প্রশ্রাবের বেগ? যতোদূর জানি, আমার এ সব কিছুই নেই। আমি একটা বোতামের মতোই সুস্থ। স্বাস্থ্যবান। তাহলে আমার অভাবটা কি? কোনো একটা জিনিস—হ্যাঁ, বেশ দরকারী জিনিষ আমার নেই।...

আমি প্রেমকাতর। এমন কাতর যে মনে হয়, আমি মরেই যাবো। যেন আমি বিষাক্ত খাবার খাওয়া একটা দিশাহারা ইঁদুর।

আমার শরীরটা বিছানায় পড়ে এক খণ্ড ভারী সীসের মতো। আমি শোবার সঙ্গে সঙ্গে ডুবে যাই গভীরতর এক স্বপ্নের মধ্যে। রোববারের সকাল। আমি ঘুম থেকে উঠলাম একটা টাটকা ডেইজির মতোই। সারাটা দুনিয়া আমার পায়ের তলায়। অনাবিস্কৃত পৃথিবী। আর্কটিক অঞ্চলের মতোই কুমারী। আমি

সোজা চলে যাবো তাদের বাসায়। টিপে ধরবো দোরঘন্টি। দরজা খুলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আমি ঢুকে পড়বো অন্দর মহলে। বলবো, এই যে আমি। আমাকে নাও অথবা আমার বুকে ছুরি মারো। ছুরি মারো হৃদপিণ্ডে, মস্তিষ্কে, ফুসফুসে, মুত্রাশয়ে, পরিপাকযন্ত্রে, চোখে, কানে। একটি প্রত্যঙ্গও যদি বাদ পড়ে যায়, তাহলেই তুমি শেষ। অন্ততঃ আমার কাছে। এই পৃথিবীতে তো বটেই, আগামী পৃথিবীতেও। এমন কি যতোবার পৃথিবী সৃষ্টি হবে, ততবার। আমি প্রোমোন্মত্ত। আমি খেয়ে ফেলি চুল, ময়লা মোম, শুকনো রক্ত—অর্থাৎ তুমি যা কিছু তোমার নিজের বলে মনে করো। তোমার বাবাকে দেখাও। দেখাও তাঁর ঘুড়ি গুলো, তাঁর রেসের ঘোড়াগুলো। নাট্যশালা গুলোর জন্যে তাঁর যে ফ্রী পাশগুলো রয়েছে তা-ও দেখাও। আমি ওসব খেয়ে ফেলবো। জ্যান্ত খেয়ে নেবো। তুমি যে চেয়ারটিতে বসো, সেটি কোথায়? কোথায় তোমার প্রিয় চিরুনী, টুথব্রাশ? নেলপলিশ গুলোই বা কোন্ জায়গায়! সবকিছু এক জায়গায় জড়ো করো, যাতে আমি গপ্ করে তা একেবারে গিলে ফেলতে পারি। তুমি বলে থাকো, তোমার একজন বোন আছে, যে তোমার চেয়ে সুন্দরী। তাকে নিয়ে এসো আমার সামনে। আমি তার হাড়ের ভেতর থেকে মজ্জা শুষে শুষে খেতে চাই।

ওদের বাড়ির কাছাকাছি গিয়ে দেখি এক মহিলা কাপড় মেলে দিচ্ছেন আঙ্গিনায়। তিনি আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকালেন।

কোনো সন্দেহ নেই, ইনিই সেই মহিলা, যাঁর অচেনা আর আশ্চর্য কণ্ঠস্বর আমি শুনতে পেয়েছিলাম টেলিফোনে। কিন্তু আমি তো তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাইনা। তিনি কে—তা জানবার ব্যাপারেও আমার কোনো আগ্রহ নেই। আমি হাঁটতে হাঁটতে যখন বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়ালাম, মহিলা ভেতরে চলে গেলো। আর হ্যাঁ সেই সঙ্গে নিভে গেছে আমার সাহসও।

আমি দ্বিধাগ্রস্ত মনে দরজায় বেল টিপলাম। দরজা খুলে গেলো প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। বেরিয়ে এলো লম্বাটে চেহারার এক যুবক। সে নেই। জানিনা কখন ফিরবে। তুমি কে? তার কাছে কী দরকার? গুড্‌বাই এবং দড়াম্। আমার মুখের ওপর বন্ধ হয়ে গেলো দরজা। যুবক, এর জন্যে পস্তাতে হবে তোমাকে, বুঝলে? একদিন আমি আসবো একটা বন্দুক নিয়ে। তোমার অণ্ডকোষ বের করে ফেলবো।

কদিন চলে গেলো চুপচাপ। ওর তরফ থেকে কোনো সাড়া-শব্দ নেই। আমার বউয়ের রাঁধা বাড়ার কাজ শেষ হলে আমি রান্নাঘরেই লিখতে বসবো চিঠি। বড়ো বড়ো এক একটা চিঠি। আমরা তখন মস্তবড়ো এক অভিজাত বাড়িতে থাকি। বাদামী পাথরের সেই বাড়িতে আমরা ভোগ করছি পার্লার ফ্লোর আর বেশমেণ্ট। আমি বহুবার চেষ্টা করি চিঠি লিখতে কিন্তু বউটা লেগে আছে জোঁকের মতো। ওর চোখকে ফাঁকি দেয়া কি সোজা কাজ? তবে হ্যাঁ, সুযোগ এসেছিলো এক-

বার। দারুন সুযোগ। আমার তখন অসুখ। প্রচণ্ড জ্বর। আমি ডাক্তার ডাকতে দেই নি। খাইনি কোনো ওষুধপত্তর। ধারে কাছে ঘেষতে দিইনি বউটাকেও। বেশ কদিন ভুগলাম সেবার। ওপর তলার ঘরের কোণে প্রশস্ত এক বিছানায় শুয়ে কাটিয়ে দিলাম যেন একটা ঘোরের মধ্যেই। মারাত্মক ওই অসুখে আমি মরে যেতেও পারতাম।

সত্যি বলতে কি, ছেলেবেলা থেকেই আমি ছিলাম নীরোগ। তাই অভিজ্ঞতাটা হলো বেশ সুস্বাদু। বাথরুমে যাবার সময় মনে হতো জাহাজের ডেকের ওপর দিয়ে দুলতে দুলতে এগোচ্ছি। কী দুঃসহ অবস্থায় যে আমি দিনগুলো কাটালাম, তা আমিই জানি। তবে রান্নাঘর জায়গাটা আমি সহ্য করতে পারতাম। জায়গাটাকে মনে হতো জেলখানার আরাম-দায়ক সেলের মতো। নিজেকে মনে হতো কয়েদী। রাত্রে ওখানে বসে বসে আমি যেন কল্পনা করতাম, কিভাবে এই বন্দীশালা থেকে আমি পালিয়ে যাবো। এখানেও আমাকে মাঝেমধ্যে সঙ্গ দিতে আসতো বন্ধু ষ্ট্যানলি। আমার দুর্ভাগ্যের জন্যে তার যে কি কঁকানি!

এখানে বসেই আমি সবচেয়ে ক্ষ্যাপা চিঠিগুলো তাকে লিখতাম। যে কেউ নিজেকে পরাজিত, হতাশ, নিঃসম্বল বলে মনে করুক না কেন, সে আমার কাছ থেকে সাহস নিতে পারে। আমার আছে একটা দাগধরা কলম, এক বোতল কালি আর কাগজ—এই তো আমার এক মাত্র অস্ত্র। মাথায় যা কিছু

আসে, আমি তাই-ই লিখে ফেলতে পারি। তার কোনো অর্থ থাকুক আর নাই থাকুক। একটা চিঠি ডাকে ফেলে আমি চলে যেতাম ওপর তলায়। শুয়ে পড়তাম আমার স্ত্রীর পাশে। আমার দু'চোখের পাতা খোলা। অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে আমি নিজের ভবিষ্যত সম্পর্কে চিন্তা করতাম। নিজেকে বারবার এই বলে সান্তনা দিতাম, একটা মানুষ যদি আমার মতো সরল এবং বেপরোয়া হয়, একটা নারীকে ভালোবাসে মন প্রান উজাড় করে—যদি প্রেমিকার জন্যে নিজের কান কেটে খামে ভরে তা ডাকে ফেলতে পারে—সে যদি তার হৃদয়ের রক্তে কালি বানিয়ে চিঠি লিখতে পারে—সম্ভবতঃ প্রত্যাখ্যাত হবে না। ঘরকুনো, দুর্বল, ব্যাক্তিত্বহীন মানুষও জয়ী হতে পারে, যদি সে তার দেহের শেষ রক্ত বিন্দু উৎসর্গ করতে প্রস্তুত থাকে। প্রকৃত প্রেম কোনো নারীই প্রত্যাখ্যান করতে পারে না।

আবার আমি গিয়েছিলাম সেই ডান্স্-হলে। দেখি, আমার নামে একটা চিরকুট। ওর হাতের লেখা দেখেই আমার বুকটা ধক্ করে উঠলো। সংক্ষিপ্ত চিঠি—। যা বলা দরকার, কেবল সেটুকুই বলা আছে। ওইদিনই সে আমার সঙ্গে দেখা করবে মধ্যরাত্রে। টাইমস স্কোয়ারের একটি ওষুধের দোকানের সামনে। আমি যেন ওকে অনুগ্রহ করে বাড়ির ঠিকানায় চিঠি লেখা বন্ধ করি।

ওর সঙ্গে যখন আমার দেখা হলো, পকেটে আছে তিন

ডলারেরও কম। আমাকে পেয়ে সে খুব খুশী। কিন্তু আমি যে ওদের বাড়িতে গিয়েছিলাম, কিংবা বই এবং ফুল পাঠিয়েছি সে সম্পর্কে কিছুই বললো না। কিছুক্ষন নানা রকম কথাবর্তার পর সে জানতে চাইলো, আমি কোথায় যাবো? কিন্তু আমি এরকম কিছু আদপেই ভাবিনি। সে যে আমার সামনে সশরীরে দাঁড়িয়ে আছে, আমার সঙ্গে কথা বলছে আমার দিকে তাকিয়ে আছে এটাই ছিলো আমার জন্যে একটা অবিস্মরণীয় ঘটনা। কোথাও যাবার কথা ভাববার প্রশ্নই আসেনা। ও তখন যেন আমাকে উদ্ধার করতেই বললো 'তাহলে চলো জিমি কেলীর হোটেলে যাই।' সে আমার হাত ধরে এগিয়ে চললো সামনে দাঁড়িয়ে থাকা একটা ক্যাবের দিকে। আমি গাড়িতে উঠেই সীটে হেলান দিয়ে বসলাম। তার উপস্থিতিই যেন আমাকে গ্রাস করে নিয়েছে আপাততঃ। আমি তার গালে একটা চুমোও খেলাম না। এমনকি ধরলাম না হাতেও। সে এসেছে—এই তো যথেষ্ট। আর কি চাই।

সারারাত আমরা একসঙ্গে কাটালাম। সন্ধে থেকে ভোর-বেলা পর্যন্ত। সারারাত আমরা মগ্ন ছিলাম পানাহারে আর নাচে। খুলাখুলি কথাবার্তা হলো আমাদের মধ্যে। আমি ওর ভিতরের খবর প্রায় কিছুই জানতাম না। জানবার দরকারও অবশ্য ছিলোনা।

যখন বিল এলো, আমার তো মুছা যাবার অবস্থা! সময়ের

দাবী মেটাতে বহুবার মদের অর্ডার দিয়েছি। যখন আমি ওর কাছে হলফ করে বললাম যে, পকেটে মাত্র কয়েক ডলার সম্বল, ও তখন পারামর্শ দিলো, 'ওদেরকে তাহলে চেক দিয়ে দাও!' আমি বললাম, 'চেক বই নেই আমার।' আদপেই নেই। বেতন ছাড়া আর আমার কোনো সম্বল নেই। সংক্ষেপে গোটা ব্যাপারটা তাকে বুঝিয়ে বললাম আমি। যখন এসব দুঃখের কথা বলছি, হঠাৎ বিদ্যুৎচমকের মতো আমার মনে পড়ে গেলো একটা কথা। নিজেকে সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমা করে দিয়ে আমি টেলিফোন বুথে গিয়ে দাঁড়ালাম। টেলিগ্রাফ কোম্পানির হেডঅফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করে নাইট ম্যানেজারকে চাইলাম। সে আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। তাকে বললাম, গোটা পঞ্চাশেক ডলার দিয়ে এক্ষুনি কাউকে পাঠিয়ে দাও। আমি জানি, টাকাটা যোগাড় করা তার পক্ষে কষ্টকর নয়। তবে এটা সে বেশ জানে, যে আমি খুব একটা নির্ভর যোগ্য লোক নই। কিন্তু আমি তার কাছে একটা রোমহর্ষক গল্প ফেঁদে, প্রতিজ্ঞা করে বললাম সন্ধের আগেই টাকাটা ওকে শোধ করে দেবো।

অর্থ বাহকও শেষ নাগাদ পরিণত হলো আমার আর এক ঘনিষ্ট বন্ধুতে। বুড়ো ক্রেইটন। আগে ছিলো চার্চের পুরুত। এই রকম সময়ে এ ধরনের একটা জায়গায়, এ অবস্থায় দেখে তার চক্ষু তো চড়কগাছ। প্রায় ফিস ফিস করে সে আমার কানে কানে বললো, 'পঞ্চাশ ডলারে হবে? নাকি আরো

কিছু দরকার। লাগলে আমার নিজের নিকট থেকে আরো কিছু দিতে পারি। তোমাকে উপকার করতে পারলে আমি খুবই আনন্দিত হবো।'

তা কতো দিতে পারো? পরবর্তী প্রয়োজনের কথা চিন্তা করে আমি জিজ্ঞেস করলাম।

: আরো পঁচিশ ডলার আমি দিতে পারি।—জবাব ক্রেইটেনের। টাকাটা আমি নিয়ে নিলাম। ধন্যবাদ জানালাম বারবার। হোটেলের বিল দিলাম মিটিয়ে। বেয়ারাকে দিলাম লোভনীয় বকশিস। হ্যাণ্ড সেক করলাম ম্যানেজারের সঙ্গে। আরো মেলালাম অ্যাসিসটেন্ট ম্যানেজার, বাউন্সার, হ্যাট চেক গার্ল, ডোর ম্যান এমনকি একটা ভিখিরির সঙ্গেও। তারপর চেপে বসলাম একটা ক্যাবে। গাড়ির চাকা ঘুরে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আবেগে আমার ওপর চড়াও হলো মারা। তারপর শুরু হলো এক অন্ধ সঙ্গম। গাড়ি যখন ছুটে চলেছে, আমাদের দুজনের দাঁতে দাঁতে তখন ঠোকাঠুকি, জিহ্বায় জিহ্বায় কামড়াকামড়ি এবং তার শরীর থেকে রস গাড়াচ্ছে গরম সুপের মতো। নদীর অন্য পারে, আমরা যখন খোলা মেলা প্লাজা পেরুচ্ছি তখন ভোর হচ্ছে। আমি বললাম, 'সকাল হয়ে এলো মারা!' সেই সঙ্গে চাইছিলাম আলিঙ্গন মুক্ত হতেও। কিন্তু মারা চেঁচিয়ে উঠলো 'রোসো রোসো!' সে যেন ভিক্ষে চাইছে, তার গলার আওয়াজ ঠিক সেই রকম। সে আমাকে এমন শক্ত ভাবে আঁকড়ে ধরলো, মনে

হলো, আমার শিরাটি ছিঁড়ে যাবে। হঠাৎ যেন বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতোই তার ক্লান্ত শরীরটা ছিটকে পড়লো সীটের কোনায়। তার কাপড় চোপর তখনও স্তূপাকার হয়ে আছে নিজেরই পায়ের ওপর। আমি আবার উবু হয়ে ওর ওপর শুয়ে পড়লাম। জড়িয়ে ধরলাম সজোরে। তারপর তার ভিজে যোনির মধ্যে চালিয়ে দিলাম আমার হাত। সে আমাকে জড়িয়ে ধরলো জোঁকের মতো। আমি অনুভব করলাম, গরম রসে ভেসে যাচ্ছে আমার আঙুল গুলো। আমার চারটে আঙুলই ভিজে সপ্ সপ্ করছে একেবারে। দু'থেকে তিনবার তার রেতঃপাত ঘটলো। অতঃপর কিছুটা শান্ত মনে হলো তাকে। ফাঁদে পড়া হরিনীর মতো ক্লান্ত চোখ তুলে সে আমার দিকে তাকিয়ে হাসলো।

কিছুক্ষন পর সে তার আয়না বের করে পাউডার লাগাতে শুরু করলো মুখে। হঠাৎ দেখলাম, বাইরে কিছু একটা দৃশ্য দেখে তার মুখ ছাইয়ের মতো ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে সে। হাঁটু মুড়ে সীটের ওপর সে উচু হয়ে বসে পড়লো। বললো, 'খবরদার, পেছন দিকে তাকাবে না—কে যেন আমাদের ফলো করছে!' কিন্তু আমি তখন যেমন তৃপ্ত, তেমনি ক্লান্ত। ওর হুঁশিয়ারীতে সাড়া দেবার মতো অবস্থা আমার তখন নেই। উপরন্তু, ওর এই হাবভাব দেখে ওকে হিস্টিরিয়াগ্রস্ত বলেই মনে হলো আমার। আমি মুখে কোনো কথা না বললেও ওর ভাবভঙ্গী লক্ষ্য করছিলাম

বেশ মনোযোগের সঙ্গে। সে হাত মুখ ঝাঁকিয়ে ড্রাইভারকে কখনো এদিকে কখনো ওইদিকে ঘোরাতে বলছে গাড়ি। চালাতে বলছে জোরে, আরো জোরে। 'প্লিজ, প্লিজ,।' সে মিনতি করছে বারবার। যেন জীবন মৃত্যু নিয়ে সমস্যা। শুনলাম, ড্রাইভার বলছে, যেন অনেক দূরের কোনো স্বপ্নের গাড়ি থেকে বলছে, 'লেডি, স্পিড আর বাড়াতে পারবো না।··· ব্যাপারটা কি জানেন, মানে ঘরে আমার বউবাচ্চা রয়েছে। আমি দুঃখিত!'

আমি ওর হাত ধরে আস্তে একটা চাপ দিলাম। সে যেন গর্ভপাতের যন্ত্রনায় আর্তনাদ করে উঠলো, 'তুমি জানোনা···কী ভয়ানক বিপদ।' কিন্তু বিপদটা যে কী—তার বিপদ ব্যাখ্যার আবদার জানানোর সময় এটা নয়। হঠাৎ আমার চেতনা হলো, আমরা বিপদে পড়ে গেছি। কিন্তু ভালোভাবে লক্ষ্য করে দেখলাম, কেউ আমাদের পেছনে আসছে না। যারা আসছে, তারা অন্য লোক। তবে কেউ যে পিছু লেগেছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সে অপরাধ করেছে। সাংঘাতিক অপরাধ। এবং সম্ভবত এরকম অপরাধ সে আরো করেছে। সে আমাকে কিছুই বলেনি। হয়তো মিথ্যে বলেছে সে আমাকে। আমি খুব সম্ভব একটা দানবীর প্রেমে পড়েছি। এক রাজসিক দানবী! যেরকম দানবীর কথা কল্পনাও করা যায় না। ওকে এক্ষুনি আমার পরিত্যাগ করা উচিত। পালানো উচিত একটিও বাক্যব্যয় না করে। কোনো রকম

ব্যাখ্যাদান ব্যতিরেকে। নইলে আমি ধ্বংস হয়ে যাবো। সে এক অতল নদী। তাকে ভেদ করা অসম্ভব। আমার জানা উচিত ছিলো, পৃথিবীর একমাত্র যে মেয়েটিকে ছাড়া আমি বাঁচবো না, সে রহস্যময়ী। পালাও, শিগগীর পালাও··· লাফিয়ে পড়ো···নিজেকে বাঁচাও।

লক্ষ্য করলাম, আমার পায়ের ওপর ও হাত রেখেছে। মুখখানা এখন ঝলমল করছে। চোখ দুটো খোলা। কী রকম নিস্পাপ সে চাহনী! কল্পনা করা যায়না।—'ওরা চলে গেছে!'—সে বললো, 'আর কোনো চিন্তা নেই!'

কিন্তু আমি তো জানি, চিন্তা আছে। আর দুশ্চিন্তার তো সবে শুরু। মারা, মারা, আমাকে তুমি কোথায় নিয়ে যাচ্ছ? বাড়িতে পৌঁছবার আগে সে ড্রাইভারকে থামাতে বললো গাড়ি। আমরা দুজনে রাস্তায় নেমে মুখোমুখি দাঁড়ালাম। আলিঙ্গনাবদ্ধ। দুজনের হাঁটুতে হাঁটু লেগে আছে। আর অবিরাম প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছ এক বৈদ্যুতিক স্রোত। আমরা যেন প্রাচীন উপন্যায় মগ্ন। এভাবেই কেটে গেলো বেশ কয়েক মিনিট। নীরবতা ভেঙ্গে যাচ্ছে মোটরের যান্ত্রিক গুঞ্জনে।—'আমি কাল তোমার কাছে ফোন করবো।'—মারা বললো কাঁপা কাঁপা গলায়, আমাকে অরো জোরে জাপ্টে ধরে। তারপর আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিস ফিস করে বললো—'দুনিয়ার সবচেয়ে আশ্চর্য মানুষটির প্রেমে পড়েছি আমি। তুমি আমাকে ঘাব্‌ড়ে দিয়েছো,

তুমি কতো ভালো। আমাকে আরো একটু শক্ত করে চেপে ধরো না……আমাকে সব সময় বিশ্বাস করবে……আমার মনে হচ্ছে আমি যেন আছি ঈশ্বরের সান্নিধ্যে!'

দু'এক ঘণ্টা জিরোবার পর আবেদনপত্র-প্লাবিত অফিসে গিয়ে হাজির হলাম আমি। টেলিফোন গুলো বেজে চলেছে যথা-রীতি। কাজেকর্মে আদপেই মন নেই আমার। কসমোকক্কিক টেলিগ্রাফ কোম্পানির কর্মকর্তরা আমার ওপর ইতিমধ্যেই বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে। আর আমিও তার, খাম্বা, কপি-কল ইত্যাদিতে ছেয়ে ফেলা ওদের পেল্লায় কাণ্ডকারখানার ওপর হারিয়ে ফেলেছি আস্থা। এ চাকরির বেতনটাই আমার কাছে আকর্ষণীয়। আর বোনাসের কচকচি—যদিও তা কোনোদিন পাওয়া যায়নি। আর একটা লোকের প্রতিও মনোযোগ ছিলো আমার। নাম তার স্পীভাক। যাকে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের গোপনে গোয়েন্দা গিরি করার জন্যে অন্য শহর থেকে এখানে বদলী করা হয়েছে। আমার অষ্ট-পহরের দুশ্চিন্তা ছিলো, কী করে ব্যাটাকে ছাঁটাই করা যায়। আমি ওর ওপর এমন রেগে আছি যে প্রায়ই ভাবি, ওকে ছুরি মারবার জন্যেই আমাকে অরো কিছুদিন এখানে চাকরি করতে হবে। আমি দুনিয়ায় মিথ্যা-ঠিকানায় যতো রাজ্যের কাল্পনিক টেলিগ্রামের গোছা দিয়ে স্পীভাককে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মারি। আমি লোক ঠিক করলাম এমন কিছু, যারা ওকে হুমকি দিয়ে চিঠি লিখতো। প্রানের হুমকি পর্যন্ত। আমার পয়লা

নম্বরের চামচা কার্লি তো ওকে মাঝে মধ্যেই এই মর্মে টেলি-ফোন করতো যে ওর বাড়িতে আগুন লেগে গেছে অথবা ওর বউকে পাঠানো হয়েছে হাসপাতালে। সেই দুঃসংবাদ পেয়ে স্পীভাকের সে কি দৌড়োদৌড়ি। ওহ, ভাবা যায়না। অবশ্য এ জন্যে কার্লিকে এটা ওটা উপহারও দিতে হতো আমার। এই ধরনের দুষ্টবুদ্ধি আমার ছেলেবেলা থেকেই। বাবার যখন দর্জির ব্যবসা—তখন থেকেই। পাওনাদার যখন দীর্ঘদিন বাকি টাকা দিতো না—বাবা আমাকে লক্ষ্য করে বলতেন, এ ব্যাটা আর টাকা ফাকা দেবে না। ওর নামটা বাকির খাতা থেকে কেটে দাও এখন। কিন্তু তখন আমার মনে হতো সেই বুড়ো রেড ইণ্ডিয়ান বীরের কথা, যে বুড়ো পুরনো বন্দীকে পুত্রের হাতে তুলে দিয়ে বলছে—'বাবা আনামুখো, ওকে নিয়ে কাজে লাগিয়ে দাও তো!' মানুষকে হেনস্থা করার হাজার রকম পদ্ধতি আমার জানা ছিলো। যাদের আমি অপছন্দ করতাম, তাদের ওপর আমার বিচিত্র ধরনের উৎপাত থাকতো অব্যাহত। আমি একবার এক পাওনাদারের কাছে খুবই অপ-মানসূচক এক চিঠি লিখি। তার ভাষাই যে কেবল কদর্য ছিলো, তা নয়! চিঠির কাগজের ওপর মাখানো ছিলো পাখী, কুকুর, বিড়াল এবং মানুষের বিষ্ঠা। চিঠিটা খাম খুলে বের করার সঙ্গে সঙ্গে লোকটা অজ্ঞান হয়ে পড়ে। তারপর সে মারা যায়। এখন আমার এই রকমের নতুন টার্গেটটি হচ্ছে স্পীভাক। আমার অফিসের দায় দায়িত্বের মধ্যে প্রধান কাজই

হচ্ছে স্পীভাককে শায়েস্তা করা। অবশ্য আমরা যখন মুখোমুখি হই, তখন আমার অমায়িকতার তুলনা কোথায়? যেন তার সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্যে আমি মুখিয়ে আছি। ওর প্রতিটি কথাই যদিও আমার রক্ত গরম করে দেয়; কিন্তু আমি বিন্দুমাত্র রাগ দেখাই না। আমি পরে শোধ তুলি কড়ায়-গণ্ডায়। এবং নীরবে।

দুপুরের দিকে মারা টেলিফোন করলো। কথাবার্তা চললো। তা সিকি ঘণ্টা তো হবেই। আমার মনে হলো, সে আর কখনো রিসিভার তুলে রাখবে না। সে আমার চিঠিগুলো পড়েছে। সে তার খালাকে ক'খানা চিঠি পড়ে শুনিয়েছে জোরে জোরে। কোনো কোনো চিঠির আবার অংশ বিশেষ। খালার বিশ্বাস, আমি নিশ্চয়ই একজন কবি। আমার টাকা ধার করার ব্যাপারটা তাকে পীড়া দিয়েছে। আমি কি টাকাটা শুধিয়ে দিতে পারবো, নাকি সে-ই কোথাও থেকে ধার টার করে দেবে? আমি গরীব হলেও আমার বড়োলোকী চালচলন তাকে বিস্মিত করেছে। তবে আমি গরীব বলে সে খুশিই। এবারে ট্রলিতে চেপে কোথাও বেড়াতে যেতে হবে। নাইট ক্লাবের ব্যাপারে তার কোনো দুর্বলতা নেই। সে গ্রামে গিয়ে বেড়াতে খুব পছন্দ করে। অথবা সমুদ্র তীরে। বইটা দারুন। আজই ভোরবেলা পড়তে শুরু করেছে। আমি কেন লিখতে চেষ্টা করিনা? তার দৃঢ় বিশ্বাস, আমি রচনা করে বসবো একটি মহাগ্রন্থ। তার মাথায় এই বইটির ব্যাপারে একটা আইডিয়া

এসেছে—দেখা হলে বিস্তারিত বলবে। আমি যদি চাই, তবে সে তার চেনাজানা ক'জন লেখকের সঙ্গে আমাকে আলাপ করিয়ে দিতে পারে। তারা আমাকে স্রেফ সাহায্য করতে পারলেই বর্তে যাবে।...

বাপরে বাপ। কথা তো নয়—কথার স্রোত। ওর কথার তোড়ে আমি একই সঙ্গে চমৎকৃত ও শিহরিত হচ্ছিলাম। তার লিখিত বাক্যের সঙ্গে আমি পরিচিত। তবে চিঠিপত্র সে কম লেখে—। অন্ততঃ সে এরকমটাই মনে করে। তার ভাষা সাবলীল, স্বতস্ফূর্ত। এমন ঝলমলে সে বাক্যবন্ধগুলো—যা সাজাবার ক্ষমতা একজন লেখককেও অনেক চেষ্টার পর অর্জন করতে হয়। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার, ওর প্রথম দিকের চিঠিগুলো ছিলো অপটু হাতের আপ্রান চেষ্টার নমুনা। পয়লা চিঠিটা তো ছিলো ভীষন কাঁচা। একেবারেই শিশু সুলভ।

টেলিফোনে তার কথাগুলো আমার ভেতরে এক অভাবিত আলোড়ন সৃষ্টি করলো। সাধারনত, ডিনারের পর পরই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়া আমার স্বভাব। কিন্তু আজ ব্যতিক্রম ঘটলো সে নিয়মের। আমি অন্ধকারে কৌচের ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে নানা কথা চিন্তা করতে লাগলাম। 'তুমি কেন লিখতে চেষ্টা করোনা?'—এই বাক্যটি আমাকে যেন কুরে কুরে খেতে লাগলো। সারাটা দিন ই এই শব্দগুলো আমার কানে বারবার বেজেছে। এমনকি অনেক ধানাই পানাইয়ের পর বন্ধু ম্যাগ গ্রেগরের কাছ থেকে দশ টাকা হাতিয়ে যখন

ধন্যবাদ জানাচ্ছিলাম—তখনো যেন শুনতে পাচ্ছি 'তুমি কেন লিখতে চেষ্টা করোনা!'

তা, এই লেখালেখির ব্যাপারটা আমার মধ্যে কবে এলো। গত দশ বছরে আমি খুব সম্ভব দশ লাখের মতো শব্দ লিখেছি। অবশ্য তুমি একে বলতে পারো দশ লাখ ঘাসের ডগা। এই অকিঞ্চিৎকর সৃষ্টির দিকে অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করা কষ্টকর। হাস্যকরও খুব সম্ভব। বন্ধু বান্ধবদের সবাই আমার লেখালেখির ব্যাপারটা জানে। ধরা যাক এড গাভানির কথাই। তার ইচ্ছে ছিলো সন্ন্যাসী হবে। তার বাড়ীতে সে আমার পরিচিতি সভা ডেকেছিলো। সাহিত্যের মতো মহৎ শিল্পের প্রতি তার আগ্রহের প্রমান পেতাম আমার প্রতি তার আকর্ষণের মধ্যে দিয়েই। প্রায়ই সে আসতো আমার কাছে। নিয়ে আসতো ঠাণ্ডা স্যাণ্ডউইচ, আপেল আর বীয়ার। কখনো কখনো পকেট ভর্তি করে নিয়ে আসতো চুরুট। তার মধ্যে যদি এক আউন্স প্রতিভাও থাকতো, তাহলে সে কখনো একটা সন্ন্যাসী হবার স্বপ্ন দেখতো না।...

জ্যাবরাওস্কী ছিলো কসমোডেমোনিক টেলিগ্রাফ কোম্পানির পাগলাটে অপারেটার। সে সব সময় পরখ করতো আমার জুতো, টুপি আর ওভার কোট। কী ব্যাপার? না, সে দেখতো, সেগুলো ছিঁড়ে বা ফেটে গেছে কিনা। সে পড়া-টড়ার ধারও ধারতো না। আমি কী লিখি, কীরকম লিখি—তা নিয়ে তার কোনো মাথাব্যথাই ছিলোনা। তবে আমি যে লিখি

—সেই কথাটি শুনতে তার ভালো লাগতো। তার উৎসাহ ছিলো ঘোড়ায়। অর্থাৎ কিনা, অশ্বে। ওর সঙ্গে কথা বলবার ব্যাপারটা আমার কাছে ছিলো উত্তেজনাকর। কেননা ওসময় আমার মনে হতো, আমি কথা বলছি চাঁদের বাশিন্দার সঙ্গে। বলতে হয় ইয়র্কভিল থেকে আসা দেবতুল্য কেরানী কষ্টি-গনের কথাও। পুরনো পয়সার মতোই খাঁটি আর নির্ভর যোগ্য মানুষ। 'পুলিস গেজেটে'র একজন লেখকের সঙ্গে নাকি তার চেনাজানা ছিলো। এমন চমৎকার এক একটা গল্প সে বলতো, যা লিখে পাঠালে ম্যাগাজিনগুলো লুফে নেবে। কোম্পানীর মঙ্গল চিন্তায় লোকটা বিনিদ্র রজনী যাপন করতো। ওর বউ তিল্লি জুপিটারকে বলা চলে জলজ্যান্ত ক্যাকটাস। কিন্তু সেই ফনিমনসার চারায় কেবল কাঁটাই ছিলোনা—তা প্রচুর দুধও দিতো। ওদের দু'জনের সঙ্গে একটি সন্ধ্যা কাটালেই আমার চেতনা শানিত হয়ে উঠতো বিষাক্ত তীরের মতো।

সাহিত্যচর্চায় আমার শুভাকাঙ্খীর সংখ্যা, হিসেব করলে জনা পঞ্চাশেক হবে। কিন্তু আমি যা চাই—সে সম্পর্কে সম্যক ধারনা ছিলো মাত্র চারজনের। এদের একজন ল্যারী হাণ্ট—যে বসবাস করতো মিনেসোটার এক ছোট শহরে। লোকটা ছিলো বাজিয়ে। একদা ওর কাছে আমার বাসারই একটি ঘর ভাড়া দিয়েছিলাম এবং সে আমার বউয়ের প্রেমে পড়েছিলো। বউয়ের প্রতি আমার নির্লজ্জ আচারনই তাকে

এ ব্যাপারে অগ্রসর হতে সাহসী করে তুলেছিলো। অবশ্য সে আমাকে ভালো বাসতো আমার বউয়ের চেয়েও। শুনতে পাচ্ছি সে নিউ ইয়র্কে আবার আসছে। এলে তো ভালোই হয়। আমি এই বারে আমার বউটাকে তুলে দেবো ওর হাতেই। ক' বছর আগে, স্ত্রীর সঙ্গে যখন আমার সম্পর্কের অবনতি ঘটতে শুরু করেছে—তখনি আমি মনে মনে ফন্দি এঁটেছিলাম-ওর প্রাক্তন প্রেমিক রোনাল্ডের হাতেই ওকে সঁপে দেবো। চমৎকার ছোকরা। একবার এক ফরাসী রেস্তোরায় আমরা তিনজন খেতে বসলাম। খাওয়া দাওয়ার পর তাকে অনেক বোঝালাম। বললাম, তোমাকে ও খুবই ভালোবাসে। বউ বাসায় ফিরলে আমি রোনাল্ডের হোটেলে গিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব কথা বললাম তাকে। সারারাত বোঝালাম। কিন্তু সে কোনো কথাই শুনলো না। ঘটনাটা দাঁড়িয়েছে কমিক-স্ট্রিপ্, গ্যাসটন আর আলফনসে-র মতোই। বিরক্তিকর, করুণ এবং অবাস্তব তো অবশ্যই। যাই হোক, এবার ল্যারী-হান্ট এলে আর ছাড়াছাড়ি নেই। এবারে ঝুলিয়ে দেবোই দেবো। কেবল দুশ্চিন্তা একটাই যে, ইতিমধ্যে ব্যাটা আর কোনো মেয়ে মানুষকে বগলদাবা করে ফেলেছে কিনা। করে থাকলে ওকে ক্ষমা করা আমার পক্ষে কঠিন হবে।

নিউ ইয়র্কের একটা জায়গায় গিয়ে আমার ভালো লাগতো। তা হচ্ছে বন্ধু উলরিখের ষ্টুডিও। তার জীবিকা তাকে ঘনিষ্ট করে তুলেছিলো নানা ধরনের যৌনাচারী মেয়ের সঙ্গে। যে

সব রাজহংসী তার ষ্টুডিওতে উদোম হয়ে হাঁটাহাঁটি করতো, তার মধ্যে একটা নিগ্রো মেয়েকে আমি পছন্দ করতাম। এ মেয়েটিকে যেভাবে খুশি সেভাবে বসনো চলতো। তবে হ্যাঁ, এই ভাবে আমাদের জন্যে পোজ দেওয়া মেয়ে গুলোর জন্যে খুব সহজ ব্যাপার ছিলোনা। একবার তো মহা ঝামেলা। আমরা আরাম কেদারার ওপর ওদের এমনভাবে পা রেখে বসতে বললাম, যাতে স্যামন মাছের মতো রাঙা জায়গাটুকু শিল্পী স্পষ্ট দেখতে পায়। তা আঁকার হাত পাকাই ছিলো উলরিকের। কার্টন আর কৌটোর জন্যে খাসা ডিজাইন করতো। বস্তুতঃ ম্যাগাজিনের ব্যাক-কভার বানাবার ব্যাপারে তার দক্ষতা অবিসংবাদিত। তবে সে কী আঁকতে সবচে বেশি পছন্দ করতো? সে পছন্দ করতো। রকমারি সব যোনি অঙ্কন করতে। সুঠাম, রসালো যোনি—যার ছবি বাথরুমের দেয়ালে সাঁটলে দিব্যি খোলতাই হবে পরিবেশটি। এ সব ছবি সে আঁকতো প্রায় অকারণেই। কেউ কিছু খাওয়ালে বা দু'বার টাকা হাতে তুলে দিলেই সে ফটাফট এঁকে দিতো রং বেরঙের জননেন্দ্রিয়। একটু আগেই যে কথাটি বলছিলাম, 'ওই যে সেই কৃষ্ণাঙ্গ মেয়েদের কথা!' তার বিশেষ প্রিয় বিষয় ছিলো কালো যোনি। নানা সম্ভব অসম্ভব ভঙ্গীতে শুইয়ে, বসিয়ে বা দাঁড় করিয়ে যোনি আঁকতে আঁকতে হঠাৎই হয়তো হেঁকে উঠতো উলরিকঃ 'ওই জায়গায় একটু চেপে ধরবে লুসি?' এবং লুসিও যে কম কর্মিৎকর্মা

নয়—তার প্রমান পেতে দেরী হতো না।—'বেশীক্ষন দেরী হবে না লুসি।' উৎফুল্ল কণ্ঠে বলতো আঁকিয়ে। আর এদিকে হয়তো আমার দিকে চোখ ট্যারা করে বলতো, 'জননেন্দ্রিয়ের দ্রাঘিমাংশটি এবার লক্ষ্য করো!' লুসি কান খাড়া করা মাদী খরগোসের মতো এই আনন্দদায়ক বাক্যটি শ্রবণ করতো। তার জন্যে 'জননেন্দ্রিয়' শব্দটিই ছিলো এক ইন্দ্রজালিক ধ্বনি। একদিন আমি আর উলরিক রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি। হঠাৎ লুসির সঙ্গে দেখা। লুসি জিজ্ঞেস করলো—আজ জননেন্দ্রিয়ের মহড়া নেই, মিস্টার উলরিক?'

আমার যে কোনো বন্ধুর চেয়ে উলরিকের সঙ্গেই ছিলো আমার সবচেয়ে বেশী মিল। আমার জন্যে সে প্রতিনিধিত্ব করতো ইউরোপের। আমার ওপর প্রভাব ফেলতো সেখানকার নম্রতা আর সভ্যতার। আমরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেই জগতের কথা বলাবলি করতাম, যেখানে শিল্পের সঙ্গে জীবনের রয়েছে একটা সম্পর্কসূত্র। আমি কি কখনো যেতে পারবো সেই সব দেশে? আমার কি অনেক দেরী হয়ে যাবে? আমি কীভাবে জীবন যাপন করবো? কী ভাষায় করবো বাক্যালাপ? আমি যখন বাস্তববাদীর চোখে এ দৃশ্য দেখতে যাই—তখন একে মনে হয় বড়োই নৈরাশ্যজনক। কেবল মাত্র দুঃসাহসী আত্মারাই এই স্বপ্নের উন্মোচন ঘটাতে পারে। এক বছর ধরে উলরিক এই অসম্ভবকে সম্ভব করেছে। স্রেফ স্বপ্নের বাস্তবায়নের জন্যে সে গত দশ বছর যাবৎ এমন সব কাজ করেছে, যা আদৌ তার পছন্দসই

কাজ নয়। এখন তার স্বপ্ন দেখা শেষ। সে ফিরে এসেছে এমন এক জায়গায়, যেখান থেকে শুরু হয়েছিলো তার যাত্রা। আমি এটা পারবো না। আমার পক্ষে এই ধরনের ত্যাগ স্বীকার অসম্ভব। কেননা আমার নীতি হচ্ছে পার হয়ে আসা ব্রীজ পুড়িয়ে দেয়া। আমার এ মুখখানা সব সময় ভবিষ্যতের দিকে ফেরানো। আমি যে ভুলটা করি, তা মারাত্মক ভুল। আমি যখন পড়ে যাই, তখন চলে যাই অনন্ত পাতালে। আমার প্রধান রক্ষা কবচ হলো আমার স্থিতিস্থাপকতা। আমি সব সময় পেছনে ঠিক্‌রে পড়ি। কিন্তু যখন সোজা হয়ে দাঁড়াই তখন আমাকে মনে হয় একটা স্লো-মোশন ছবির মতো। অবশ্য ইশ্বরের চোখে গতির কোনো আলাদা বিশেষত্ব নেই।

অল্প কয়েক মাস আগে উলরিকের ষ্টুডিওতে বসেই আমি আমার প্রথম বইটি লিখে শেষ করেছি। বারোজন বার্তা-বাহককে নিয়ে লেখা বই। আমি ওখানে ওর ভাইয়ের রুমে বসেও মাঝে মধ্যে লিখতাম। লোকটা খুব সম্ভব কোনো সাময়িকিরে সম্পাদক। একটি লেখার কয়েকটা পৃষ্ঠা পড়ে নির্বিচারে সে জানিয়ে দিলো, আমার ভিতরে এক আউন্স প্রতিভাও নেই। সংক্ষেপে, আমি একটা মস্ত ফ্লপ। তাই অনতিবিলম্বে আমার উচিত এসব লেখা ছেড়ে দিয়ে সৎ, স্বাভাবিক জীবন যাপন করা। আরো এক চিড়িয়া—যে 'কাঠমিস্তিরি যীশু' নামে একটি বই লিখে চারদিকে হুল্লোড় ফেলে দিয়েছে—সেও

আমাকে একই কথা বলেছে। আমি তো এসব শুনে মহা-খাপ্পা। একদিন উলরিককে বললাম, 'সমালোচনা করার ওরা কে? ওরা কি করেছে। টাকা কামানো ছাড়া ওরা আর জানেইটা বা কি?'

জোয়ে আর টনি ছিলো আমার দুই ক্ষুদে বন্ধু। আন্ধকারে চুপ চাপ শুয়ে ছিলাম আমি। ভাবছি ওদের কথা। মৃদু আলোর সঙ্গে সঙ্গে আমি পদ্ম পাঁপড়ির মতো উন্মোচিত হলাম। উঠে বসলাম লেখার টেবিলে। একটা পেন্সিল হাতে নিয়ে লিখতে শুরু করলাম। লিখতে লাগলাম আমার শৈশ-বের কথা। সহজ ভাষায় লিখছি, মায়ের হাত ধরে আমি মাঠ পার হয়ে এগিয়ে চলেছি। চারদিকে ঝলমল রোদ্দুর। জোয়ে আর টনি দূর থেকে আমাকে দেখতে পেয়ে কী আনন্দে দু' হাত শূন্যে তুলে আমার দিকে ছুটে আসছে—আমি লিখছি সে সম্পর্কে আমার অনুভূতির কথা। একটার পর একটা ইট সাজিয়ে রাখছি আমি সৎ রাজ মিস্ত্রির মতো। সব কথা বলা হলে আমি থামলাম। কী লিখেছি, তা পড়লাম শান্ত ভাবে। আমি এমন আবেগাপ্লুত হয়ে পড়লাম যে আমার দু'চোখে পানি এসে গেলো। এ লেখা তো সম্পদককে দেখাবার জন্যে নয়—এ লেখা ড্রয়ারের ভিতর বন্ধ করে রাখার জন্যে। এ যেন স্বতস্ফূর্ত প্রক্রিয়ার স্মারকের মতো, পরিপূর্ণতার প্রতিজ্ঞার মতো।

বস্তুর উৎপত্তির পেছনে কোনো রহস্য নেই। আমরা সবাই

তো সৃষ্টির এক একটা অংশ। সব রাজা, সব কবি ও সঙ্গীত-কার—এ কথা খাটে সবার বেলাতেই। যার অস্তিত্ব আগে থেকেই আছে, আমাদের সবার কাজ হলো তার আবিস্কার ও উন্মোচন।

২

দু'তিন দিন পর মারার সঙ্গে আমার দেখা হলো ব্রুকলীনে। প্রকাশ্য দিবালোকে ওর সঙ্গে এই আমার প্রথম সাক্ষ্যাৎ। বিকেল প্রায় ছ'টা বাজে। দিনের আলো মরে আসছে দ্রুত। লংআইল্যাণ্ড রেল স্টেশনের ওয়েটিংরুমের দরজার সামনে আমি দাঁড়িয়ে আছি। এমন সময় সে এলো। ফুটি দেয়া সুইস পোষাকে তাকে দারুন লাগছে। মৃদু বাতাসে ওর চুল গুলো এসে লুটোপুটি করছে মুখের ওপর। কালো, চকচকে চুল। ঝলমলে শরীর। কথা বলছে যেন শিশুর মতো।
কথা ছিলো আমরা সমুদ্রের তীরে বেড়াবো। আমার ভয় হলো এই ভেবে যে—যা ঠাণ্ডা পড়েছে, তাতে হালকা পোষাক পরা মেয়েটির কষ্ট হবে। কিন্তু অভয় দিয়ে বললো, এ ঠাণ্ডা তার কাছে কোনো ঠাণ্ডাই নয়। ও এবং আমি দু'জনেই এমন একটা আনন্দ অনুভব করছি, যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

আমাদের মুখের কথা গুলো যেন বুদবুদের মতো উড়ে বেড়াচ্ছিলো। অনেক্ষন বেড়াবার পর, এক সময় আমি আমার পাণ্ডুলিপির কয়েকটি পৃষ্ঠা ওর হাতে তুলে দিলাম। এমন মনোরম সময়ে এরকম একজন মনোহারিনী সমালোচক আমি কি পেয়েছি কখনো?

ওর মুখভাব দেখেই আমি বুঝতে পারছি, যেন কেউ ওর হাতে তুলে দিয়েছে স্বয়ং ঈশ্বরের বাণী। আমি ওর মতামত জানতে আদৌ আগ্রহী নেই। অন্ততঃ মৌখিক মতামত। কেননা ওর মুখমণ্ডলই বলে দিচ্ছিলো ওর খুশির সমাচার। বিকেলটা ওর সঙ্গে কেটে গেলো যেন স্বপ্নের ভেতর দিয়ে।

রাতে উলরিকের ষ্টুডিওতে ফিরে দেখি, নরক গুলজার। ওর বন্ধু বান্ধবদের সবাই এসে জড়ো হয়েছে সেখানে। এতো ভীড় সাধারনত হয়না অন্য দিন। এরা সবাই যেন—উলরিকের ভাষায়—দক্ষিনের চকচকে নতুন ব্লেড। ভার্জিনিয়া আর উত্তর ক্যারোলিনা থেকে নিজেদের ঝলমলে রেসিংকার চালিয়ে এসেছে। সবার সঙ্গেই জগ ভর্তি পিচ ব্র্যাণ্ডি। এদের কারুর সঙ্গেই জানা শোনা নেই আমার। সত্যি বলতে কি এদের সম্পর্কে কিছুটা নিরুত্তাপও ছিলাম আমি। কিন্তু দু'এক পাত্তর খাওয়ার পর ওদের সঙ্গে বেশ সহজ হয়ে গেলাম। কিন্তু কী কথা বলবো এই নিরেট গুলোর সঙ্গে? শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কে কোনো ধারনাই নেই। নিজেরাই বারবার লজ্জা আর বিনয় প্রকাশ করে বলতে থাকলো, 'গাঁ গেরামের মানুষ

আমরা। বই পত্তরের চাইতে ঘোড়ার খবরই বেশী রাখি ভায়া।' যদিও আমি সাহিত্য সম্পর্কে কোনো প্রসঙ্গই উত্থাপন করিনি—তবুও তারা আগে ভাগে জানিয়ে রাখলো নিজেদের চৌহিদ্দির মাপ। কিন্তু আলাপ আলোচনা যে শেষ পর্যন্ত চ্যাচামেচিতে পর্যবসিত হলো তা বলাই বাহুল্য। পয়সা-অলা ওই গ্রাম্য ছোকরাগুলো একেবারে যাচ্ছে তাই। নেশাখোর, কুঁড়ের বাদশা। বেশ্যাসক্ত সব আকট কুত্তার বাচ্চা।

হৈ হল্লা যখন তুঙ্গে—এমন সময় ষ্টুডিওতে এসে ঢুকলো একটা চট্‌কদার মেয়ে। ভাবসাবে মনে হলো, এদেরই কোনো বন্ধুর বউ। কেবল বন্ধু নয়—ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আমি উলরিককে আড়ালে ডেকে নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আসল ব্যাপারটা কি, বলো তো শুনি?

উলরিক বললো, আর বোলো না বেচারার স্বামী পঙ্গু। সারাদিন সারারাত তার সেবা যত্ন নিয়েই আছে। এক চুমুক মদের জন্যে যখন তখন নীচে নামছে। আহা বেচারা! আমি দুর থেকে মেয়েটিকে জরিপ করতে লাগতে লাগলাম। যৌনতার অধিক যৌনতা তাকে তুলনাহীনা করে রেখেছে। আমার চোখে যেন আর পলক পড়ে না। সে কেবল মাত্র একটা চেয়ারে বসেছে—সঙ্গে সঙ্গে আরো দু'টি মেয়ে ঢুকলো আসরে। আমার এক দিকে বড্ড খিদে পেয়েছে—অন্য দিকে গরম হয়ে উঠেছে শরীরের অংশ বিশেষ। এখন আমার মনে কেবল দু'টি চিন্তা। খাদ্য এবং কাম। আমি অন্যমনস্কের

মতো বাথরুমে ঢুকলাম দরজা খোলা রেখেই। উত্তেজিত শিস্নটা ফুঁসে উঠছিলো বারবার। মুঠোর মধ্যে তাকে শক্ত করে চেপে ধরে আমি প্রস্রাবটা ছেড়ে দিলাম সজোরে। হঠাৎ চমকে উঠে দেখি, আমার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে আইরিন—মানে সেই পঙ্গুর সুন্দরী বউটা। সে আমাকে খুব স্বাভাবিক ও সহজ দেখে নিশ্চিন্ত হলো। হঠাৎ সে-ও এসেছে প্রস্রাব করতেই। এবং আমার শেষ হলে, সেও এসে প্যানের কাছে দাঁড়াবে।

ঃ বাববাহ্—প্রস্রাব বটে!' মেয়েটি বললো—'রীতিমতো একটা অনুষ্ঠান!' আমি শেষ ক'য়েকটা ফোঁটার জন্যে নুনু ধরে ঝাঁকি মারতেই সে আবার বললোঃ 'আপনি এভাবেই একর্মটি করে থাকেন বুঝি?' তার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই আমি তাকে খপ্ করে ধরে নিজের দিকে টেনে নিলাম।

না, প্লীজ এরকম করবেন না। মেয়েটি সকাতরে প্রার্থনা করলো। তাকে খুবই ভয়ার্ত, আতঙ্কিত মনে হচ্ছিলো। আমি এক হাতে তাকে জাপ্টে ধরে অন্য হাতে দরজা লক করতে করতে ফিসফিস করে বললাম,—'এই একটু খানি—জাষ্ট্ ওয়ান মিনিট!' কথার সঙ্গে সঙ্গে আমার শিস্নটা যেন ওর শরীরের নানা জায়গায় আঁচড় কাটছিলো। আমি হাঁ করে ওর লাল মুখের ওপর আমার মুখ টাকে জাপ্টে ধরলাম।

প্লীজ, প্লীজ!—'কাকুতি মিনতির সঙ্গে সঙ্গে সে আমার

আলিঙ্গন থেকে মুক্তি পাবার জন্যে আপ্রান চেষ্টা করছিলো। কিন্তু আমি তাড়াতাড়ি কাজ সারছিলাম। অনেকটা ক্ষ্যাপার মতো। বললাম, 'আমি তোমাকে ছেড়ে দেবো। খালি আর একটা চুমু।' বলতে বলতে ওকে আমি দরজার উপর ঠেকিয়ে একটা হেভী লোড চাপিয়ে দিলাম।

আমার অনুপস্থিতি ওদিকটায় কেউ লক্ষ্য করেনি। অন্তত বাথরুম থেকে বেরিয়ে আমার সেই রকমই মনে হলো। দক্ষিনী—ছোঁড়াগুলো ঢলাঢলি করছে অন্য দু'টি মেয়েকে নিয়ে। উলরিক আমাকে জিজ্ঞেস করলো 'আচ্ছা আইরিন মেয়েটা গেলো কোথায় বলতে পারো? ওকে যে দেখছিনা?'

আমার মনে হয় সে বাথরুমে গেছে!' আমি বললাম।

কীরকম লাগালে?—এখনো মুখে রস লেগে আছে বুঝি!' সে বললো। জবাবে আমি মৃদু হাসলাম।

উলরিক বললো, 'তা তোমার মেয়েটিকে নিয়ে এসোনা এখানে একদিন। খাসা জমবে!'

আমি বললাম, 'শোনো, একটা ডলার ধার দাও। দেবে? আমাকে এক্ষুনি কিছু খেতে হবে। আমি শেষ!'

কিন্তু টাকা পয়সা চাইলেই উলরিকের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায়। নিজস্ব ধরণে সে বেশ বিনয়ের সঙ্গে মানুষকে প্রত্যাখ্যান করতে জানে। কিন্তু আমিও নাছোড় বান্দা। জাপ্টে ধরেছি প্রান পনে। বললাম, 'টাকা দাও। দ্যাখো, এটা ফাজলামোর সময় নয়!' শেষে উলরিক টাকাটা আমার হাতে এক রকম গুঁজে

দিলো। সে টাকাটা কেবল আমার হাতে গুঁজে দিয়েছে, বাথ-রুমের দরজা খুলে আইরিন এসে হাজির। আমাকে লক্ষ্য করে বললো, 'একি, কোথায় চললেন?' উলরিক বললো, 'হ্যাঁ, লোকটা ছটফট করছে। এক্ষুনি ভাগবে! তবে হ্যাঁ, সে কসম খেয়ে বলেছে—অল্পক্ষনের মধ্যেই ফিরে আসবে।' উলরিকের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা তিনজন গোল হয়ে, হাত ধরাধরি করে একটি ঘনিষ্ট বৃত্ত রচনা করলাম। তারপর আমরা দু'জন একসঙ্গে চুমো খেলাম আইরিনকে। দীর্ঘায়িত যুগল—চুম্বন!

: অপনার সঙ্গে আবার কখন দেখা হবে?' আইরিন আমাকে লক্ষ্য করে বললোঃ—হয়তো আবার এখানে এসে আমাকে পাবেন না। আপনার সঙ্গে আমার একটা কথা ছিলো।'

কেবল একটা কথা?'—বললো উলরিক।

ওই যে, সেই—'বাক্য অসমাপ্ত রেখে উলরিকের দিকে তাকিয়ে অর্থপূর্ণ হাসি হাসলো আইরিন।

ওই হাসি আমার ভেতরে যেন একটা নেশা ছড়িয়ে দিলো মুহূর্তে। আমি ওকে ধরে এক রকম ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে গেলাম কোনার দিকে। তারপর সরাসরি ওর যোনির ওপর আমার হাত রাখলাম। যোনিটা তখন জ্বলছে। আমি ওর গলার ভেতরে ঢুকিয়ে দিলাম আমার জিহ্বাটা।

: তুমি পালিয়ে যাচ্ছো কেন?'—সে ফিস ফিস করে বললো। 'কেন তুমি থাকবে না।'

উলরিক সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে এসে নাক গলালো। বললোঃ আরে ওর কথা চিন্তা কোরোনো!' জোঁকের মতো ঘনিষ্ট হয়ে জানালোঃ 'ওকে সান্তনা দেবার দরকার নেই। যা দরকার, তার চেয়ে ঢের ঢের বেশী মেয়েলোক ওর আছে!'

বেরিয়ে আসবার সময় দেখলাম, আইরিণ হাত তুলে আমাকে বিদায় জানালো। সে তেমনি আধা-উবু হয়ে আছে। স্কার্টটা হাঁটুর ওপর তোলা। উলরিক এক হাতে ওকে আঁকড়ে ধরে অন্য হাতে ওর গরম যোনি তছনছ করে ফেলছে। উফ্—কুত্তী বটে একটা! আমি মনে মনে বললাম। নিচে নেমে এসে মনে হলো, খিদেয় আমার নাড়ি ভুঁড়ি যেন হজম হয়ে যাচ্ছে।

সিক্সথ এভিন্যুর এক সেলুনের পেছনে বসে দস্তুর মতো আঁটিয়ে নেয়া গেলো। জায়গাটা উলরিকের ষ্টুডিও থেকে খুব একটা দূরে নয়। পেট ভরে খেয়ে নিজেকে মনে হচ্ছিল প্রজাপতির মতো তরতাজা, ফুরফুরে। আমার মনের আনন্দ নিশ্চয়ই লেখা ছিলো আমার মুখের ওপর। নইলে দরজা থেকে পা বাড়িয়েই ভদ্রলোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবো কেন? চলনে বলনে খাঁটি ভদ্রলোক। সঙ্গে একটা কুকুর। আমার দিকে হাসিমুখে এগিয়ে এলেন। কিন্তু কী ব্যাপার? এঁকে তো এর আগে কখনো দেখিনি আমি। সম্ভবতঃ তিনিও আমার মতোই মুডে ছিলেন। ফলে এভাবে যোগাযোগ ঘটে গেছে। কথা বার্তায় বেশ খাপ্ খেয়ে যাওয়ায় দু'জনের আলাপ অল্পক্ষণের

মধ্যে জমে উঠলো কথায় কথায় জানা গেলো, ভদ্রলোক সদ্য-ইউরোপ-প্রত্যাগত। বহুকাল সেখানে কাটিয়ে এই তো দেশে ফিরেছেন। আলাপে আলাপে ঘনিষ্টতা গড়ে উঠেছিলো অল্পক্ষনের মধ্যেই। হাঁটতে হাঁটতে তাঁর অ্যাপর্টম্যাণ্টে যাওয়ার সময় ফ্লেরেন্সে এক কাউণ্টেসের সঙ্গে তাঁর যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছিলো তা জানা গেলো। তাঁর কথাবার্তায় মনে হচ্ছিলো, ইউরোপ সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতা আছে বলে তিনি অনুমান করে নিয়েছেন। আর, সম্ভবত আমাকে একজন শিল্পী হিসেবেই ধরে নিয়ে থাকবেন তিনি।

বেশ জমকালো, সৌখিন অ্যাপার্টমেণ্ট। ভদ্রলোক চমৎকার হাভানা-চুরুটের সুন্দর একখানা বাক্স নিয়ে এলেন। বললেন, 'কী পান করবেন, আজ্ঞা করুন।' আমি একটা হুইস্কি নিয়ে আরাম কেদারায় সমাসীন হলাম। মনে হলো, আমার বকবকানির প্রতিটি শব্দ তিনি বিশ্বাস করছেন। আমি লেখক—এই পরিচয় পেয়ে তাঁর সে কি বিস্ময়! আরো কৌতূহলী হয়ে উঠলেন। জিজ্ঞেস করলাম, 'তা আপনি কি করেন, জানতে পারি কি?'

আমি এখন আর কিছুই করিনা!' তিনি বললেন, 'এক সময় ছবি আঁকতাম। গরীব আঁকিয়ে। তা, এখন আর বিসমু করিনা। এখন চাই কেবল উপভোগ করতে।'

ব্যাস, আর যাবে কোথায়। আমার মুখের তুবড়ি ছুটলো। আমার ভেতরে কি বিরাট সম্ভাবনা। তাকে কাজে লাগালে

আমি কী বিশাল কীর্তি স্থাপন করতে পারবো—তার সবিস্তার নীল নকশা তুলে ধরলাম ভদ্রলোকের সামনে। চোখ বড়ো বড়ো করে তিনি তা শুনতে লাগলেন। আমি কী কী লিখেছি এ পর্যন্ত?

অনেক লিখেছি। এক গাদা বই। কয়েকটি কবিতার। বেশ কখানা ছোট গল্পের। আমার নতুন বইটির খবর ও তাঁকে দিলাম। বললাম, যে বইখানা লিখতে শুরু করেছি, তা সাহিত্য জগতে হৈ চৈ ফেলে দেবে। চল্লিশটি চরিত্র থাকবে এ বইয়ে। চরিত্রগুলোর একটি চার্ট আমি টাঙিয়ে রেখেছি দেয়ালে—আপনাকে দেখাবোখন। যেন বইয়ের ম্যাপ! কাইরিলভ নামে দস্তয়েফস্কীর সেই ক্যারেক্টারটার কথা কি আপনার মনে আছে? বড্ড বেশী সুখের কারণে যে লোকটা গুলি খেয়ে অথবা ফাঁসি নিয়ে আত্মহত্যা করে? আমার অবস্থাও অনেকটা সেই রকমই। সুখী। বড্ড বেশী সুখী। এই তো, ক'ঘন্টা আগের কথাই ধরুন না কেন। তখন আমাকে দেখে যে কেউ ভাবতো বদ্ধ পাগল। তখন আমি মাঠের মধ্যে উচু হয়ে ঘাস চিবুচ্ছি। নিজের গায়ে গতরে আচড়াচ্ছি কামড়াচ্ছি কুকুরের মতো। প্রচণ্ড আওয়াজে ঘেউ ঘেউ করছি। হাঁটু গেড়ে বসে প্রার্থনা করছি, ঢের হয়েছে। আমি আর কিছু চাই না। কিসসু না। আমি যে নিঃশ্বাস নিতে পারছি, আমি যে এখনো বেঁচে বর্তে আছি—তাই কি যথেষ্ট নয়?'

এবং এসবের সঙ্গে আমি জুড়ে দিলাম আমার টেলিগ্রাফিক—

জীবনের আখ্যান মঞ্জরী। লম্পট, উন্মাদ, মিথ্যুক আর রোগ-গ্রস্তদেরকে আমি কীভাবে মোকাবিলা করতাম। ছিটগ্রস্থ সেবাকর্মী, গরীব পিয়ন আর অফিসে কর্মপ্রার্থী বেশ্যাদের সাহচর্যে আমার সময় কীভাবে কেটে যেতো—সেই সমস্ত রোমাঞ্চকর কাহিনী।

আমি বলে যাচ্ছি আর ভদ্রলোক তা হাঁ করে শুনছেন। এক সময়, যেন, তন্ময়তা ভাঙ্গতেই বলে উঠলেন, 'আরেক পাত্তর চলবে কি?'

'নিশ্চয়ই। তা কী যেন বলছিলাম? ও হ্যাঁ···বইয়ের মাঝামাঝি গিয়েই আমি বিস্ফোরণ ঘটাবো। কেন করবো না। নইলে আর ব্যতিক্রমী কী হলো, বলুন। আমরা কি চাই? না একটা মানুষ। যে মানুষটি হবে আমারই মতো—কোনো কিছুরই তোয়াক্কা করবে না। দস্তয়েফস্কীও বেশি দূর এগোতে পারেননি এব্যাপারে। প্লট আর চরিত্রই সবকিছু নয়। জীবনের অন্তরালে অন্য কিছু—আরো কিছু আছে। জীবন ওপর তলার বাসিন্দা নয়। জীবন এখন এখানে। জীবন হচ্ছে চারশো চল্লিশ অশ্ব শক্তি বিশিষ্ট, দু'সিলিণ্ডারের এঞ্জিন!···'

এখানে আমাকে থামিয়ে ভদ্রলোক বললেন, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে। আমি অবশ্যই স্বীকার করবো, আপনার ক্ষমতা আছে। তা, এক আধখানা বই পড়ে দেখা যাবে অপনার, কি বলেন!'

'নিশ্চয়ই পড়বেন। আমি দু'এক দিনের মধ্যেই এক খানা

পাঠিয়ে দেবো আপনাকে।' এ পর্যন্ত বলেছি, হঠাৎ দরজায় করাঘাত। ভদ্রলোক দরজার দিকে এগোতে এগোতে বললেন, 'আমি একজনের জন্যে প্রতীক্ষা করছিলাম। আশা করি আপনি বিরক্ত হচ্ছেন না। যিনি আসছেন, তাঁকে দেখে বিরক্ত হবার কিছু নেই।'

অসাধারণ এক রূপসী মহিলা দাঁড়িয়ে আছেন দরজায়। আমিও উঠে দাঁড়িয়েছি অভ্যর্থনার ভঙ্গীতে। দেখে মনে হয় ইতালীয়। সেই কাউন্টেসই নয় তো—একটু আগে উনি যাঁর কথা বলছিলেন!

'সিলভিয়া!' ভদ্রলোক আফশোসের গলায় বললেন, 'আর একটু আগে এলেনা কেন? আমি, এই তো এতোক্ষন এঁর মুখে চমৎকার এক একটা গল্প শুনছিলাম। এই যুবক একজন লেখক, বুঝলে। এসো পরিচয় করিয়ে দিই!'

মহিলা আমাকে সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে বললেন, 'আপনি নিশ্চয়ই খুব বড়ো লেখক। আপনাকে দেখেই মনে হচ্ছে, আপনি অনেক যন্ত্রনায় দগ্ধ হয়েছেন।'

'তাঁর জীবন যাপন খুবই অদ্ভুত, সিলভিয়া। সেই ব্যতিক্রমী বেঁচে থাকার গল্প শুনে মনে হয়, আমার জীবনটা এখনো শুরুই হয়নি। আচ্ছা, এঁর জীবিকা সম্পর্কে তুমি কি কোনো অনুমান করতে পারো?'

মহিলা আমার দিকে তাকালেন। ব্যাপারটা তিনি আমার মুখ থেকেই শুনতে চান। আমি তো রীতিমতো বিব্রত।

এবং অপ্রস্তুত তো বটেই। কেননা সামান্য আগেও আমি এখানে ঠিক এই রকম মন-মোচড়ানো চরিত্রের উপস্থিতি আশা করিনি। কেবল রূপ নয়—কী প্রত্যয়ী, কী ভীষণ প্রাণবন্ত। মনে হলো, চেয়ার থেকে উঠে তাঁকে আলতো ভাবে আলিঙ্গনাবদ্ধ করে কিছু অতি সহজ, কিছু অতীব নির্ভর-যোগ্য বাক্য উচ্চারণ করি। যেমন একজন মানুষ বলে আর একজন মানুষের কাছে। তাঁর প্রশস্ত চোখ দু'টিতে সহানুভূতির উষ্ণতা। কী ভাবে সে ওই বৃদ্ধের প্রেমে পড়তে পারে? কোন্ শহর থেকে সে এসেছে। কোন্ পৃথিবীর খোঁজে! মনে হলো, দু'টি মাত্র শব্দ উচ্চারণের আগেও এর কাছে সতর্ক হতে হবে। এর কাছে মিথ্যা কথা বলা অসম্ভব। যে কোনো ভুলের ফল আমার জন্যে হতে পারে মারাত্মক। তাঁর মুখ দেখেই মনে হচ্ছে, তিনি আমার মনের খবর, আমার দ্বিধার দুলুনি আঁচ করে ফেলেছেন। প্রথমে ওঁর দিকে এবং তারপর আমার দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'কেউ কি আমাকে একটা ড্রিংক অফার করবে?'

'কিন্তু তুমি কখনো কিছু খাবেনা!'—ভদ্রলোক বললেন। তারপর যেন আমাকে সাহায্য করবার জন্যেই উঠে দাঁড়া-লেন। আমরা তিনজন ঘনিষ্ট ভাবে দাঁড়িয়ে আছি। সিল-ভিয়ার হাতে শূন্য গ্লাশ। তিনি সেই গ্লাশ উঁচু করে ধরে বললেন, 'ঘটনা যে ভাবে গড়াচ্ছে। তাতে আমি খুবই খুশি। আমি তোমাদের মতো দু'টি পরস্পরবিরোধী মানুষ আগে

কখনো একসঙ্গে পাইনি। আমি নিশ্চিত, তোমরা একে অন্যকে বুঝবে।' কথা বলতে বলতে তিনি গ্লাশটা আলতো ভাবে ওষ্ঠে ছোঁয়ালেন। আমার মাথার মধ্যে একটা চিন্তা ঘুরপাক খেতে লাগলো, যে শিগগীরই কোনো অদ্ভুত ঘটনার সূত্রপাত হবে। এবং এখন যা ঘটছে, তা একটি বিচিত্র অ্যাডভেঞ্চারেরই প্রস্তুতি পর্ব। বিদ্যুচ্চমকের মতো আমার মনে হলো, মহিলা আমাদের ছেড়ে কিছুক্ষনের জন্যে স্থানত্যাগ করবেন। তারপর নিঃশব্দে আমার বাহুপাশে এসে ধরা দেবেন। আবার এরকমও মনে হলো যে, ওদের দু'জনের কারোর সঙ্গেই—আমার আর কখনো দেখা হবে না।

আশ্চর্যের ব্যাপার, আমার অনুমান অনেক খানিই মিলে গেলো পরবর্তী ঘটনাগুলোর সঙ্গে। মহিলা এখানে আসবার পাঁচ মিনিটের মাথায় গৃহস্বামী ঘোষনা করলেন, তিনি আন্তরিক ভাবে দুঃখিত যে কিছুক্ষনের জন্যে খুব জরুরী একটা কাজে তাঁকে বাইরে যেতে হচ্ছে। তিনি বাইরে বেরিয়ে দরজা বন্ধ করে দেবার সঙ্গে সঙ্গে মহিলা এসে আমার কোলের ওপর বসলেন। তারপর বললেন—না না 'বললো'—আজ রাত্তিরে সে ফিরবে না। এখন আমরা কথাবার্তা বলতে পারি।'

আমি এ কথা শুনে রীতিমতো শিউরে উঠলাম। একি ব্যাপার? কিন্তু ভাবতে গিয়ে মাথাটাই যেন গুলিয়ে যাবে। নানা দুশ্চিন্তা উঁকি ঝুঁকি দিতে থাকলো মনের ভেতর।

বিশেষ করে যখন সে বললো, 'আর আমাকে তোমার কী মনে হয়? এক সুন্দরী রমনী—ওই লোকটার স্ত্রী? আমার জীবন সম্পর্কে তোমার ধারনাটা কি?'—তখন তো ভয়ে দু'পা পিছিয়েই এলাম আমি।

আমার মনে হয়, তুমি এক জন বিপদ জনক রমনী!'—আমি দৃঢ়তার সঙ্গে উচ্চারণ করলাম। বললাম, 'অবাক হবো না, যদি শুনি তুমি একজন বিখ্যাত গুপ্তচর!'

দারুন অনুমান তোমার!' সে বললো, 'না আমি কোনো স্পাই টাই নই তবে.....'

যদি তুমি তা হয়েও থাকো—সেকথা আমাকে বলোনি। আমি তা জানি। সত্যি বলতে কি আমি তোমার জীবন সম্পর্কে জানতে আগ্রহী নই। তোমরা আসলে আমার কাছে কি চাও? আমার তো মনে হচ্ছে, আমি একটা ফাঁদে পড়ে গেছি।'

: কী যে বলো। ছিঃ! এসব তোমার অলীক কল্পনা। তোমার কাছে আমাদের যদি কিছু চাইবার থাকতো তাহলে তোমাকে অবশ্যই হতে হতো আমাদের পূর্ব পরিচিত। নয় কি?' এক মুহূর্তের নীরবতা। হঠাৎ—'এটা কি সত্যি, যে স্রেফ এক জন লেখক ছাড়া আর কিছুই তুমি হতে চাওনা?,

: তার মানে?

: মানে এটাই। আমি জানি তুমি একজন লেখক। কিন্তু তুমি তো অন্য কিছুও হতে পারো। তুমি হচ্ছো সেই ধরণের মানুষ,

যারা যা ইচ্ছে তাই করতে পারে। নয় কি ?'

: সম্ভব নয়। কেননা যাই-ই আমি শুরু করিনা কেন—তার শেষটা হয় উল্টো পাল্টা। এই যেমন, এ মুহূর্তে আমি নিশ্চিত নই যে আমি একজন লেখক কিনা।'

সে আমার কোল থেকে উঠে গিয়ে একটা সিগারেট ধরালো। 'মনে হয় তুমি ব্যর্থ হবে না।' সে ধীরে ধীরে কিন্তু বেশ প্রত্যয়ের সঙ্গে উচ্চারণ করলো, 'তোমাকে নিয়ে মুশকিল এই, তুমি তোমার উপযুক্ত কাজে হাত দাও না। তুমি চাও বড়ো বড়ো সমস্যা, বড়ো বড়ো ঝামেলা। তোমার ওপর কঠিন চাপ না দেওয়া পর্যন্ত তুমি ঠিকঠাক করো না। আমি জানিনা, তুমি কি করছো। তবে এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত যে তোমার বর্তমানের জীবনের সঙ্গে তুমি খাপ খাওয়াতে পারছো না। তুমি বলেছো, খুব ভয়াবহ জীবন যাপন করছো; অন্যদের চেয়ে ঝুঁকিও নাও তুমি বড়ো বড়ো···ঠিক আছে, এটা তুমি সম্ভবত ভালো জানো···। কিন্তু, তুমি, সুরক্ষিত।'

: সুরক্ষিত ? বুঝতে পারলাম না তো ?' আমি বিস্ময় প্রকাশ করে বললাম।

: হ্যাঁ, তুমি সুরক্ষিত।' সে সহজ গলায় জবাব দিলো ; 'সারাটা জীবন ধরেই তুমি সুরক্ষিত। ভালো ভাবে চিন্তা করে দ্যাখো তো! তুমি কি বেশ কয়েকবার মরতে মরতে বেঁচে যাওনি। তুমি কি লক্ষ্য করেছো, তোমাকে সাহায্য করার লোকের অভাব হয় না ? বিশেষ করে অদ্ভুত সব আগন্তুকের। যখন

নিজেকে তুমি নিঃস্ব বলে মনে করছো, ঠিক তখনই? তুমি কি ইতিমধ্যেই বেশ কিছু অপরাধ করে বসোনি? তেমন অপরাধ, যার সঙ্গে তোমার জড়িত থাকাটা কেউ সন্দেহ পর্যন্ত করতে পারবে না। তুমি কি ঠিক এই মুহূর্তে এক ভয়াবহ আবেগের সন্দিস্থলে অবস্থান করছো না? রাশির জোর না থাকলে যে আবেগ তোমাকে ধ্বংস করে ফেলতো! আমি জানি তুমি প্রমাপ্লুত। আমি জানি, তোমার আবেগের দাবি মেটাতে যে কোনো কাজ করতে প্রস্তুত। তুমি অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছো। ভাবছো, আমি এত-কথা জানালাম কী করে? না, আমার কোনো বিশেষ ধরনের বিদ্যে নেই যা দিয়ে আমি অচেনা লোকের ভেতরের লেখা পড়তে পারি। আসলে আমি একটা লোককে একবার একটু দেখেই তার অনেক খানি বুঝে ফেলতে পারি। আমার দিকে তাকাও। কয়েক মিনিট আগেই তুমি মনে মনে আমার সান্নিধ্য কামনা করছিলে। তুমি জানতে ও বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আমি তোমার প্রসারিত বাহুর মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়বো। আমি তাই-ই করলাম। কিন্তু তুমি আড়ষ্ট হয়ে গেলে। যেন খানি-কটা ভয়-ই পেলে আমাকে। আমি বলবো? তুমি কেন এমন করলে? তোমার টাকা নেই, শক্তি নেই, প্রভাব নেই। বলতে পারো, তোমাকে কী জিজ্ঞেস করবো?' কিছুক্ষন থেমে সে আবার বললো, 'তোমাকে সত্যি কথাটি কি বলবো?'

আমি অসহায়ের মতো মাথা নাড়লাম।

ঃ তুমি ভেবেছিলে, আমি এমন কোনো অনুরোধ করবো, যা প্রত্যাখ্যান করা কঠিন। তুমি আসলে কোনো মেয়েকে চাওনা। তুমি চাও একটি যন্ত্র, যা তোমাকে মুক্ত করবে। তুমি তোমার শিকল ভাঙ্গতে চাও। তোমার প্রেমিকাটি যেই হোক না কেন, বেচারার জন্যে আমি বেদনাবোধ করি। তুমি বড়ো আত্ম কেন্দ্রিক। কেবল নিজের কথাটাই ভাবো। চিন্তা করো কেবল আপন গন্তব্যের কথাই। তুমি যদি আরো একটু বেশি বলবান হতে, আমি তোমাকে ভয় পেতাম। তুমি জীবনকে ভালোবাসো তোমার নিজের চেয়েও। কেউই তোমাকে বেশিদিন ধরে রাখতে পারে না। তুমি এমন কিছু খুঁজে বেড়াও যা কখনো পাবেনা। কিন্তু মুক্তি পেতে হলে তোমাকে নিজের দিকে তাকাতে হবে। তুমি বন্ধুত্ব গড়ে তোলো অনায়াসেই। কিন্তু এদের কাউকেই তুমি প্রকৃত বন্ধু বলে আহ্বান জানাতে পারবে না। তুমি একা। তুমি একাই থাকবে বরাবর। তুমি বড্ড বেশী চাও…'

ঃ এক মিনিট সবুর করো।' আমি বললাম, 'এসব কথা বলার জন্যে আমাকে বেছে নিলে কেন?'

ঃ আমাকে আজ রাত্রেই একটা স্থির সিদ্ধান্ত নিতে হবে। কেননা ভোর বেলাতেই আমাকে বেরিয়ে পড়তে হচ্ছে এক লম্বা জার্নিতে। তোমাকে প্রথম দেখেই মনে হয়েছিল, এই সেই মানুষ যার কাছ থেকে সাহায্য পাবো আমি। কিন্তু আমার ধারনা ছিলো ভুল। না, তোমাকে আমার বলার

আর কিছুই নেই। যদি ইচ্ছে হয়, আমাকে জড়িয়ে ধরে থাকতে পারো।.....যদি ভয় না পাও আমাকে।.....

আমি হাঁটতে হাঁটতে তার কাছে গেলাম। জড়িয়ে ধরলাম নিবিড় ভাবে। তারপর চুমো খেলাম। ওর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম নিঃশব্দে।

কী দেখছো অমন করে?—সে জিজ্ঞেস করলো।

কী দেখছি?' আমি বললাম, 'কিছুই দেখছি না। একদম কিছু না। কেননা তোমার চোখের দিকে তাকানো আর অন্ধকারে আয়না দেখা একই ব্যাপার।'

আমার চোখ তো আসলে আঁধারের আয়নাই। তোমাকে দেবার মাতো আমার কিছুই নেই।' কথা বলতে বলতে সে যেন ভেঙ্গে পড়লো। মনে হলো, সে এমুহূর্তে আমার নিষ্ক্রমন কামনা করছে। হঠাৎ মহিলা বলে উঠলো ওহ্ হো, কথাটা বলতে তো তুলেই গেছি। ভদ্রলোক এটা দিতে বলেছিলো তোমাকে।' কথা শেষ হলে এক খানা দীর্ঘ খাম আমার হাতে তুলে দিলো সে। বললো, 'রহস্যময় ভাবে হঠাৎ প্রস্থানের কারনটি হয়তো এর মধ্যে লেখা আছে!' আমি খামটা হাতে নিলাম এবং তার কথায় সায় দিলাম। আমার ভয়, যদি সে এক্ষুনি আমাকে দৌড় দিতে বলে? বলে ওঠে, যদি বাঁচতে চাও তো পালাও!

খামটা খুললাম আমি রাস্তায় নেমে। তাতে বিশ ডলারের নোট এবং একটা সাদা কাগজে লেখা 'তোমার জন্যে শুভেচ্ছা!'

ব্যাপারটা আমার কাছে মোটেই অভাবিত মনে হলো না। এরকমটা যে হতে পারে, তা ওই লোকটিকে এক পলক দেখেই যেন আমি বুঝতে পেরেছিলাম।

এই ঘটনার ক'দিন পর আমি একটা গল্প লিখলাম—'ফ্রী কান্তাসিয়া।'

লেখাটি শেষ হতে না হতেই তা নিয়ে গেলাম উলরিককে শোনাবার জন্যে। খুব উচ্চস্বরে পড়ছিলাম আমি লেখাটি। অন্ধের মতো লিখেছিলাম। শুরু এবং শেষ নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামাইনি। মগজের মধ্যে আমার একটি ইমেজই সক্রিয় ছিলো। আর তো যেন একটা কম্পমান জাপানি লণ্ঠন।

লেখাটি শুনে উলরিক ভাবলো, এ এক অসাধারণ সৃষ্টি। যদিও সে অকপটে স্বীকার করলো এর মাথামুণ্ডু কিছুই সে বুঝতে পারেনি। সে চেয়েছিলো, লেখাটা আমি আইরিণকেও দেখাই। প্রায় শেষ রাত্তিরে আইরিণ উলরিকের সঙ্গে তার ষ্টুডিওতে ফিরেছে। সবাই চলে গেলে আইরিণ জোঁকের মতো পেঁচিয়ে ধরে শুয়েছে উলরিককে। তারপর কী চলেছে, তা বলাই বাহুল্য। উলরিকের মতে, একটা মেয়েমানুষকে তিনবার লাগালেই মোটামুটি সে তৃপ্তি পায়। কিন্তু আইরিণকে লাগাতে হয় সারারাত।—'মাগিটা আসছেই।' মন্তব্য উলরিকের। বলে:—ওর পঙ্গু স্বামীর নুনুটাকে ও নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে ছিঁড়ে ফেলেছে।'

সেদিনকার সেই ঘটনা খুলে বলতেই উলরিক মাথা দোলাতে

দোলাতে বললো, 'খোদার কসম, 'এরকম ঘটনা আমার বেলায় কখখনো ঘটেনা। তুমি না হয়ে অন্য কেউ এ গল্প বললে আমি মোটেই তা বিশ্বাস করতাম না। তোমার জীবনটাই যেন এই রকম সব আশ্চর্য গল্প দিয়ে তৈরী। আমি এরকম ঘটনা স্বপ্নেও দেখিনা। তা মিয়াভাই, মেয়েলোকটার নাম কী?'

সিলভিয়ার কথা বলছো?

হ্যাঁ। সেই খাসা মালটার কথাই। তা, ওর ওখানে আর পাঁচটা মিনিট দেরী করলেও তো পারতে।'

তা পারতাম। তবে সত্যি কথাটা কি জানো, ওইরকম একটা সময়ে ওকে উপভোগ করার মতো মানসিকতা আমার আদপেই ছিলোনা। মনে হচ্ছিলো, যতো তাড়াতাড়ি পালাতে পারি, ততো ভালো!'

আশ্চর্য আর আশ্চর্য। এরকম ঘটনা আমার জীবনে কেন ঘটেনা!'

রাখো এসব কথা। আজ রাত্রে আমি তোমাকে খাওয়াবো।

আর কালকেই আমার কাছ থেকে গাড়ি ভাড়া আদায়। করবে।

তাতে কোনো ক্ষতি আছে কি?

আহ্‌হা ভুল বুঝছো কেন? আমি কি সেভাবে বলেছি? তুমি আমাকে কি মনে করো, বলোতো।

আমরা চায়না টাউনে গিয়ে রাতের খাবার খেলাম। বাসায় ফেরার সময় উলরিক জোর করে আমার পকেটে দশ ডলার

গুঁজে দিলো। আসলে সে আমার প্রতি তার সহানুভূতি প্রমান করতে চায়। আমরা একটি পার্কে গিয়েও বসলাম খানিকক্ষনের জন্যে। তারপর দু'জনের ভবিষ্যত পরিকল্পনা সম্পর্কে দীর্ঘ আলাপ।

নাচের আসরে দেখা হলো মারার সঙ্গে। নাচগান হৈ হুল্লার পর সাবওয়ে স্টেশন থেকে ওর বাড়ী পর্যন্ত হেঁটেই গেলাম আমরা দু'জন। পথে একটা গাছের নীচে বসে কথা বলবার সময় দু'জনেই হয়ে পড়েছিলাম উত্তেজিত। এক পর্যায়ে ওর পোশাকের ভেতর হাত চালিয়ে দিলাম আমি। সে-ও অবশ্য খপ্ করে ধরে ফেলেছে আমার নুনু। দু'জনেই বসেছি গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে। বেশ রাত হয়েছে। আশে পাশ জন প্রাণীর নাম-নিশানা নেই। আর কথা কি? সে হাতের মুঠোয় ধরে ফ্লাইয়ের ভেতর থেকে বাইরে নিয়ে এলো আমার শিশ্ন। এখন সেটিকে জায়গা মতো পুর্নবাসিত করার অপেক্ষা। হঠাৎ গাছের ওপর থেকে আমাদের ওপরে আছ্ড়ে পড়লো একটা কালো বেড়াল। সে কি তার তেজ—সে কি ফোঁস ফোঁস। আতঙ্কে কাঠ হয়ে গেছি তখন আমরা। ব্যাপারটা কি? আমার কোটের কাপড়ে ওর নখ আট্কে যাওয়ায় আমি বেশ ভালো মতো পেটাতে শুরু করলাম শয়তানটাকে। ও-ও আমাকে আঁচড়ে কামড়ে রক্তাক্ত করে ফেললো। মারা তো ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে এক রকম অজ্ঞান। আমরা খানিকটা দুরে একটা ফাঁকা জায়গায় ঘাসের ওপর বসলাম। বেড়ালের কামড়ে

আমার কোনো বিদঘুটে ব্যারাম হয় কিনা, তা নিয়ে মারার সেকি দুশ্চিন্তা। সে দৌড়ে বাড়িতে গিয়ে ঢুকলো এবং আয়োডিন টায়োডিন কীসব যেন নিয়ে এলো। ও বাড়িতে যাবার পর আমি একাই ওখানে চিৎ হয়ে শুয়ে ছিলাম। রাত্রিটা বেশ উষ্ণ। আমি চোখ মেলে আকাশের তারা দেখছিলাম। একটা মহিলা চলে গেলো আমার পাশ দিয়েই, কিন্তু আমাকে লক্ষ্য করেনি। মৃদুমন্দ হাওয়ার স্পর্শে আমার শিস্ন আবার উত্তেজিত হয়ে উঠতে শুরু করেছে। এমনি সময়, মারা এসে পৌছবার সঙ্গে সঙ্গে সেটি লম্ফ ঝম্প শুরু করে দিলো। মারা ব্যাণ্ডেজ হাতে হাঁটু গেড়ে বসেছে আমার পাশে। আমার নুনুটা তার মুখ খানাকে প্রায় ছোঁয় ছোঁয়। সে পরম আদরে তাতে চেপে ধরলো। সঙ্গে সঙ্গে ওকে আমার বুকের ওপর চেপে ধরলাম দু'হাত দিয়ে। পাশে গড়িয়ে পড়লো তুলো ব্যাণ্ডেজ আয়োডিনের শিশি। তারপর আরম্ভ হলো আমাদের আদিম, অনন্ত উৎসব। মনে হলো এ উৎসবের বুঝি আর শেষ নেই।

চেতনা ফিরে এলে দেখি, আমি তেমনি চিৎ হয়ে শুয়ে আছি ঘাসের উপর। আর মারা আমার জখমী জায়গা গুলোর ওপর লাগিয়ে দিচ্ছে ওষুধ। আমি আস্তে আস্তে উঠে বসলাম। সিগারেট ধরিয়ে নিলাম দু'জনে। এমন স্বাভাবিক ভাবে কথাবার্তা বলতে লাগলাম যেন কিছুই হয়নি। শেষে উঠে পড়লাম। ওকে পৌছে দিলাম ওদের বাড়ির দোর

গোড়া পর্যন্ত। সেখানেও জড়িয়ে ধরে রাখলাম ওকে অনেক ক্ষন। সে—ও আমাকে জাপ্টে ধরে দাঁড়িয়ে রইলো আচ্ছন্নের মতো।—'তোমাকে আর যেতে দিচ্ছি না! —আদুরে গলায় বললো মারা। বলতে বলতে আবার ঝাঁপিয়ে পড়ে আমাকে চুমো ক্ষেতে লাগলো ক্ষ্যাপার মতো। তারপর আমার শিস্নটা ধরে নিজের যোনির মধ্যে ঢুকিয়ে দিলো আশ্চর্য নৈপুন্যেরসঙ্গে। ওর প্রায় গা ঘেঁষেই একটা গর্ত। আমি ওকে টেনে ইঞ্চি কয়েক সরিয়ে আনতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু সে চেঁচিয়ে বললো, বের কোরোনা, বের কোরোনা!—যেন সে সকাতর প্রার্থনা জানাচ্ছে—'আমি পাগল হয়ে যাবো। আমাকে করো, আমাকে করো, করো করো করো!' যেন একটা শূকরীর সঙ্গে আমি যৌন সঙ্গমে লিপ্ত। যার খাঁই সহজে মেটেনা। সঙ্গমের সঙ্গে সঙ্গে তার মুখটা ক্রমেই বড়ো হয়ে যাচ্ছিলো। চোখ দু'টি যেন ফেটে বেরিয়ে যাবে। যেন এক্ষুনি সে অজ্ঞান হয়ে পড়বে মৃগী রোগীর মতো। আমি আমার নুনুটা ঠাণ্ডা করার জন্যে একটু খানি বের করেছিলাম। ও পাশের ডোবা থেকে পানি নিয়ে আমার শিস্ন ভেজাতে লাগলো চমৎকার কাজ হলো তাতে। পর মুহূর্তে তার দু'হাঁটু আর হাতের তালু মাটিতে। সে আমার ওপর হামাগুঁড়ি দিয়ে আছে। ভয়ঙ্কর রকমের কামাতুর গলায় সে বললো,' এবার আমার পাছা দিয়ে দাও। আমি তৈরীই ছিলাম। সে প্রচণ্ড চাপ দিয়ে আমার উর্ধমুখী শিস্নের ওপর বসে পড়লো। আমিও

নীচ থেকে ঠেলা দিলাম যথারীতি।—'যন্ত্রনায় সামান্য কাঁৎরে উঠলো মারা। সেই সঙ্গে যেন আনন্দেও।—'ওটা বড়ো হচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, বড়ো হচ্ছে।' সে জড়ানো গলায় বলতে থাকলো,—ঢোকাও, ঢুকিয়ে দাও—যতো খানি পারো। একদম আমার ঘিলুতে নিয়ে ঠেকানো চাই। ছিঁড়ে যায় যাবে। আমি থোড়াই পরোয়া করি।'

কারবার চলছিলো। কিন্তু আমার রক্ত ঠাণ্ডা। আমি রক্তের প্রানী। ও যতোই দাপাদাপি করুক, আমি নির্বিকার। সহজে পড়ে যাবো না। তাই, বেশ ঠাণ্ডা মাথায় এই খেলা চালিয়ে যেতে যেতে আমি পর্যবেক্ষকের চোখে ব্যাপারটা লক্ষ্য করছিলাম। অবশ্য দু'হাতে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছি ওর পাছা। আর ওর ইচ্ছে মতোই আমার চাপ বাড়াচ্ছি কমাচ্ছি। 'লাগাও, লাগাও!—খবর্দার, থামবেনা। তাহলে কিন্তু আমি পাগল হয়ে যাবো।' আমি ওর প্রার্থনায় সাড়া দিয়ে চললাম। আর ও মুখ দিয়ে শব্দ করছিলো, 'ওহ্ আহ্!' অল্পক্ষনের মধ্যেই একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণ। বিদ্যুৎস্পৃষ্ঠ তিমি মাছের মতোই আমি ছিটকে পড়লাম খানিকটা তফাতে।

গা হাত পা ঝেড়ে ওর বাড়ির দিকে আমরা আবার এগিয়ে গেলাম। একটা কোনায় থেমে পড়ে, মৃদু হেসে বললো—উহ্ কী কুৎসিত সেই হাসি—'আর এখন সেই খারাপ কথাটা। সেই নোংরা আবদার!'

: তার অর্থ?—'আমি বোকা বোকা ভাবে জিজ্ঞেস করলাম।

'কি বলছো তুমি ?'

'না, মানে বলছিলাম কি—গোটা পঞ্চাশেক ডলারের দরকার। আমার কালকেই লাগবে। হ্যাঁ কালকেই।···এখন কি তুমি বুঝতে পারছো, তোমাকে কেন সঙ্গে নিয়ে বাড়িতে ঢুকিনি।'

: বেশ তো, যোগাড় করে দেয়া যাবে। তোমার যখন এতো দরকার।, আমি বললাম।

: কিন্তু আমার এক্ষুনি দরকার। তুমি কি দুপুরের মধ্যে দিতে পারবে ? কীসের দরকার' তা জিজ্ঞেস কোরোনা। আমার দরকার, বড্ড দরকার। তুমি পারবে তো ? আমার গা ছুঁয়ে বলো।'—

: নিশ্চয়ই পারবো।' আমি মাথা নেড়ে জানালাম। কিন্তু এতো তাড়াতাড়ি অতোগুলো টাকা কীভাবে যোগাড় হবে—এ চিন্তায় আক্রান্ত হতেও দেরী হলো না আমার।

: তুমি এতো ভালো।, সে আমার হাত ধরে বললে। তোমার কাছে টাকা চাইতে আমার কি ইচ্ছে করে ? আমি তো সব জানি। তোমার টাকা নেই। অন্যের কাছে টাকা চাইতে আমার ঘেন্না হয়। কিন্তু কি করবো বলো। আমি তো নিরুপায়। আমাকে বিশ্বাস করো। আমি এক সপ্তাহের ভেতর তোমার টাকা ফেরত দেবো।'

: কী বলছো, মারা! আমি টাকা ফেরৎ চাই না। তোমার দরকার হলেই আমাকে জানাবে। আমি গরীব হতে পারি। কিন্তু টাকা যোগাড় করতে কোনো অসুবিধে হবে না। দরকার

হলে আরো বেশী টাকা যোগাড় করবো। তোমাকে এই আস্তাকুঁড় থেকে বাইরে নিয়ে যাবো। আমি তোমাকে আর এখানে দেখতে চাই না।'—আমি বললাম।

ঃ ওসব কথা এখন যাক! বাড়ি গিয়ে টাকার যোগাড় করোগে। কাল সাড়ে বারোটা নাগাদ টাইম্‌স স্কোয়ারের সেই ওষুধের দোকানের সামনে দেখা করো। কেমন?

ঃ নিশ্চয়ই। আমি জবাব দিলাম।

আমি মাঝেমধ্যে বাবার কাছ থেকে ধার নিতাম। সে টাকা নিয়মিত পরিশোধের মাধ্যমে আমি আমি তাঁর আস্থা অর্জন করেছিলাম। অবশ্য খুব বেশী ঠেকে না গেলে তাঁর কাছে যেতাম না। যাই হোক, তাঁর কাছে গিয়ে বললাম, 'পঞ্চাশটা ডলার দিন!'

আশ্চর্যের ব্যাপার, তাঁর হাতে অতো টাকা নেই তখন। এমনকি, ব্যাঙ্কে ও না। তবে তিনি নিরাশ করলেন না। বললেন, 'ঠিক আছে, কারো কাছ থেকে ধারটার করে দেয়া যাবে।

ঃ হপ্তাখানেকের মধ্যেই ফেরৎ দেবো টাকাটা।' আমি বললাম।

ঃ সেজন্যে দুর্ভাবনার দরকার নেই।' তিনি জবাব দিলেন। —'যখন পারো দিয়ো। আগে ঝামেলাটা চুকিয়ে নাও!'

ঠিক কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে বারোটার সময় আমি মারার হাতে টাকাটা তুলে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গেই মারা দৌড় দিলো। যাবার সময় কোনোমতে বলে গেলো, আগামীকাল দেখা হবে প্যাগোডা টী-রুমের বাগানে। মনটা খুশিতে ভরে আছে।

গেলাম কস্টিগানের অফিসে। কিন্তু সে অফিসে নেই। তবে একটা কেরানী আমাকে সাদর অভ্যর্থনা জানলো। বললো, 'আপনাকে ধন্যবাদ জানাবার ভাষা আমার নেই।'

: 'ধন্যবাদ!' আমি খানিকটা বিস্মিত হয়ে বললাম।

: তা নয় তো কি?' কেরানী বললো, 'ভাইপোটার চিকিৎসার সময় আপনি যে সাহায্য করেছিলেন! ওহ্, ভোলা যায়না! মনোবিজ্ঞানীর কাছে ওকে নিয়ে গিয়েছিলেন তো আপনিই।'

এতোক্ষনে মনে পড়লো আমার। কেন্টাকী থেকে এসেছিলো ছেলেটা। রানওয়ে-বয়। রানার। ছেলেটা অভিনেতা হতে চেয়েছিলো। কিন্তু ওর পেশীগুলো ছিলো অকেজো। হাসপাতালের লোকেরা বলেছিলো, ও একটা চোর। প্রায়ই এটা ওটা চুচি করে। কিন্তু আদতে সে ছিলো খুব ভালো ছেলে। সে যন্ত্রনা সইতে না পেরে একবার মনোবিজ্ঞানীর অণ্ডকোষে লাথি মেরে—ছিলো। সেই কারনেই ওরা নানা অপবাদ রটায় ওর নামে। ঘটনাটা শুনে হাসতে হাসতে আমার তো প্রায় অজ্ঞান হবার অবস্থা।

৩

শনিবারের অপরাহ্ন। সূর্যের তেজ খুব প্রখর। ডাঃ ওয়াচি হাচি তাও-এর বাগানে বসে চীনা চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিচ্ছি। সে কিছু ক্ষন আগে আমার হাতে তুলে দিয়েছে মায়ের ওপর লেখা একটি কবিতা। খুব অভিজাত মনে হচ্ছে তাকে; কিন্তু তা ও তে চিং সম্পর্কে আমার কোনো ধারনা নেই। আসলে আমি এখানে বসে অপেক্ষা করছিলাম, মারার জন্যে। তাছাড়া মায়ের ওপর লেখা কবিতা আমি পছন্দও করিনা। আমি প্রতীক্ষা করছিলাম। এমন সময় এক ভদ্রলোক—মনে হয় দর্শনের অধ্যাপক—মৃদু হেসে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এক ভদ্রমহিলা আপনার সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলতে চান।' ফোন করেছে মারাই বটে। আমাকে বিশ্বাস করতে বলছে সে, যে এইমাত্র সে শয্যাত্যাগ করলো। হ্যাং ওভাবে ছিলো নাকি এতোক্ষনি। তার সঙ্গে আছে ফ্লোরি ও। তারা কাছেই একটা হোটেল থেকে কথা বলছে। কোন্ হোটেল? একথা জিজ্ঞেস করলে মারা চুপ করে রইলো। একটু পরে বললো, সে এক্ষুনি আসছে। আধ ঘণ্টার বেশী দেরী হবেনা। কিন্তু আরো আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করবার মতো মনের অবস্থা

তখন নেই আমার। মেজাজটা খিঁচড়ে আছে খুব। একে তো সে কথা রাখেনি। তার ওপর মাতাল হয়ে গিয়েছিলো। তার সঙ্গের লোকটাই বা কে? আমার জানা দরকার।

লোকটার নামের আদ্যাক্ষর কি 'সি?' কিন্তু এই ধরনের প্রশ্ন সে পছন্দ করেনা। এভাবে কথা বলবার অধিকার সে কাউকে দেয় না। ঠিক আছে, তাহলে আমি এভাবে বলছি' শুনতে পাচ্ছো? তুমি কোথায় আছো বলো, আমি এক্ষুনি সেখানে চলে আসছি। যদি না বলো, তাহলে গোল্লায় যাও। আমি আর পারছি না···হ্যালো, মারা!

জবাব নেই। হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি এবার। সঙ্গীর কথা করতেই সে অমন থমকে গেছে। তাইতো। ঠিকই তো কুত্তী-টাই তো এসবের জন্যে দায়ী। ফ্লোরি মাগিকে কে না চেনে। একশো তিন পাউণ্ডের একটা কামুক নাংস পিণ্ড। যে নাকি জীবনে ও তার মাপ মতো নুনু পায়নি। বড়ো নুনু পায়নি! সেই কুকুরীর সঙ্গে মারার কী সম্পর্ক?

সময় যায়। যায়। কোনো জবাব নেই। বেশ কিছুক্ষন পর তার বিব্রত গলার আওয়াজ, তার সঙ্গে কোথাও ডিনারে বসবার সময় হবে কিনা। খুবই জরুরী কথা নাকি আছে। তার কণ্ঠস্বরে এমন একটা ভারিক্কী ভাব লক্ষ্য করলাম, যা আগে কখনো শুনিনি।

কিন্তু আমি কিছু বলবার আগেই অকুস্থলে ক্রনস্কির আবির্ভাব। আমি তাকে হাত নেড়ে এখানে আসতে বারন করার আগেই

সে আমার গা ঘেঁষে এসে দাঁড়ালো। 'অতো তাড়াহুড়ো কীসের!' তার জিজ্ঞাসা। অসময়ে বাগ্‌ড়া দেবার ব্যাপারে সে প্রায় অদ্বিতীয়। আমি ব্যাখ্যা করলাম, 'এক জায়গায় একটা কাজ আছে।'

: তুমি কি খেতে যাচ্ছো কোথাও?'

: হ্যাঁ, আমি খেতে যাচ্ছি। তবে একা।' সংক্ষেপেই বললাম আমি।

: না না মিস্টার মিলার। এ তো হতেই পারেনা। আপনি নিশ্চয়ই কারো সঙ্গ কামনা করছেন। আপনার সাহচর্যের দরকার। আমি তা পরিষ্কার বুঝতে পারছি। এমন চমৎকার দিনে···আপনি···আপনাকে বেশ উদ্বিগ্ন মনে হচ্ছে। নিশ্চয়ই কোনো মেয়ে মানুষ—তাই না?'

: শোনো ক্রনস্কি আমি একজনের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। এবং আমার সঙ্গে তুমি থাকবেনা।

: এ কি বলছেন মিস্টার মিলার। একজন পুরনো বন্ধুর সঙ্গে এরকম কথা আপনি কীভাবে বলছেন? আমি আপনার সঙ্গে যাবোই। খাবারের দাম দেবো আমিই। আপনি বাধা দেবেন?'

না হেসে পারলাম না। বললাম, 'ঠিক, আছে, জড়ো করো তবে ওসব গুমৃত। তোমার সাহায্যের দরকার আমার হতেও পারে। কিন্তু দ্যাখো মিয়া, আবোল—তাবোল কোনো কথা যেন না-শুনি। না-দেখি কোনো এলেবেলে কাজ। আমার

প্রেমিকার সঙ্গে আমি তোমার পরিচয় করিয়ে দিতে যাচ্ছি কিন্তু। সে তোমার উঁকি ঝুঁকিটা খুব সম্ভব পছন্দ করবে না। যাই হোক তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবো। ওকে আমি বিয়ে করবো কোনো এক সময়। মনে হয়, তোমরা একজন অন্য জনকে সহ্য করতে পারবে না।'

: হুঁ, এই কথা!' আমার কিন্তু ব্যাপারটা খুব সুবিধের বলে মনে হচ্ছেনা। মিস্টার মিলার, আপনাকে বাঁচাবার জন্যে আমাকে এখন থেকেই ব্যবস্থা নিতে হবে।'

: অযথা নাক গলাতে এলে ভালো হবে না কিন্তু!' আমি ক্ষ্যাপার মতো হাসতে হাসতে বললাম, 'এই মেয়েটির ব্যাপারে আমি খুব আন্তরিক। অন্ততঃ তুমি কি কখনো আমাকে কোনো মেয়ের ব্যাপারে এতোটা আগ্রহী দেখেছো?' কি, তোমার বিশ্বাস হচ্ছেনা?' ঠিক আছে, ব্যাপারটা দেখে যাও। দ্যাখো আমার আন্তরিকতা খাঁটি না মেকী। কিন্তু অযথা বাগড়া দিলে তোমাকে আমি ঠাণ্ডা মাথায় খুন করবো!'

আশ্চর্য তো! হঠাৎ মারা এসে রেস্তোরাঁয় হাজির। এক অন্ধকার কোনে একটা নির্জন টেবিল সে বেছে নিলো।

: মারা!'—আমি বললাম, 'ইনি আমার পুরনো বন্ধু, ডক্টর ক্রনস্কি। কিছুতেই একে ভাগাতে পারলাম না। আশা করি, তুমি কিছু মনে করবেনা!' আমাকে তাজ্জব করে দিয়ে মারা তাকে সাদর সম্ভাষণ জানালো। ক্রনস্কির তো মোমের মতোই গলে যাবার অবস্থা। নীরব বন্দনায় তার জুড়ি নেই—আমি

জানি। বিশেষ করে সুন্দরী মেয়েদের সামনে তার দু'টি অদৃশ্য পাখা যেন মৃদু গুঞ্জনধ্বনি তোলে ভ্রমরের মতো।

মারা অন্য দিনের চেয়ে অনেক স্বাভাবিক, সুন্দর। তার কথা গুলোকে মনে হচ্ছে সম্মোহনী মন্ত্র। খাবারের অর্ডার দেবার পর দু'একটি কথাবার্তা হয়েছে। ক্রনস্কি মারার মুখের দিকে সরাসরি তাকিয়ে বলে উঠলো, 'কিছু একটা হয়েছে। দুঃখ-জনক কিছু একটা। আমি বেশ বুঝতে পারছি। তোমরা আমাকে যেতে দিলে আমি অবশ্য চলে যেতে পারি। তবে সত্যি বলতে কি, আমি থাকতেই চাই। হয়তো কোনো সাহায্যে আসতে পারি তোমাদের। আমি এর বন্ধু। তোমার ও বন্ধু হতে চাই আমি। কথাটা কিন্তু অকপটেই বলছি।'

মারাকে স্পর্শ করলো ক্রনস্কির এই বক্তব্য। সে সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিলো, 'আপনি থাকুন। আপনি থাকলে আমি খোলা খুলি আলাপ করতে পারবো। আপনার কথা এর কাছে অনেক শুনেছি। কিন্তু আমার মনে হয়েছে, বন্ধুর কাছ থেকে সুবিচার পান নি আপনি। কথাটা শেষ করেই সে আমার দিকে তাকিয়ে হেসে উঠলো।

: না!' আমি তাড়াতাড়ি বললাম, 'একথা সত্যি যে তার প্রকৃত চিত্রটি আমি তুলে ধরিনি।' তারপর ক্রনস্কির দিকে ঘুরে বসলাম, ,ক্রমস্কি, তুমি তো, নিজেই জানো যে, তুমি কতোটা অপ্রিয় চরিত্রের মানুষ। এবং এ পর্যন্ত —

: বলো বলো!' ক্রনস্কি বলে উঠলো, 'দ্যাখো, আমার

সামনে দস্তয়েফস্কীর লাইন আউড়াবে না। তুমি বলতে যাচ্ছিলে, আমি তোমার ইভিল জিনিয়াস। সে যাই হোক, আমরা দু'জন কিন্তু দু'জনের কাছেই খুব পরিস্কার। আমি তোমাকে আন্তরিকভাবে পছন্দ করি। তুমি যা চাও, আমি তাই দিই। আমার অতি আপন জনও যদি তাকে আঘাত পায়—আমি পরোয়া করিনা। আমি তোমাকে সবার ওপরে স্থান দিই। এ মুহূর্তে আমার খুব দুঃখ হচ্ছে—জানো? আমি দেখতে পাচ্ছি, তোমারা পরস্পরকে ভালোবাসো। কিন্তু……'

: তুমি ভাবছো মারার জন্যে এই প্রেম যথেষ্ট উষ্ণ নয়? তাই না?

: সে কথা আমি বলছি না।' সে খুবই গম্ভীর ভাবে বললো, 'তোমরা দু'জনই দু'জনের জন্যে বেশ খাপ খেয়ে গেছো।

: তাহলে তোমার মনে হচ্ছে, আমি সত্যিই তার উপযুক্ত?—মারা জিজ্ঞেস করলো ক্রনস্কিকে। তার কণ্ঠস্বরে আন্তরিকতার অভাব সত্যিই নেই।

আমি অবাক হয়ে তাকালাম ওর মুখের দিকে। সে একজন উট্‌কো লোকের সামনে এরকম একটা কথা বলতে পারে, তা ছিলো আমার ধারনার বাইরে। কথাটা শুনবার পর পরই গরম হয়ে উঠেছে ক্রনস্কি। সে চেঁচিয়ে উঠলো, আপনি তার উপযুক্ত কিনা, সেই কথা জিজ্ঞেস করছেন? কিন্তু প্রশ্ন তো ওটা নয়। প্রশ্ন হচ্ছে, ও, আপনার উপযুক্ত কিনা। জীবনে সে এমন কী করেছে, যার দরুন নিজেকে একটা মহিলার কাছে যোগ্য বলে

দাবী করবে ? আমি যদি আপনার জায়গায় থাকতাম, তাহলে এতোটা তাড়াতাড়ি ওর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করতাম না। প্রেমিক অথবা স্বামী হিসেবে তো দূরের কথা এমনকি একজন বন্ধু হিসেবেও সে ভালো নয়। লক্ষ্মী মারা, আপনি—তুমি এ নিয়ে মাথা ঘামিও না। ওকে তোমার জন্যে কিছু করতে দাও। ওকে জানতে হলে ওর অপাদ মস্তক উন্মোচিত করতে হবে। ওকে চাপের উপর রাখতে হবে সব সময়। নইলে তুমি হেরে গেলে। না, না, মানুষ সে খারাপ নয়। সে দয়ার্দ্র বলেই ভুল করে বসে। সে যখন তোমার পুকুরে বঁড়শি ফেলবে, তখন তোমাকে বিশ্বাস করতে সে বাধ্য করবে যে হৃদয় উজাড় করে দিয়েছে। সে তোমাকে কাঁদিয়ে পালাতে পারে এবং স্মিত হেসে বলতে পারে—তোমার মঙ্গলের জন্যেই যাচ্ছি।

: তুমি ওর সম্পর্কে যতোটা জানো,—মারা এখন তুমিই বলছে—আমার পক্ষে ততোটা যানা সম্ভব নয়। কেননা সে তোমার পুরনো বন্ধু। তবে আমার সঙ্গে এ পর্যন্ত সেরকম কোনো আচরণ সে করেনি। আমি তাকে শান্ত, ভদ্র বলেই জানি। আশা করি, এর অন্যথা কখনো হবে না। আমি কেবল তাকে ভালোই বাসিনা। আমি তাকে বিশ্বাস করি। তাকে খুশি করার জন্যে যে কোনো ত্যাগ স্বীকারে আমি প্রস্তুত।'

: কিন্তু এ মুহূর্তে তুমি সুখী নও —। ঠিক বলেছি কিনা ? আচ্ছা বলোতো, সে তোমার জন্যে কী করেছে ? তোমাকে

খুশি.....

ঃ সে কিছুই করেনি।'—মরো দৃঢ়তার সঙ্গে বললো, 'কেননা আমার কী অসুবিধা—সে কথাই তো ও জানেনা।'

ঃ ওরকম চাপাচাপি করছো কেন?' আমি ক্রনস্কির দিকে তাকিয়ে বললাম, 'সময় হলেই ও সব কথা আমাদের কাছে খুলে বলবে।' আমার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ক্রনস্কি নীরব হলো। চেয়ে দেখি, মারার দুচোখ থেকে পানি বেরিয়ে এসেছে।' কিন্তু পরমুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিয়ে পাশের ওয়াশ-রুমের দিকে চলে গেলো সে। ক্রনস্কির সারাটা মুখ কেমন ফ্যাকাশে—রক্ত হীন।

ঃ ব্যাপারটা অমন ভাবে নিয়ো না।' আমি বললাম, ঘটনা যাই ঘটুক, মেয়ে সাহসী। ঠিক সামলে নেবে!'

ঃ কী বলছো আবোল তাবোল? ক্রনস্কি দুচোখ বিস্ফোরিত করে বললো, আমার দৃঢ় বিশ্বাস; মেয়েটা কোনো ঝামেলায় পড়েছে। তুমি বুঝতে পারছো না? সে চায়, তার জন্যে তুমি কিছু করো। ঘটনা ঘটে যাবার পর তুমি সক্রিয় হলে লাভটা কী? তুমি কি ততোক্ষন কেবল অপেক্ষাই করবে? তুমি যদি তাকে সাহায্য না করো, আমি করবো। বন্ধু হে, এতোদিনে তুমি একজন সত্যিকার রমনীর সন্ধান পেয়েছো। আর জানোই তো মিস্টার মিলার, একজন প্রকৃত মহিলা একটা পুরুষের কাছ থেকে অনেক কিছু আশা করে। কেবল শব্দ আর অভিব্যক্তি দিলেই তার চলেনা। সে যদি তোমাকে তার সঙ্গে

পালাতে বলে যদি বউ ছেলেমেয়ে চাকরি বাকরি সব ছেড়ে ছুঁড়ে তোমাকে তার হাত ধরে বেড়িয়ে পড়তে বলে—বেড়িয়ে পড়ো। আমি বলছি বেরিয়ে পড়ো। ও কি বলতে চায় শোনো—নিজের মতামতকেই কেবল উর্ধে স্থান দিয়ো না।' সে চেয়ারে হেলান দিয়ে দাঁত খুটতে খুটতে বললো, 'তার সঙ্গে তোমার পরিচয় হয়েছিলো ডান্স-হলে তাই না? ওরকম একটা পরিবেশে তুমি যে খাঁটি জিনিষ চিনে নিতে পেরেছো—সে জন্য তোমাকে ধন্যবাদ না জানিয়ে পারছিনা। যদি তুমি সুযোগ দাও—এই মেয়ে তোমার জন্যে কিছু করতে পারবে। অবশ্য ইতিমধ্যেই যদি বিলম্ব না হয়ে গিয়ে থাকে! তুমি অনেক দূর এগিয়ে গেছো কিন্তু। ওই বউটার সঙ্গে যদি আর একটি বছরও থাকো, তাহলেই তুমি শেষ।' বলতে বলতে ঘেন্নায় সে থুথু ফেললো মেঝেয়। আবার মুখর হলো, 'ভাগ্য বটে তোমার। বিনা শ্রমেই পেয়ে যাও। আমি সারাদিন কুত্তার মতো খেটে কি পাই বলোতো?

ওয়াসরুম থেকে মারা বেরিয়ে এসে বললো, 'আমার সম্পর্কে মনে হয় কিছু বলাবলি করছিলে তোমরা। তা হঠাৎ থামলে কেন? বলে যাও!'

: না, তোমার সম্পর্কে কিছু বলা হচ্ছে না। বললো এনস্কি।

আমরা তোমার কথাই বলাবলি করছিলাম। আমি বললাম। 'আমার মনে হয়, ওর কাছে তোমার পারিবারিক পরিচয়টা তুলে ধরতে পারো। যেমন আমাকে বলেছিলে।'

মারার মুখ যেন মেঘাচ্ছন্ন। বললো, 'আমার পরিবারের খবর পেয়ে তোমার কী লাভ। সেখানে কোনো চমক নেই।'

: আমার বিশ্বাস হয় না। ক্রনস্কি বললো, 'মনে হয়, তুমি কিছু লুকোচ্ছো।' আমি বললাম, 'তুমি তোমার সৎ মা সম্পর্কেই না হয় কিছু বলো ওকে।'

: তোমার সৎ মায়ের বাড়ি কোথায়? জিজ্ঞেস করলো ক্রনস্কি।

: ভিয়েনা! বললো মারা।

: আর তুমি? তোমার জন্মও কি ভিয়েনায়?

: না। আমার জন্ম রুমানিয়ার এক ছোট্ট পাহাড়ি গাঁয়ে। আমার শরীরে খানিকটা জিপ্‌সী রক্ত থাকতে পারে।

: তার মানে, তোমার মা যাযবরী?

: ওরকমটাই তো শুনেছি। মা আমাকে ঘেন্না করে।

: আর তোমার বাবা?

: আমি তাঁকে পূজা করি। তিনি আমাকে খুবই ভালোবাসেন। সংসারের আর সবাই আমার কাছে আগন্তুক। বাবা হাঁটাচলা করতে পারেন না। তাই তো আমাকে পরিশ্রম করতে হয়।

: তোমার ভাইগুলো? তারা কি করে?

: কিসসু না। সব কুঁড়ের বাদশা। অবশ্য আমিই তাদের নষ্ট করেছি। দ্যাখো, মাত্র ষোলো বছর বয়সেই আমাকে জীবিকার ধান্দায় বাইরে বেরুতে হয়। প্রায় বছর খানেক আমার বাড়ির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক ছিলোনা। ফিরে এসে দেখি, সংসার তছনছ হয়ে আছে। সবাই মরো মরো। তখন আমাকেই

হাল ধরতে হলো।'

: তার মানে, পুরো সংসারের ভার তোমার ওপর ?

: আমি চেষ্টা করি সে ভার বইতে। মাঝেমধ্যে ক্লান্তি আসে। মনে হয় আর তো পারিনা। এবার ছেড়েছুঁড়ে দিই। কিন্তু পারি কোথায়। আমি কেটে পড়লে সব ক'টা না খেয়ে মরবে।

: বোকা মেয়ে তোমার তো কেটে পড়াই দরকার! বললো ক্রনস্কি।

: আমি পারিনা। বিশেষ করে বাবা যেহেতু এখনো জীবিত তাঁর জন্যে দরকার হলে বেশ্যাবৃত্তি করতেও আমি পেছপা নই।

: তারা তোমাকে ও পথে যেতেই বাধ্য করবে।' —ক্রনস্কি বললো—দ্যাখো মারা, তুমি পড়ে গেছো এক মস্ত বড়ো গ্যাঁড়াকলে। ভূতের বোঝা তুমি টানবে কেন ? যারটা সেইই যোগাড় করে খাক। তুমি কেবল তোমার বাপকে নিয়ে কেটে পড়ো অন্য কোথাও ? তাঁকে দেখাশোনা করার ব্যাপারে আমরা তোমাকে সাহায্য করবো। তিনি কি জানেন, তুমি কোত্থেকে টাকা আনো ? তিনি কি জানেন, তুমি ডান্স-হলে চাকরি নিয়েছো ?

: না, তিনি জানেন না। তাঁর ধারনা, আমি নাটক করি। তবে মা জানে।

: জেনে ও কিছু করেন না ?

: করবেন ? তিনি ?—মারার, মুখটা ঘৃনায় বেঁকে গেলো। 'তিনি তো টাকা পেলেই খুশি। আমাকে তো বেশ্যা বলেই

ডাকেন। বলেন, তুই তোর মায়ের মতোই খানকি?
আমি বললাম, 'অবস্থা যে এতো খারাপ তা তো বলোনি? সাংঘাতিক ব্যপার দেখতে পাচ্ছি। ক্রনস্কি ঠিক কথাই বলেছে তুমি তোমার বাবাকে নিয়ে অন্য কোথাও গিয়ে ওঠো।'
: খুব ভলো হতো।' মারা বললো, 'কিন্তু বাবা রাজী হবেন না। সৎমাকে ছেড়ে আসতে তিনি সম্মত হবেন না। মেয়ে-লোকটা বাবাকে যেন শিশু বানিয়ে রেখেছে।
: কিন্তু তোমার জীবিকার খবর যখন তিনি জানতে পারেন?
: তিনি কখনো জানবেন না।
: তাহলেতো খুবই মুশকিল। তোমার বাবাই নিজের মঙ্গল চান না। তিনি চান মরতে।
: কিন্তু আমাকে তো বাঁচতে হবে। আমি বাঁচতে চাই।'
: ও কথা তো সবাই বলে। কিন্তু শুধু কথায় তো আর কাজ হবে না। আসলে এই পচা পুঁজিবাদী ব্যবস্থাই যতো গণ্ড-গোলের মূলে। একে শিকড় সুদ্ধ ওপড়াতে না পারলে' সমাধান সুদুর পরাহত!
: এ তত্ত্বও পচে গেছে। ওই'—মারা যেন রীতিমতো মুষড়ে পড়লো—তোমরা ভেবেছো, বেঁচে থাকার জন্যে আমাকে একটা বিপ্লব পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে!' এখনি একটা কিছু করা দরকার। এ সমস্যার সমাধানে বিলম্ব হলে আমাকে বেশ্যায় রূপান্তরিত হতে হবে। অবশ্য একটু আলাদা ধরণের বেশ্যা—এই আরকি? বুদ্ধিমতী বারবণিতা বলতে পারা যায়!'

ঃ বুদ্ধিমতী বেশ্যা বলে কিছু নেই।'—ক্রুনস্কি বললো, 'যার বুদ্ধি আছে, সে যদি দেহ না-খাটিয়ে মগজ খাটায়; সেটিই কি ভালো নয়? আচ্ছা, তুমিও তো তোমার বুদ্ধির সহায়তা নিতে পারো। আমার মনে হয়, একজন স্পাই হবার ব্যাপারে এটাই তোমার শ্রেষ্ঠ সময়। তুমি রাজী থাকলে বলো। আমার লাইন আছে ওদিকে। যোগাযোগ করিয়ে দেয়া যাবে। হ্যাঁ হ্যাঁ—এটাই সবচেয়ে ভালো কাজ হবে। কেননা, এরকম ভাবে বেঁচে থাকবার কোনো মানে হয়না। এই চিড়িয়াটির সঙ্গেও তোমার খুব খাপ খাবে বলে মনে হয়না। আর আমার প্রস্তাবে রাজী হলে? মোটা রোজগার, বুঝলে? সপ্তাহে একশো ডলার সেইসঙ্গে অন্যান্য খরচ—খরচা। কি? রাজী?

ঃ আমি ওর চেয়ে বেশীই রোজগার করছি এখন। গুলি বিদ্ধ হবার ঝুঁকি না নিয়েও।—বললো মারা।

ঃ কী?—আমরা দু'জনেই একসঙ্গে চমকে উঠে উচ্চারণ করলাম। সে হাসলো। বললো, তোমরা ভাবছো এ অনেক টাকা? তাই না? কিন্তু আমার আরো টাকার দরকার। যদি আমি ইচ্ছে করি, তাহলে কালকেই বিয়ে করতে পারি যে কোনো কোটিপতিকে। এরকম অফার আছে বেশ কয়েকটা!'

ঃ তাহলে ওদের একটিকে বিয়ে করে চট জলদি তাকে তালাক দিয়ে দাও না।—বললো ক্রুনস্কি। 'এভাবে একটার পর একটা বিয়ে করে তুমি নিজেই তো হতে পারো কোটিপতি। কিন্তু

থাক এসব কথা। এ মুহূর্তে তোমার কতো টাকা দরকার? আপাতত আমি তোমাকে তিনশো ডলার ধার দিতে পারি। ছ'মাস পর ফেরৎ দিলে চলবে। টাকাটা আমার নয় তো? তাই! শোনো, এক দৌড়ে পালিয়ে যেওনা। তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।'

মারা যেন সম্মতির জন্যেই আমার দিকে তাকালো।

: ওর পরামর্শ নিয়ো না।' ক্রনস্কি বললো—'আমি আন্তরিকতার সঙ্গেই একথা বলছি। আমি তোমাকে পছন্দ করি। আমি তোমার জন্যে কিছু করতে চাই।' বলতে বলতে সে আমার দিকে তাকিয়ে বললো, 'তুমি বাড়ি চলে যাও। নির্ভয়ে যেতে পারো। আমি তাকে ধর্ষণ করবো না।'

: আমি যাবো?—জিজ্ঞেস করলাম মারাকে।

: হ্যাঁ, প্লিজ যাও।' মারা বললো—ইডিয়েটটা কী কথা বলবার জন্যে এতো ধানাই পানাই করছে—তা শুনতে দাও অন্তত:।

ওই তিনশো ডলার সম্পর্কে আমার সন্দেহ ছিলো। যাই হোক, আমি চলে এলাম। পথ চলতে চলতে আমি কল্পনার চোখ দিয়ে কতো দৃশ্যই যে দেখেছিলাম। দেখেছিলাম ফ্লোরের ওপর উবু হয়ে আছে মারা। আর ক্রনস্কি তার হাঁটুর ওপর আলতো ভাবে টোকা দিচ্ছে। বন্দনা করছে তার রূপ লাবন্যের। বলছে, তার কাছে তিনশো ডলারের কিছু কম আছে। তবে মারা যদি তার দু'টি পা সামান্য ফাঁক করে—তাহলে বাকিটার

জন্যে সে চেষ্টা করে দেখবে। মারা তার শরীরের ভিবিন্ন জায়গায় আলতো ভাবে ছুঁতে দিচ্ছে—যেন ক্রনস্কি এতেই সন্তুষ্ট। এর বেশী এগোবার তার দরকারও নেই। সে মনে মনে ভাবছে, এতে বেঈমানীর কিছু নেই। কেননা সে তার সমস্ত কথাই খুলে বলেছে। এখন যা করছে, তা তার অকপটতা ছাড়া আর কিছুই নয়। তাকে তো কিছু না কিছু করতেই হবে। ঈশ্বর তার সহায় হোন, এটা খুবই বাস্তব এবং অতীব জরুরী ; সে এটা সহজেই সমাধা করতে পারে। টাকার জন্যে সে কতোবার শুয়েছে, সে হিসেব রাখে কে ? তার জন্যে তো চমৎকার একটা কৈফিয়ৎ আছেই। বাবার সেবা। বাপকে সে কুকুরের মতো মরতে দিতে পারেনা। ক্রনস্কি এখন মারার দু' পায়ের মাঝখানে মুখ গুঁজে দিয়েছে। তার জিহবাটা বড্ড গরম। মারা একটু নীচু হয়ে একটা পা গুঁজে দিয়েছে ক্রনস্কির ঘাড়ের ফাঁকে। তার দু'পায়ের ফাঁক দিয়ে রস গড়াচ্ছে অবিরল। কিন্তু রাতভর তাকে এড়িয়ে চলেছে ক্রনস্কি। মারা তার মাথাটা দু'হাতে ধরে আঙ্গুল বুলিয়ে দিচ্ছে তৈলাক্ত চুলে। নিজের যোনির ওপর চেপে ধরছে ক্রনস্কির মুখ। সে অনুভব করছে, এখনি তার রেতঃপাত হবে। সে চীৎকার দিয়ে বলছে —'কোথায় তুমি, কোথায় তোমার মস্ত নুনু।' বলতে বলতে সে ওকে সজোরে জাপ্টে ধরে নুনু এনে লাগাচ্ছে নিজের যোনির ফাঁকে। চীৎকার করছে—ঢোকাও, লাগাও, এখানে —হ্যাঁ এই তো এইখানে।' সঙ্গে সঙ্গে যেখানকার জিনিষ

সেখানে! তৃপ্ত মারা আবেশে দু' চোখ মুঁদে বলছে—'ওহ ওহ ওহ ঈশ্বর। এই তো, এইবার ঠিক মতো গিয়েছে। থাকুক থাকুক—রাখো রাখো। আরো ভেতরে ঢোকাও। শেষ পর্যন্ত নিয়ে যাও। হ্যাঁ, হ্যাঁ এই তো পৌঁছে গেছে। ওহ ওহ্। সে তার আবদার রক্ষা করতে চেষ্টা করছে। ধর্ষণ চালিয়ে যাচ্ছে যথারীতি। স্বর্গীয় আনন্দ লাভ করছে সে-ও। সেই সঙ্গে তিনশো ডলারের দুশ্চিন্তা। হায়, মওজ তো লুটছি। কিন্তু টাকার যোগাড় হবে কোত্থেকে। কে দেবে? যীশু—কী অপার আনন্দ। নড়ো না নড়ো না বেজন্মা কোথাকার! যীশু, কী সাংঘাতিক একটা যোনি! ওহ যীশু, এভাবে যদি সারারাত চালাতে পারতাম। কিন্তু সে আসছে···আসছে···নড়িস না কুত্তী···এদিকে আয়···আরো আরো। আহ আহ সীস্—বুম ব্ল্যাম্!'

আমার কল্পনার রথ থম্‌কে দাঁড়ায়। ভাবি, এর উল্টোটাও তো হতে পারে। কেননা যারা নিশ্চয়ই জানে, কীভাবে এক জন পুরুষকে সারারাত ঠেকিয়ে রাখা যায়। হয়তো এ পর্যন্ত একটা চুমোও ক্রনস্কি দিতে পারেনি। আর চুমো দিতে পারলেও —ওই পর্যন্তই—তার বেশী আর এক ইঞ্চিও নয়। হয়তো সারারাত তারা বক বক করেই কাটাবে আজ।

ম'দে কি জেগে আছে এখনো? আমার জন্যে প্রতীক্ষা করছে? তাহলে তো খুবই আশ্চর্য ব্যাপার। আমি ফ্লাই খুলে বাড়ির দিকে হাঁটা দিলাম। আমার শিস্ বাইরে বেরিয়ে আছে

খাড়া হয়ে। কিন্তু ওকে লাগানো আর একটা ঠাণ্ডা তালার মধ্যে গরম চাবি ঢোকানো একই কথা। আধো ঘুমের মধ্যে ওর রেতঃপাত হয়। আজ ঘুমের মধ্যেই ওকে লাগাবো। আমি বিছানায় ওর পাশ ফিরে শোয়ার শব্দ পাচ্ছি। আমার গায়ে লাগছে ওর গরম পাছার ছোঁয়া। ওর পাশে শুয়ে আস্তে আস্তে কাজ আরম্ভ করতে হবে। নইলে জেগে উঠে তুলকালাম কাণ্ড বাঁধাতে পারে সে। আমাকে এমন ভান করতে হবে যে আমি ঘুমের ঘোরে এরকম করছি। নইলে সে অপমানিত মনে করতে পারে। বরং আমি যেমন ঘুমের ভান করছি, সেও তেমনি ঘুমের মধ্যেই সাড়া দিচ্ছে—এরকম বুঝে নেয়াই আমার জন্যে মঙ্গল জনক। হ্যাঁ, আমি অর্ধেকটা ঢুকিয়েছি। ঘুমের মধ্যে ও তার শুকনো যোনি ভিজতে কোনো অসুবিধে হয়নি। ঘুমের মধ্যে নিজের স্ত্রীর সঙ্গে রতিক্রিয়ায় লিপ্ত হওয়ার আমেজই আলাদা! তুমি তোমার বিচরনের জায়গাটা খুব ভালো ভাবে চেনো। কাজেই কখন কোথায় পৌঁছুবে, তা বুঝতে কোনো অসুবিধে নেই। তুমি যতোক্ষন ইচ্ছে, সময় নিতে পারো। কতো কিছু ভাবতে পারো। শরীরটা অবশ্য তার; কিন্তু যোনিটা তোমার! শরীর যেদিকেই যাক—শিস্ন আর যোনি হচ্ছে বিবাহিত!

সকালে দু'টি শরীর মুখোমুখি হবে। বিনিময় করবে বাক্য। কিন্তু দু'জনকেই মনে হবে স্বাধীন, স্বতন্ত্র। যেন বীর্যপাত ঘটানো কেবল শিস্ন আর অন্যান্য প্রত্যঙ্গেরই কাজ। ঘুমের

মধ্যে কী হয়েছে তাতে তার কিছুই আসে যায় না। তখন তার কাছে আমার শিস্নটা একটা রাবারের নল ছাড়া আর কিছুই নয়। আমার আঙুলের সঙ্কেতে আমি তাকে নিয়ন্ত্রণ করি। ভারমুক্ত হই তার পাত্রের মধ্যে। যেন সে ফুলের পাপড়ির মতোই খুলছে আর বন্ধ হচ্ছে। ফুল বলছে—'এখানে থাকো সূর্যসন্তান!' ফুল কথা বলছে মাতাল স্পঞ্জের মতো। ফুল বলে—'আমি এই মাংসপিণ্ডটি নিচ্ছি। আমি যতোক্ষণ ঘুম থেকে না উঠি, ততোক্ষন এটি এখানেই থাকবে।' কিন্তু শরীর কি বলে? শরীর তো আহত। শরীর সাময়িকভাবে হারিয়েছে তার নাম এবং ঠিকানা। কিন্তু শরীর চায়, নুনুটা কেটে ক্যাঙারুর মতো তা থলেয় ভরে রাখতে। আর তা চায় চিরোদিনের জন্যেই। মদে আকাশের দিকে পোঁদ উঁচিয়ে থাকা সেই শরীরে নয়। সে চিৎ হয়েই আছে। এবং একটা রাবারের নলের কাছে নিজেকে সমর্পণ করেছে। মদের স্বামী না হয়ে যদি স্বয়ং ঈশ্বরই লেখক হতেন, তাহলে অবশ্য দৃশ্যটা হতো এরকম। মদে দেখতো, সে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা সবুজ লনে। তার হাতে একটা লাল ছাতা। চমৎকার ধূসর বর্ণের ঘুঘুরা তার জুতোয় ঠোকরাচ্ছে। সেই সুন্দর ঘুঘুরা সমস্বরে বলছে, 'তুমি কী চমৎকার একটি প্রাণী। ঘুঘুরা সাদা বিষ্ঠায় ভরে ফেলছে প্রাঙ্গন। কিন্তু স্বর্গীয় ঘুঘুদের বিষ্ঠা তো মূলত দেবদূতদের পিঠা। মানুষই তার উদোম শরীরকে সভ্যতার আবরণে ঢাকতে গিয়ে ও-শব্দটি তৈরী করে নিয়েছে। সে যদি

ঘুঘুদের সংলাপ শোনার সময় চোখ দু'টি মুঁদে ফ্যালে, তাহলেই নিজের শরীরের ভিতরে দেখতে পায় এক লজ্জাহীন নগ্ন পুরুষকে। যেন একটা মাদী ঘোড়া অথবা গাইগরু চরছে সবুজ মাঠে। এরকম অবস্থায় সে কোনো মহিলাকে দেখতে রাজী নয়। বিশেষ করে এই জঘন্য ভঙ্গীতে। সে চায় তার চার-পাশে সবুজ ঘাস, সে চায় ছাতাটা খুলে রাখতে। কাঁচা সূর্যলোকে সবুজ ঘাসের ওপর কাল্পনিক সঙ্গীর সঙ্গে ন্যাংটো দাঁড়িয়ে থাকা কতোই না সুন্দর। মদে কী নম্র গলায় কথা বলছে এখন, যেন তার পরণে সাদা পোষাক। গির্জে—বাড়িতে ঘণ্টা বাজছে। সে তার ব্যক্তিগত পৃথিবীর একটি কোণে দাঁড়িয়ে আছে। সন্ন্যাসিনীদের মতো দেখতে এক প্রাণী অন্ধদের সাঙ্কেতিক ভাষায় তার বন্দনা গাইছে। সে উবু হয়ে একটি ঘুঘুর মাথায় আঙুলের টোকা দিচ্ছে। কী নরম, কতো কোমল! কতো উষ্ণ, প্রেমময়। মখমলে জড়ানো এক দলা রক্ত। সূর্য প্রখর আলো দিচ্ছে এখন। আর ওহ—সে আলোয় তার শীতল গোপন প্রত্যঙ্গগুলো উষ্ণতায় ভরে উঠছে। ক্ষমাশীল দেবদূতের মতো দাঁড়িয়ে আছে সে, দু'টি পা ফাঁক করে। ঘুঘুরা তার দু'পায়ের মাঝখানে উড়াউড়ি করছে পাগলের মতো। মর্মরের খিলানে পাখার ঝাপটা দিচ্ছে তারা। আজ রোববার। পৃথিবীর এই কোণে জন-প্রাণীর উপস্থিতি নেই। মদে মদের সঙ্গে কথা বলছে। সে বলছে, যদি ষাঁড় আসে এবং তাকে গেঁথে ফেলতে চায়—সে

এক বিন্দু নড়বে না। কতো ভালো লাগবে—তাই না? মদে বিড়বিড় করে বলছে। ফিসফিস করে বলছে সে। বলছে—কেন তুমি রোজ এসে এই ভঙ্গীতে দাঁড়াও না? সত্যি মদে—এ বড়ো চমৎকার। তুমি তোমার সমস্ত পোষাক খুলে এই ভাবে ঘাসের ওপরে দাঁড়াবে। উবু হয়ে দানা খাওয়াবে ঘুঘুদের। ষাঁড় এসে উঠবে পাহাড়ের ওপর এবং তার বিশাল বস্তুটি বিদ্ধ করবে তোমার ভিতরে। ওহ্ ঈশ্বর এভাবে ও জিনিষের স্বাদ নেয়া কতো সুন্দর। ঝকমকে ঘাস, ষাঁড়ের উষ্ণ, গোপন অঙ্গের ঘ্রাণ, সেই ভয়াবহ দণ্ডটির আন্দোলন—বারবার তার ভিতর বাহির হওয়া—হে ঈশ্বর! আমি চাই সে আমাকে একটি গাভী মনে করে ধর্ষণ করুক। হে ঈশ্বর, আমি চাই, চাই, চাই, চাই এবং চাই.....'

৪

সাতদিন হয়, মারার সঙ্গে দেখা সক্ষাৎ নেই আমার। ইতিমধ্যে ওকে একটা চিঠি লিখে জানিয়েছিলাম, 'আমাদের একটা উপায় খুঁজে বের করা দরকার। এভাবে চলে না। এভাবে এগুলে আত্মহত্যা ছাড়া আমার আর গত্যন্তর থাকবে না।' জবাবে টেলিফোন এলো মারার। বললো, এক্ষুনি

আমি যেন তার ওখানে চলে যাই। কিন্তু চলে যাই বললেই, চলে যাওয়া সম্ভব নয়। অফিসে কাজের প্রচণ্ড চাপ। এমন চাপ যে—যে কাজ একা করছি, সে কাজের জন্যে আমার মতো পাঁচজন লোকের দরকার। বিকেলের দিকে নিঃশ্বাস নেবার অবসর পেলাম। টেলিফোনে মারাকে জানালাম, কয়েক মিনিটের জন্যে আমি তোমার ওখানেই আসছি।

মারা একটা গ্রামের বাড়ির ঠিকানা দিয়েছিলো। তার এক বন্ধুর বাড়ি। উপদ্রবহীন থাকতে চায় বলেই সেখানে গিয়ে আস্তানা গেড়েছে। অফিসের কাজের ভীড়ে হিমসিম খেতে থাকা সহকর্মী হাইমকে 'একটু বাইরে থেকে আসছি' বলেই কেটে পড়লাম। তারপর লাফিয়ে উঠলাম একটা ক্যারে। গন্তব্যে এসে দেখি, একরত্তি একটা বাগানওয়ালা পুঁচকে এক-খানা বাড়ি। মারা এসে দরজা খুলে দিলো। তার পরণে ফিকে লাল পোষাক। পোষাকের নীচেই তার উদোম গতর। সে দুবাহু বাড়িয়ে আবেগের সঙ্গে আমাকে জড়িয়ে ধরলো তার পর চুম্বন করলো।

: চমৎকার পাখির বাসা তো এটা!' আমি বললাম।

: হ্যাঁ। বাড়িটা ক্যারুদার্সের। মাঝে মধ্যে সে এখানে এসে অবসর যাপন করে। আমি এখানে রাত কাটাই, যেদিন বাড়ি ফিরতে দেরী হয়ে যায়।

আমি কিছু বললাম না। আমি চেয়ে চেয়ে দেখছিলাম গাদা গাদা বই। দেয়াল গুলো অসংখ্য বইয়ে ঢাকা। হঠাৎ

দেয়ালের একটি কোন থেকে মারা খপ্ করে কী একটা কাগজ তুলে নিলো।

ঃ ওটা কী?' সহজ গলায় জিজ্ঞেস করলাম।

ঃ না, কিছু নয়।' ওরই একটা স্কেচ—যেটা ও নষ্ট করে ফেলতে বলেছিলো। মারা জবাবে বললো।

ঃ দেখি দেখি!

ঃ দুর! এটা দেখে তুমি কি করবে? আবোল তাবোল জিনিষ।' বলেই সে কাগজটা দোমড়াতে শুরু করলো।

ঃ দেখিই না একটু।—বলতে বলতে কাগজটা এক রকম কেড়েই নিলাম তার হাতের মুঠো থেকে। কাগজটা খুলে আমি অবাক হয়ে দেখি, আমারই একটা কার্টুন। আবার বুকের মধ্যে একটা ছুরিও বেঁধানো।

ঃ ও যে তোমাকে হিংসা করে, তা তো আগেই বলেছিলাম।' বললো মারা। তবে এই কার্টুন একটা অর্থহীন পাগলামো। খুব মদ খেয়েছিলো তো। তখন এসব করেছে। মাতাল হলে ও একেবারে অন্যরকম হয়ে যায়। একেবারে শিশুর মতো। তখন একটা বাচ্চার মতোই তার দেখাসোনা করতে হয়। তুমি মনে কোরোনা, সে কেবল তোমাকে ঘেন্না করে বলেই এরকম ছবি এঁকেছে। এরকম সে সবার সঙ্গেই করে। বিশেষ করে আমার দিকে যারা নজর দেয়।'

ঃ তুমি বলেছো সে বিবাহিত। কিন্তু তার বউ কি তাকে সেবা-যত্ন করে না?

: সে একটা অচল মেয়েমানুষ!' বললো মারা।

: হুইল চেয়ারে বসে থাকে?

: না-আ-আ, ঠিক তা নয়!—সে জবাবে বললো, 'কিন্তু এখন এসব কথা কেন, এর দরকারই বা কি? তুমি জানো, আমি তার প্রেমে পড়িনি। তোমাকে আমি বলেছিলাম, সে আমার প্রতি খুব সহানুভূতিশীল। তাহলে বিপদে আপদে তার দেখভাল্ কি আমার উচিত নয়? তাকে চাঙ্গা রাখার জন্যে একজন মানুষের সত্যিই দরকার!'

তাই যখন সে তার পঙ্গু বউ নিয়ে বাড়িতে শুয়ে থাকে—তখন তুমি এখানে রাত কাটাও!'

: সে এখানেও মাঝেমধ্যে রাত কাটায় বটে! তবে দু'খানা খাট আছে এ বাড়িতে। ওহ্ প্লীজ'—সে প্রার্থনা করলো—'ওর সম্পর্কে এভাবে বোলো না।' ওর ব্যাপারে তোমার উদ্বিগ্ন হবার কিছু নেই। তুমি আমাকে বিশ্বাস করছো না?' বলতে বলতে সে আমার গা ঘেঁষে এসে দাঁড়ালো। আমার কাঁধের ওপর রাখলো দু'টি হাত। আমি তাকে কোলে নিয়ে পাশের সোফায় গিয়ে বসলাম। ওর কাপড় তুলে ফেললাম ওপরে। তারপর ওর দুটি পা ফাঁক করে আমার জিহবাটা ঢুকিয়ে দিলাম ওর যোনির ফাটলে। মিনিটের মধ্যে সে আমাকে তার শরীরের ওপর টেনে তুললো। যখন সে হাতড়ে হাতড়ে আমার নুনুটা খুঁজে পেলো, তক্ষুনি সে সেটি সজোরে গুঁজে দিলো তার পুষির মধ্যে। তার আগে দু'আঙুলে সে ফাঁক করে ধরে—

ছিলো নিজের যোনি। পরপর তিনবার রেতঃপাত হলো তার। সে উঠে গিয়ে তাড়াতাড়ি ধোয়া মোছা করে এলো। আমি বাথরুম থেকে ফিরে এসে দেখি, সে সোফার ওপর গা এলিয়ে বসে নির্বিকারে সিগারেট খাচ্ছে।

: আমাকে অফিসে যেতে হয় এক্ষুনি !'—আমি বললাম।' আর তো আমাদের কথা বার্তার কোনো সুযোগ নেই।'

: না, না, এক্ষুনি যেওনা।' আমার নুনুর ওপর হাত রেখে সে অনুনয় করলো? আমি ওকে জড়িয়ে ধরে চুমো খেলাম। সে আমার ফ্লাই খুলে শিস্নের ওপর হাত রেখেছে, হঠাৎ দরজায় কার করাঘাত।

: ও এসেছে।' সে লাফিয়ে উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিলো। যাবার সময় বললো, 'যেভাবে আছো, সে ভাবেই বসে থাকো—একচুল নড়োনা।' অগত্যা আমিও বসে থাকলাম ওই ভাবেই। এমনকি আমার প্যান্টের ফ্লাই লাগাবার সময় না থাকায় আমি খানিকটা উবু হয়ে বসে জায়গাটা আড়াল করলাম। কিন্তু কি ভেবে, পর মুহূর্তে উঠে দাঁড়িয়ে বোতাম লাগিয়ে নিলাম আবার।

: গৃহস্বামী ভেতরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে সে বললো, 'একজন মেহমান আছেন। আমিই আসতে বলেছিলাম। এক্ষুনি চলে যাবেন।'

: হ্যালো'—লোকটা উচ্ছসিত হয়ে আমার দিকে এগিয়ে এলো। আমাকে এখানে দেখে সে খুব চমকে গেছে বলে মনে

হলো না। এর সঙ্গে আগেই আমার আলাপ হয়েছিলো নাচের আসরে।

: আপনি নিশ্চয়ই এক্ষুনি চলে যাচ্ছেন না। আর যাবার আগে নিশ্চয়ই একটু গলা ভিজিয়ে যাবেন। আপনি কি স্কচ্ পছন্দ করেন?'

আমি কিছু বলার আগেই মারা বরফ নিয়ে এলো। ক্যারুদার্স বললো, 'জায়গাটা আহামরি নয়—তাই না? এটা আসলে আমার ছোট্ট আস্তানা, যেখানে আমি দেখা পেয়ে যাই মারা আর তার ছোট্ট বন্ধুদের। এই পোষাকে মারাকে খুব মানায়, তাই না?'

: হ্যাঁ।' আমি বললাম, 'বেশ আকর্ষনীয়। আপনার বইয়ের সংগ্রহও প্রশংসার যোগ্য।'

: আপনি একজন লেখক?—আপনাকে তাই মনে হয়—নাকি মারার মুখেই শুনেছিলাম?'

: লেখক কিনা জানিনা। এই, চেষ্টা করছি আরকি। আপনি কি লেখেন?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

সে হাসলো। বললো: শুরু করেছিলাম সাহিত্য চর্চা দিয়েই। কবিতাই লিখতাম প্রধানত। কিন্তু এখন মদ্যপান ছাড়া আর কিছুই পারিনা।'

মারা বরফ নিয়ে এলে ক্যারুদার্স বললো, 'এদিকে এসো।' তার হাত দু'টি ধরে বললো, তুমি তো এখন আমাকে চুমো খেলে না।'তারপর নিজেই মারার শীতল, অনিচ্ছুক ওষ্ঠে

একটি চুম্বনের চারা রোপন করলো।

: আমি অফিসে কেন যে যাই, জানিনা।' ক্যারুদার্স গ্লাশ হাতে নিয়ে বললো, ওটা একটা জায়গা হলো? ওখানে জমকালো চেয়ারে বসা আর বাজে কাগজে সই দেয়া ছাড়া করবার মতো আছেই বা কি?' বেশ লম্বা একটা ঢোঁক গিলে সে বললো, মারা এখানে বোসো। তোমার জন্যে একটা সুখবর আছে।'

: কী খবর? বলছো না কেন?' মারা ওর আরেকটি চুম্বন এড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো।

: বলছি বলছি!—বলবার সময় দেবে তো? সে বললো।

আমি অফিসে যাবো; কিন্তু দ্বিতীয় দফা পানের পর মনে হচ্ছে, আরো একটু থেকে যাই। লক্ষ্য করেছি, মারা মদ খাচ্ছে না। মনে হলো, মারা আমার উপস্থিতির অবসান কামনা করছে এখন। সুখবরটা সে ইতি মধ্যে দিয়েও দিয়েছে। হঠাৎ দেয়ালের দিকে চোখ পড়তে ক্যারুদার্স বললো, 'আমার ড্রয়িংটা কোথায়?'

: ওটা ফেলে দিয়েছি আমি।

: তাই তো দেখছি। ছবিটা তোমার এই বন্ধুকে দেখাতে চেয়েছিলাম।

সে ওটা দেখেছে।—মারা বলললো।

: দেখেছে? তাহলে ঠিক আছে। তাহলে তার কাছে আমার কোনো কিছুই লুকোনো থাকছে না। তার মানে আমার সম্পর্কে

থাকছে না কোনো জিজ্ঞাসাও। তুমি তো জানোই, আমি যদি তোমাকে না পাই—অন্য কেউ তোমাকে পাবে না। আমি পেতে দেবো না। কী ঠিক বলিনি? তাছাড়া সব ঠিক আছে। সে আমাকে বলেছে, এক সপ্তাহ বা দু'সপ্তাহ সে এখানে থাকবে। আমি এ ব্যাপারে তোমার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলাম। কেননা, এ বাড়িটা তুমিই দেখা শোনা করছো।'

ঃ বাড়িটা তোমার।' মারা বললো তুমি এখানে যা খুশি করতে পারো। কিন্তু শুনে রাখো, সে যদি এখানে আসে—আমি চলে যাবো। আমার নিজের থাকার জায়গা আছে। আমি তোমার দেখাশোনার জন্যেই এখানে আসি। মদ খেতে খেতে তুমি যাতে মারা না যাও, তা লক্ষ্য রাখার জন্যেই এখানে আসি।

ঃ আশ্চর্য্য। ক্যারুদার্স বললো, এরা দুটি মেয়ে যে কেন পরস্পরকে দেখতে পারেনা? আমার তো মনে হয়, মাথায় এক আউন্স বুদ্ধি না থাকলেও ভ্যালেরী বেশ মেয়ে। একজন পুরুষ যা চায়, তার সবটুকুই তার আছে। প্রায় বছর খানেক যাবৎ সে আমার রক্ষিতা। এই মেয়েটির আবির্ভাবের আগ পর্যন্ত আমাদের ভালোই তো কাটছিলো।'

কথায় কথায় সময় গড়িয়ে গেলো। নেশায় ঘুমিয়ে পড়েছিলো ক্যারুদার্স। আমিও। এক সময় ঘুম থেকে উঠেই নিজের ক্ষিদের কথা জানালো কারুদার্স। সে আমার উপস্থিতির কথাও ভুলে গেছে। হঠাৎ মেঝের ওপর আমার দিকে চোখ

পড়তেই সে চটে গেলো। তারপর মারাকে সঙ্গে নিয়ে গেলো খাবার জন্যে। অবশ্য ফেরার সময় মারা তাকে বলে কয়ে আমার জন্যে কিছু স্যাণ্ড্উইচ আর কফি নিয়ে এসেছিলো। ক্যারুদার্স আবার আমার কথা ভুলে গেলো, ঘটনাস্থলে ভ্যালেরী আবির্ভূত হবার সঙ্গে সঙ্গে। আমার স্পষ্ট মনে আছে, খুব সুন্দরী একটা অল্পবয়সী মেয়ে ঘরে ঢুকেই ক্যারুদার্সকে জড়িয়ে ধরলো। তারপর কী হলো, আমার ঠিক মনে নেই। তবে বাকিটা আমি শুনেছিলাম মারার মুখে। মারার সঙ্গে ভ্যালেরীর বেশ একচোট হাতাহাতি হয়ে যায়। ক্যারুদার্স তো মদের ঘোরে অজ্ঞান। একটা দামী ফুলদানি ভেঙ্গে ভ্যালেরী কেটে পড়ে।

রাত চারটের দিকে দেখা গেলো, কৌচের ওপর নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে ক্যারুদার্স। সিক্সথ-এভিনিউয়ের এক ডোরওয়েতে দাঁড়িয়ে আমি আর মারা কথা বলছিলাম। আমাদের মধ্যে কিছু বোঝাপড়ার চেষ্টা চলছিলো। আমি তাকে বলছিলাম, আমাকে তোমাদের বাড়িতে নিয়ে চলো। কিন্তু সে আমাকে এই কথাটি বোঝাতে চাইছিলো যে, দেরী হয়ে গেছে। আমি বারবার তাকে বোঝাচ্ছিলাম, 'এই বাজে আস্তানায় থাকা ঠিক নয়।

ঃ কিন্তু তুমি বুঝতে পারছো না।' সে যুক্তি দেখালো। 'আমি বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে বাড়িছাড়া। আমার সব জিনিষ পত্রই এখানে।

: ওঃ, তাহলে তুমি এর সঙ্গেই বসবাস করছো? তা, এসব কথা আগে বললেই তো পারতে।

: আমি তো ওর সঙ্গে থাকছিনা। নিজের একটা জায়গা ঠিক করবার আগে অস্থায়ী ভাবে এখানে থাকতে হচ্ছে আমাকে। আমি আর কখখনো বাড়িতে যাবো না। মার সঙ্গে ভীষণ ঝগড়া হয়ে গেছে আমার। আমি বেড়িয়ে এসেছি। বলে এসেছি, আর কখনো ঘরে ফিরবো না।'

: তোমার বাবা? তিনি কী বলেন?'

: তখন তিনি সেখানে ছিলেন না। তিনি নিশ্চয়ই পরে ভেঙ্গে পড়েছেন। কিন্তু আমার কিছু করার নেই।'

: এরকম ঘটে থাকলে আমি দুঃখিত। চলো তোমাকে এগিয়ে দিই।

আমরা জনশূন্য রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ সে দাঁড়িয়ে পড়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে বললো, 'তুমি আমাকে বিশ্বাস করো; তাই না?' চেয়ে দেখি, ওর দু'চোখ টলমল করছে।

আমি বললাম, 'বিশ্বাস করি। কিন্তু তোমাকে আলাদা একটা থাকবার জায়গা খুঁজে বের করতে হবে। আমি না হয় তোমার একটি ঘরের ভাড়া দেবো। কেন তুমি আমার সাহায্য নেবে না?

: ওহ্, আমি এখন কোনো সাহায্য চাইনা।'—হঠাৎ তার চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, 'সুখবরটা তোমাকে বলা হয়নি,

তাইনা ? কয়েক সপ্তাহের জন্যে আমি গাঁয়ে যাচ্ছি। নর্থ উডে ক্যারুদার্সের কটেজ আছে। আমি, ফ্লোরি আর হান্না যাচ্ছি ওখানে। চমৎকার ছুটি কাটাবো সবাই। তুমি আমাদের সঙ্গে যেতে পারো। যেতে নিশ্চয়ই চেষ্টা করবে ?' নয় কি ? তুমি, কি খুশি হচ্ছো না ?' সে উচু হয়ে আমাকে একটা চুমু দিলো। বললো, 'লোকটা খুব খারাপ নয়,—বুঝলে ? সে আমাদের সঙ্গে যাচ্ছে না। আমাদের বিশ্রামের জন্যেই এ ব্যবস্থা সে করেছে। তার সঙ্গে যদি আমার প্রেম থাকতো তাহলে তো আমাকে সঙ্গে নিয়ে একাই ওখানে যেতে পারতো। অবশ্য, একথা আমি স্বীকার করি, সে তোমাকে দেখতে পারেনা। তোমাকে সে ভয় পায়। কেননা এ ব্যাপারে তুমি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। অবশ্য, তার বউ মারা গেলে সে আমাকেই বিয়ে করতে প্রস্তুত। আমাকে ভালোবাসে বলেই যে বিয়ে করতে চায় তা নয়। আমাকে বাঁচাবার জন্যেই বিয়ে করতে চায়। এখন বুঝতে পেরেছো ?'

: না, বুঝতে পারলাম না। কিন্তু ঠিক আছে। তোমার অবশ্যই একটি ছুটির দরকার। আশা করি চমৎকার অবকাশ যাপন করবে ওখানে। ক্যারুদার্স সম্পর্কে আমাকে কিছু বলবার দরকার নেই। আমি তাকে পছন্দ করিনা। বিশ্বাস ও করিনা। তুমি তার সম্পর্কে যে উচ্ছাস প্রকাশ করলে, অতোটা ভালো সে নাও হতে পারে। ব্যাটা মরুক। পারলে ওকে আমি বিষ খাওয়াতেও পেছপা নই।'

ঃ আমি রোজ তোমাকে চিঠি লিখবো।' বিদায়ের সময় মারা বললো।

ঃ মারা শোনো।—আমি তাকে দু'হাতে কাছে টেনে বললাম, তোমাকে অনেক কথা বলার ছিলো। কিন্তু সব কথা শূন্যে মিলিয়ে গেছে।'

ঃ আমি জানি, আমি তা জানি।'—ধরা গলায় মারা বললো।

ঃ তুমি চলে যাবার পর অবস্থা পাল্টাতেও পারে। কিছু একটা ঘটা উচিত। এভাবে আমরা চিরকাল দৌড়ুতে পারবো না।

ঃ আমিও সেই কথাই ভাবছি!' সে অনুচ্চস্বরে বললো—'আমি এজীবন ঘৃনা করি। আমি একা হলেই মনে মনে এই চিন্তাটি করি। আমি জানিনা, কীভাবে এই পাঁক থেকে বেরুবো।

ঃ বেরুনো নিশ্চয়ই যাবে!—আমি বললাম, 'যাই হোক, আমার গা ছুঁয়ে বলো চিঠি লিখবে?

ঃ অবশ্যই লিখবো—প্রত্যেক দিন।' বলতে বলতে সে যাবার জন্যে পেছনে ফিরলো।

সে চলে যাবার পর আমি ভাবতে লাগলাম, ওকে চলে যেতে দিয়ে কি আমি ভুল করলাম? এর চেয়ে ওর হাতটা শক্ত করে ধরাই কি আমার জন্যে সমিচীন ছিলো না? স্ত্রী, সংসার চাকরী সব ছেড়ে ওকে নিয়ে বিরিয়ে পড়লেই কি ভালো হতো না? আমি হাঁটতে হাঁটতে এসব কথাই ভাবছিলাম। কিন্তু আমার পা দু'টো আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিলো আমার বাড়ির দিকে।

৫

তা, নর্থ উড্‌সে গিয়েছিলো মারা। সাদ্‌ল বলেই। সদ্য ফিরে এসেছে। দু'জন চমৎকার স্থানীয় যুবক তাদের দেখা সোনা করতো। রান্না করে দিতো। দেখাতো, কীভাবে বন্দুক ছুঁড়তে হয়। রাত্রে যখন আকাশে তারা ঝকমক করতো, যুবকেরা পেছনের বারান্দায় বসে গীটার আর হার্মোনিকা বাজিয়ে শোনাতো ওদের। চারদিকে অন্তহীন পাইনের জঙ্গল।

ক্যারুদার্সের আস্তানায় ক'দিন আগে গিয়ে দেখি, লোকটা ওখানেই আছে। আমাকে দেখে সে বিস্মিত হলো। বিরক্ত তো বটেই। আমি আমতা আমতা করে বললাম, 'না, মানে সেদিন একটা বই দেখেছিলাম আপনার শেলফে। সেই বই খানার জন্যেই এসেছিলাম।' সে বিরস কণ্ঠে জানালো, 'কাউকে বই পড়তে দেয়া অনেক দিন আগেই ছেড়ে দিয়েছি। তার কথায় মনে হলো, অবিলম্বে সে আমার নিষ্ক্রমন কামনা করছে।

আমি পথে থেমে প্যাড আর খাম কিনে গিয়ে ঢুকলাম পাবলিক লাইব্রেরীতে। মারার কাছে লিখতে বসলাম এক মস্ত

চিঠি। চিঠি লেখা শেষ হলে দেখি, লাইব্রেরী বন্ধ করার সময় হয়ে এসেছে। আমি লিখলাম, অবিলম্বে আমার কাছে টেলিগ্রাম করতে। কেননা চিঠি পেতে যে বিলম্ব হবে, অতো আমার সইবে না। চিঠিখানা ডাকে ফেলবার পরও, আবার একখানা লম্বা টেলিগ্রাম পাঠালাম মারার নামে। দু'দিন যায়। কোনো জবাব নেই। তখন আবার একটা টেলিগ্রাম হাঁকালাম বেশ বড়ো মাপের। তারপর একখানা চিঠি লিখলাম, আগেরটার চেয়েও বড়ো। পরের দিন আমি পেলাম ছোট্ট একখানা চিরকুট। উষ্ণ, আন্তরিক এবং শিশু সুলভ। প্রথম টেলিগ্রাম সম্পর্কে কোনো উল্লেখ নেই। আবার টেলিগ্রাম করলাম একটা। তাতে চাইলাম ওর পুরো ঠিকানা আর নিকটতম টেলিফোন-নম্বর। 'পরবর্তী চিঠির জন্যে অপেক্ষা করো। এবং টেলিগ্রামের জন্যেও। লিখো। পারলে টেলিগ্রাম করো। জানাও, কখন ফিরে আসছো। আমি তোমাকে ভালোবাসি। আমি তোমার জন্যে পাগল। ক্যাবিনেট মিনিস্টার বলছি।'

ওই ক্যাবিনেট মিনিস্টারই বাজি মাৎ করলো।' 'ভিক্টোরিয়া' —এই নামটি স্বাক্ষর করা একটি টেলিগ্রাম এলো শিকারী গ্লানের নামে। (এই চরিত্রগুলো ন্যুট হামসুনের বই থেকে নেয়া)। তারপর একটা চিঠিও। সে কি লিখেছে, ঈশ্বর তা ওর কাঁধের ওপর দিয়ে তাকিয়ে দেখেছেন। একটা হরিণ দেখে সে বনের মধ্যে ছুটে গিয়েছিলো এবং পথ হারিয়ে

ফেলেছিলো। তাকে খুঁজে পায় স্থানীয় ওই যুবক দু'টি। এবং বহন করে বাড়িতে নিয়ে আসে। যুবক দু'টি এতো সহজ সরল—ওহ্-ভাবা যায়না। হান্না আর ফ্লোরি তো ওদের প্রেমেই পড়ে গিয়েছিলো। ওরা যুবক দু'টির সঙ্গে কখনো নৌকায় চেপে বেড়াতে যেতো, কখনো বনের মধ্যে কাটিয়ে দিতো রাত। সে এক সপ্তাহ থেকে দশ দিনের মধ্যে ফিরে আসছে। এর বেশী সময় সে আমার কাছ থেকে দূরে কাটাতে পারবেনা। তারপর লিখেছে—'আমি তোমার কাছে ফিরে আসছি। আমি তোমার বউ হতে চাই! কতো অনায়াসে সে উচ্চারণ করছে ওই মোক্ষম কথা কটি! কী আনন্দদায়ক! এই সারল্যের জন্যেই তো ওকে আমি এতোটা ভালো বেসেছি। ভালোবেসেছি ওর ওই সততা আর স্পষ্টবাদিতার জন্যে। আমি এক বৈঠকে ওকে তিনটি চিঠি লিখলাম। কেবল উঠে উঠে তিনটি আলাদা জায়গায় বসেছি আমি।

কখন ফিরবে—এই ভাবনায় আমি পাগল। ও লিখেছিলো শুক্রবার রাত্রে ফিরবে। শহরে পৌঁছেই সে উলরিকের ষ্টুডিওতে ফোন করে আমাকে জানাবে তার আগমন-সংবাদ। শুক্রবার রাত্রি এলো। আমি টেলিফোনের সামনে বসে রইলাম রাত তিনটে নাগাদ। উলরিক বললো, ও কোন্ শুক্রবারের কথা বলেছে হে। আগামী শুক্রবারের কথা বলেনি তো? আমি প্রায় বিধ্বস্ত অবস্থায় বাড়ি ফিরলাম। অবশ্য আমার মন তখনো বলছিলো, সকাল নাগাদ নিশ্চয়ই ওর

ফোন আসবে। পরদিন আমি টেলিফোন করলাম উলরিককে। বেশ কয়েক বার টেলিফোন করলাম। সে খুবই বিরক্ত হলো। আমার আচরণ তাকে আহত করেছে বলেই মনে হলো। দুপুরে অফিস থেকে বেরিয়েছি। দেখি, ম্যাক গ্রেগর আর তার বউ টেস্ চকচকে একটা গাড়ি চড়ে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে। আমাকে দেখতে পেয়েই তারা গাড়ি থামালো। আমিও হাত তুলে ছুটে গেলাম তাদের দিকে। ম্যাক আমার বন্ধু। অনেক দিন হয় দেখা নেই। আমাকে পেয়ে সে কি খুশি। জোর করে ধরে নিয়ে ওদের সঙ্গে লাঞ্চ খেতে বাধ্য করলো আমাকে। আমাকে খুটিয়ে খুটিয়ে দেখে সে চিন্তিত মুখে বললো, 'তোমার হয়েছে কি? মনে হচ্ছে, তুমি যেন আর তোমাতে নেই। নিশ্চয়ই কোনো মেয়েলোকের ঘটনা আবার! হায় যীশু, এই গাধাটা কবে নিজের দিকে খেয়াল রাখতে শিখবে? খাওয়া দাওয়ার পর ম্যাক গ্রেগর বললো, তারা লংআইল্যাণ্ডে বেড়াতে যাচ্ছে। আজকের রাতটা ওখানে কাটিয়ে কাল শহরে ফিরবে। আমাকে তাদের সঙ্গে যেতেই হবে। আমি ওদের কাটাবার জন্যে বললাম, উলরিকের সঙ্গে আমার একটু কথা আছে।'—ঠিক আছে, ঠিক আছে।' ম্যাক বললো, 'তোমার উলরিককেও সঙ্গে নিয়ে নাও!'

কবি ওয়াল্ট হুইটম্যান জন্ম গ্রহন করেন লং আইল্যাণ্ডে। এটুকু আমি জানি। ভাবলাম, ঠিক আছে, বাড়িটা এই সুযোগে দেখে আসা যাবে। আমি রাজি হয়ে গেলাম।

পরদিন শহরে ফিরে উলরিকের দরজায় একটা চিরকুট পেলাম। মারার চিঠি। তাতে সে লিখেছে,' তোমরা রওয়ানা হবার পর পরই আমি এসে পৌঁছেছি। তারপর ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করেছি তোমার জন্যে। বিশ্বাস করবে কিনা জানিনা। দারোয়ান খবর দিলো, মহিলা তার দু'ই বন্ধুর সঙ্গে রক-অ্যাওয়েতে চলে গেছে। বলে গেছে যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব —ফোন করতে।

সন্ধের সময় সেখানে পৌঁছে দেখি, ষ্টেশনেই সে আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। তার পরণে বেদিং স্যুট। শরীরের ওপর ফেলে রেখেছে একটা ম্যাকিন টশ। ফ্লোরি আর হান্না নাকি হোটেলেই ঘুমোচ্ছে। হান্নার ঝুটা দাঁত গুলো খোয়া যাওয়ায় সে নাকি খুব মনমরা হয়ে পড়েছে। ফ্লোরি আবার ফিরে যাবে জঙ্গলে। বিল নামের ওই স্থানীয় যুবকের প্রেমে পড়েছে সে। কিন্তু তার আগেই একটা গর্ভপাত ঘটানো দরকার হয়ে পড়েছে তার। অবশ্য এ ব্যাপারটা ফ্লোরির কাছে কিছুই নয়। তবে মুশকিল হয়েছে একটি ব্যাপারেই যে প্রতিটি গর্ভপাতের সঙ্গে সঙ্গে তার যোনির মাপ বড়ো হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। আর এর দরুনই তার সামনে এমন সময় ঘনিয়ে আসছে, যখন নিগ্রো ছাড়া আর কিছু রুচবে না।

সে আমাকে আর একটি হোটেলে নিয়ে গেলো। এখানে একবার একটা রাত আমরা কাটিয়েছিলাম। ডাইনিং রুমে বিয়ার খেতে খেতে আমাদের কথা হচ্ছিলো। ম্যাকিন টশ পরা

মারাকে দেখে মনে হচ্ছে, সে অগ্নিদগ্ধ বাড়ি থেকে মধ্যে রাতে বেরিয়ে এসেছে বাইরে। আমাদের, বিছানায় যাওয়া খুবই জরুরী। কিন্তু তাড়াহুড়ো করে মানুষের। মনে সন্দেহের উদ্রেক করে কী লাভ! ধীরে সুস্থেই বিছানায় যাওয়া যাবে খন। আমি স্থান-সচেতনতা হারিয়ে বসে আছি। আমার মনে হচ্ছে আটলান্টিক মহাসাগরের তীরে একটা অন্ধকার ঘরে আমরা বসে আছি। ঘরে আরো দুতিনটি দম্পতি অনুচ্চ গলায় কথা বলছে। আলতো চুমুকে মদ খাচ্ছে। একটা লোক গলাকাটা মুগির ঠ্যাং ধরে হেঁটে যাচ্ছে। মেঝের মধ্যে রক্ত পড়ছে ইকড়ি মিকড়ি নকশায়। যেন এটা মাতাল কোনো বারবণিতার বারান্দা—যার ঋতুস্রাব বন্ধনমুক্ত।

শেষে আমরা দীর্ঘ বারান্দার শেষ প্রান্তের একটি কক্ষে গিয়ে আশ্রয় নিলাম। ঘরটা যেন দুঃস্বপ্নের চাতাল অথবা চিরিকো —চিত্রকলার হারানো অর্ধেকটা। করিডোরটা এমন যে তুমি ডাইনের বদলে বাঁয়ে চলে গেলে পথ হারাতে বাধ্য। আমরা বিবস্ত্র হয়ে শুয়ে পড়লাম লোহার খাটে। আমাদের অবস্থা হলো সেই মুষ্টিযোদ্ধাদের মতো, যারা দর্শক শূন্য অন্ধকার মঞ্চে পরস্পরকে আক্রমন করার জন্যে পাঁয়তারা করছে। মারা চাইতে দ্রুত রেতঃপাত। যেন সে আত্মসমর্পণ করে বসে আছে। আমি উঠে ঠাণ্ডা পানির ছোঁয়ায় শিস্নকে বশে আনতে চাইলাম। ঘরের ভেতরে কোনো সিংক নেই। ফাটা আয়নায়, হলুদ বাল্বের আলোয় আমাকে দেখাচ্ছিলো জ্যাক

দ্য রিপারের মতো। যেন সে প্রশ্রাব পাত্রে খুঁজছে একটা টুপি। বিছানায় পড়ে থাকা মারাকে মনে হচ্ছে এলোমেলো মাইকার টুকরোর মতো। আমি প্যান্টটা পরে, নলের মতো করিডোর ধরে ওয়াশ-রুম খুঁজতে বেরুলাম। টাক-মাথা একটা লোক মার্বেল বেসিনের সামনে হার্ত মুখ ধুচ্ছে। তার যতোক্ষন শেষ না হয়, আমি অপেক্ষা করলাম। কিন্তু তার আর শেষ হয়না। তারপর তিমির মতো, কুলকুচো করে ধোয়া পাথ্‌লায় ক্ষান্ত দিলো। সবশেষে লোকটা বের করলো একটা পাউডারের কৌটো।

রুমে ফিরে দেখি, মারা সিগারেট খাচ্ছে আর খেলু করছে নিজের সঙ্গেই। দেখেই বোঝা যায়, কামজ্বালায় সে জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে। আমরা আবার শুরু করলাম। শুরু করলাম কুকুর-কায়দায়। কিন্তু তাতেও কোনো কাজ হচ্ছে না। অনেকক্ষন পর ওর যখন হয়ে আসছে, হঠাৎ দরজায় করাঘাত। আমি লাফিয়ে উঠে দরজা ফাঁক করে বাইরে তাকিয়ে দেখি, একটা মাতাল নিজের রুম খুঁজে বেড়াচ্ছে। কয়েক মিনিট পরে আমি আবারো ওয়াশ রুমে নুনু ঠাণ্ডা করতে গিয়ে দেখি, লোকটা তখনো নিজের ঘর খুঁজে পায়নি। শেষ দিকে এসে আমি অবশ্য একেবারে ঝিমিয়ে পড়লাম। আমার প্রবৃত্তি এখন আবার মরে গেছে। নুনুটা যেন পুরনো রাবার-ব্যাণ্ডে তৈরী। একটা নিঃশেষিত ব্যাটারি। কিন্তু শিস্নটা খাড়া হয়ে আছে বিস্ময়কর ভাবে। আর তাই নিয়ে একটা বাইন

মাছের মতোই পাক খাচ্ছে মারা। আমি অসুস্থ হয়ে পড়লাম। আমি শহরে পৌঁছে বাড়িতে এসে ঢুকতেই মদে আমাকে জরিপ করতে লাগলো তার মাছের মতো চোখ দু'টি মেলে ধরে। আমি ছুটির দিনটা কীভাবে কাটালাম, জরিপটা সেই সম্পর্কেই। সে বললো, আমাকে অনেক খানি বুড়ো বুড়ো বলে মনে হচ্ছে। আরো বললো, 'অল্প ক'দিনের অবসর কাটাবার একটা সুযোগ এসেছে আমার। স্কুল জীবনের এক বান্ধবী চিঠি লিখেছে, ওদের গাঁয়ের বাড়িতে ক'টা দিন কাটিয়ে আসবার জন্যে।' আমি বললাম, চমৎকার হবে ব্যাপারটা।

দু'দিন পর ওকে আর বাচ্চাটাকে সঙ্গে নিয়ে স্টেশনে গেলাম। মদে বললো, ওদেরকে খানিকটা পথ এগিয়ে দেবার জন্যে। আমি ট্রেনে চড়ে ওদের সঙ্গে অনেকটা দূর গেলাম। তারপর একটা স্টেশনে ট্রেন দাঁড়াতেই আমি নেমে পড়লাম। তার-পর হাত তুলে বিদায় জানালাম। ও বাচ্চাকে লক্ষ্য করে বললো, 'তোমার বাবাকে বাই-বাই জানাও! বেশ ক'সপ্তাহ তাকে আর দেখতে পাবেনা!'

: বাই বাই!

: বাই বাই!

সে বলেছে 'কয়েক সপ্তাহ' এই কথাটি। চমৎকার। ওদের ট্রেন চলে গেলে আমি ফিরতে-ট্রেনের জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। আর ভাবছিলাম, ওর অনুপস্থিতিতে আমি কী কী

করবো। ব্যক্তিগত-মধুচন্দ্রিমা যাপনের ব্যাপারে মারা নিশ্চয়ই খুব উৎসাহী হয়ে উঠবে। সত্যি, কয়েক সপ্তাহ সময়ের মধ্যে আমরা এক-লাখ মজাদার কাজ করতে পারবো!

পরের দিন ঘুম থেকে উঠলাম, অসহ্য কানের ব্যথা নিয়ে। আমি মারাকে টেলিফোন করে ডাক্তারের চেম্বারে উপস্থিত হওয়ার অনুরোধ জানালাম। পরিচিত ডাক্তার। আমার স্ত্রীর বন্ধু। একবার সে তার মধ্য-যুগীয় যন্ত্রপাতির খোঁচায় আমাদের বাচ্চাটিকে প্রায় মেরে ফেলেছিলো। এবার তাহলে আমার পালা। আমি মারাকে পাশের একটা পার্কের বেঞ্চে বসিয়ে রেখে ডাক্তারের চেম্বারে ঢুকলাম।

ডাক্তার আমাকে দেখে খুশি হলো। রোগের বিবরণ শুনতে শুনতেই সে পানি গরম করতে দিলো। সেই পানির মধ্যে তার যন্ত্রপাতি সব ডোবানো। তারপর সে বের করে আনলো নিরীহ দেখতে একটা বিদ্যুত সংযুক্ত কাচের বাক্স। জিনিষটা দেখতে যেরকমই হোক, আমি তো জানি, এটি অমানুষিক অত্যাচারেরই একটি অনুষঙ্গ।

অমানুষিক অত্যাচারে বিধ্বস্ত হয়ে অনেকক্ষন পর বেরিয়ে এলাম মারা আঁৎকে উঠলো আমার চেহারা দেখে। সে এই মুহূতে আমাকে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে সেবাযত্ন করার প্রস্তাব দিলো। কিন্তু আমি বললাম, 'গুডবাই। কাল আমার সঙ্গে দেখা কোরো!'

মাতালের মতো টলতে টলতে বাড়িতে ফিরলাম। শুয়ে

পড়লাম কৌচে। সঙ্গে সঙ্গে গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলাম আমি। ঘুম ভেঙ্গে উঠে দেখি, ভোর হচ্ছে। খুব ভালো লাগছে আমার আমি কাছের পার্কে পায়চারী করতে গেলাম। ব্যথার উপশম হলে সব কিছু কতো মধুময় মনে হয়। রাজহাঁস গুলোকে তখন দারুন সুন্দর লাগে। গাছ গুলোকেও। এমনকি যানবাহনও।

অফিস থেকে বেরিয়ে পার্কে গেলাম। সেখানে মারা যথারীতি আমার জন্যে অপেক্ষা করছিলো। ডাক্তারের কাছে গেলে, সে আমাকে দেখে উৎফুল্ল হলো। বললো, 'এই তো, অনেকটা সেরে উঠেছো। একটা মলম দিচ্ছি। দিন সাতেক পর আবার এসে দেখিয়ে যেও।' বাইরে এসে মারাকে নিয়ে ডিনার খেলাম এক রেস্তোরাঁয়। সেই সঙ্গে খেলাম চায়ান্তি। আবার পার্কে গিয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে থাকলাম দু'জনে। আকাশে মিটমিট করছে তারা। মারা বললো, 'তোমার বউ কি সত্যি সত্যি অতোদিন বাইরে থাকবে?'

: সে হয়তো আর আসবেই না।' আমি বললাম, বোধহয় এই কথাটি বলবার জন্যেই সে আমাকে এগিয়ে দেবার নাম করে অতোদূরে নিয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু শেষ মুহূর্তে দ্বিধান্বিত হয়ে বলতে পারেনি।' মারা বললো, 'চলো না, অন্য কোনো দেশে চলে যাই আমরা। যেদেশে আমাদের কেউ চেনে না!'

: মন্দ হয়না।' আমি বললাম, এখানে কারো জন্যেই আমার

কোনো টান নেই। তোমাকে না-পেলে আমার জীবনটাই হয়ে উঠতো নিরর্থক।'

মারা হঠাৎ বললো, চলো না, নৌকায় চড়ে একটু বেরিয়ে আসি।' আমরা লেকের দিকে হেঁটে গেলাম। কিন্তু সব নৌকা তখন তালামারা। আমরা পানির ধার ঘেঁষে উদ্দেশ্যহীন ভাবে হাঁটাহাঁটি করতে লাগলাম। কিছুক্ষন পর আমরা লেকের গায়ে লাগানো একটা রেষ্ট হাউসে উঠলাম। বাড়িটা একদম খালি। আমি একটা শক্ত বেঞ্চে বসলাম। মারা এসে বসলো আমার কোলে। ও পরেছে ছোপকা ছোপকা নকশা দেয়া আমার প্রিয় সুইস পোষাকটি। যার নীচের দিকটা খোলা। আমি ওর পাছার নীচ থেকে কাপড় সরিয়ে দিলাম। আমরা ওভাবেই সাঙ্গ করলাম একটি চমৎকার সঙ্গম। তারপর নিঃশব্দে চুমোচুমি করতে লাগলাম অনেকটা সময় ধরে।

উঠে বসে হাতরুমাল দিয়ে সাফ সুতরো করা গেলো নিজেদের। আমি শার্টের হাতা দিয়ে নুনু মুছছিলাম। হঠাৎ আমার হাতটা ধরে মারা সামনের ঝোপের দিকে আঙ্গুলি নির্দেশ করলো। ঝোপটা অল্প অল্প দুলছে। মনে হলো, কে যেন হামাগুঁড়ি দিয়ে বসে আছে ওখানে। আমি তাড়াতাড়ি প্যান্টের বোতাম লাগিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। তারপর মারার কাঁধ ধরে উল্টোদিকে এগিয়ে গেলাম।

: নিশ্চয়ই কোনো পাহারাওয়ালা—বললো মারা।—'এদের

স্বভাবই ওরকম। যতো সব বিকারগ্রস্ত নোংরা মানুষ। সব ব্যাপারেই আড়িপাতা স্বভাব।'

সঙ্গে সঙ্গে লোকটা বলে উঠলো, 'দাঁড়াও। হ্যাঁ, তোমরা দু'জন। কোথায় যাচ্ছো ওদিকে?'

: কী বলছো মিয়া।' আমি বললাম, 'দেখতে পাচ্ছো না, আমরা বেড়াচ্ছি?'

: থানায় চলো। সেখানে গিয়েই বলবে, কী করছিলে এখানে?

: এ আমার, স্ত্রী!

: অ্যাঁ, তাই বুঝি? তোমার স্ত্রী! তা বেশ। কিন্তু তোমরা প্রকাশ্যে নিজেদের গোপন অঙ্গ মুছছিলে। এটা বেআইনী। স্বামী স্ত্রী হলেও! কী নাম, বলোতো বাপু?' বলতে বলতে সে আমার নাম লেখার জন্যে নোট বই বের করলো পকেট থেকে।

আমি নাম বললাম।

: কোথায় থাকা হয়?

তাও বললাম।

: ওর নাম?

আমার মতোই। আগেই বলেছি, সে আমার স্ত্রী!

: তা বলেছো বটে।' বিচ্ছিরি হেসে সে বললো, 'তা বেশ। আচ্ছা, কী করা হয়? মানে, চাকরি বাকরি, ব্যবসা বানিজ্য?'

আমি পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করে ওকে আমার পরিচিতি পত্রটি দেখালাম। আমার অফিসের অ্যাইডেন্টিটি কার্ড। এটি

দেখালে বৃহত্তর নিউইয়র্কের কোনো সাবওয়ে, এলিভেটার কিংবা ট্যাক্সিতে আমার পয়সা লাগেনা। কার্ড দেখে সে মাথা চুলকালো এবং টুপিটা মাথার পেছন দিকে হেলিয়ে দিলো।

: ও, তুমি তাহলে এমপ্লয়মেন্ট ম্যানেজার? তাই না! এমন এক তরলমতি যুবকের জন্যে এরকম গুরুত্বপূর্ণ চাকরি? কিছুক্ষন পর—

: চাকরিটা তুমি আরো কিছুদিন করতে চাও—তাই না?'

সঙ্গে সঙ্গে আমি কল্পনার চোখে দেখতে পেলাম, প্রভাতি সংবাদ পত্র-গুলোয় জ্বল জ্বল করছে আমার নাম। রসালো শিরোনামের নীচে রগরগে রিপোর্টিং। ওরা যে ভাবে খুশি, সে ভাবে বানাবে গল্প। এই তো সুযোগ।

: দ্যাখো মিয়া, অতো ঝামেলার কিছু নেই। আমার বাড়িটা কাছেই। সেখানে গিয়েই প্রমান পেতে দেরী হবে না যে আমরা স্বামী স্ত্রী।'—বললাম আমি। 'হতে পারে যে আমি আর আমার স্ত্রী খানিকটা বেপরোয়া। নতুন নতুন বিয়ে হয়েছে তো আমাদের? অবশ্য প্রকাশ্যে এ ধরনের খোলামেলা আচরণ করা আমাদের উচিত হয়নি। তবে কিনা, জায়গাটা ছিলো অন্ধকার। আশে-পাশে কোনো লোক ছিলোনা।'…

: সে যাই হোক, একটা ব্যবস্থা করা যাবেখন।' সে বললো, 'তাহলে তুমি তোমার চাকরিটা খোয়াতে চাও না। কেমন?'

: না, চাই না!' কথাটা উচ্চারন করেই আমি পকেট হাত-ড়াতে শুরু করলাম। পকেটে কতো আছে, দেখা দরকার। যা

আছে, তাতে একে সন্তুষ্ট করা যাবে কিনা, কে জানে।
মারাও তার ব্যাগ হাতড়াচ্ছিলো।
: অতো তাড়াহুড়ো কীসের!' পাহারাঅলা বললো, 'আমাকে ঘুষ দিয়ে বশ করতে পারবে না। ভালো কথা, তোমরা কোন্ গির্জায় যাও?'
আমি তাড়াতাড়ি পাড়ার ক্যাথলিক চার্চের নাম বললাম।
: তাহলে তো তোমরা ফাদার ওম্যালের চ্যালা চামুণ্ডা। তা, আগে বলবে তো। তোমাদের বিয়েটাও, নিশ্চয়ই ওই গির্জেতেই হয়েছিলো?
: হ্যাঁ, ফা—মানে পুলিশ সাহেব। গত এপ্রিলে আমাদের বিয়ে হয়েছে ওই চার্চেই।
আমি পকেট হাতড়ে দেখি, তিন চার টাকার বেশী নেই। মারার কাছে কতো আছে কে জানে। পাহারাঅলা হেঁটে যাচ্ছিলো। আমরা তাকে অনুসরন করছিলাম। হঠাৎ তার ক্লাবের কাছাকাছি এসে থেমে পড়লো সে। তারপর দর্শনীয় ভঙ্গীতে পেছনের দিকে বাড়িয়ে দিলো হাতের তেলো। মারা সঙ্গে সঙ্গে তার হাতে ক'টা টাকা তুলে দিলো। বললো, 'আপনার সহৃদয়তার জন্যে ধন্যবাদ।' তারপরেই কেটে পড়লাম আমরা দ্রুত।
: তোমার উচিত, আমার সঙ্গে আমার বাড়িতে যাওয়া।' বললাম আমি। 'কেননা লোকটা আমার বাড়িতে গিয়ে খোঁজখবর নিতে পারে। ওর মনে কি আছে, কে জানে।

ওকে আমি বিশ্বাস করিনা—বাস্টার্ড!···কী? না, ফাদার ও ম্যালে, ও!'

যে কথা সেই কাজ। বাড়ি ফিরে দরজা বন্ধ করে দিলাম। মারা তখনো কাঁপছে। কাবার্ডে লুকোনো মদ একটুখানি বের করে ওকে খেতে দিলাম। ওর সঙ্গে পাত্র ঠুকে বললাম, 'মঙ্গে এসে আমাদের সারপ্রাইজ দিক—তার স্মরনে।'

: সে ফিরে আসবে না।' মারা বললো, 'আসবে কি?'

: যীশু জানে, সে কি করবে।' আমি বললাম।

: এসো, আমরা এখানে ঘুমোই।' মারা বললো, 'ওর বিছানায় আমি শোবো না।'

মদ টদ খেয়ে আমরা বিবস্ত্র হলাম। মারা বাথরুম থেকে বের হয়ে এলো মঙ্গে'র রেশমী কিমোনো পরে।—'আমি তোমার বউ, তাই নয়?' মারা বললো। তার দুটো হাত আমার ঘাড়ের ওপর রেখে। কথাটা শুনে আমার শরীর রোমাঞ্চিত হলো। সে ঘরের মধ্যে ঘুরে ঘুরে সবকিছু দেখছিলো।

: তুমি কোথায় বসে লেখো?'—সে জিজ্ঞেস করলো, 'এইটুকুনি টেবিলে?'

আমি মাথা নাড়লাম।

: তোমার একখানা বড়ো টেবিল আর একটা আলাদা ঘরই দরকার। এখানে তুমি লেখো কি করে?

: ওপর তলায় আমার একটা বড়ো ডেস্ক্ আছে।

: কোথায়? শোবার ঘরে?

: না, ওটা আছে পার্লারে। দেখবে তুমি?

: না।' সে তাড়াতাড়ি বললো, 'আমি ওপরে যাবো না। আমি সব সময় চিন্তা করবো, তুমি এই কোনায়, এই টেবিলের ওপর, জানালার পাশে বসেই লেখাপড়া করো।···চিঠিগুলো কি তুমি এখানে বসেই লিখতে?'

: না।' আমি বললাম, 'রান্নাঘরে বসে লিখতাম।'

: আমাকে দেখাও। দেখাও, কোন্ জায়গায় বসে তুমি লিখতে। আমি দেখতে চাই, তখন তোমাকে কীরকম মনে হতো?

আমি ওর হাত ধরে নিয়ে গেলাম পাশের রান্নাঘরে। আমি যেখানে বসে বসে ওকে চিঠি লিখতাম, সেখানে বসলাম—যেন লিখতেই বসেছি। সে নীচু হয়ে, টেবিলের যে জায়গাটায় আমার কনুই ঠেকেছে—সেই কাঠের উপর চুমো খেলো।

: আমি স্বপ্নেও ভাবিনি, তোমার বাড়িতে আসবো।—সে বললো, 'এ বাড়ি আমার কাছে এক পবিত্র জায়গা। এই টেবিলটা আমাদের সঙ্গে নিতে হবে। এই চেয়ারটাও। সব কিছু। এমনকি এই স্টোভখানাও। সঙ্গে নেবো কি, এই রুম সুদ্ধ সব কিছু আমাদের হবে।'

আমরা বেসমেন্টের ডিভানের ওপর শুয়ে পড়লাম। রাতটা ছিলো উষ্ণ। কখন ঘুমিয়ে পড়েছি, জানিনা। পরদিন সকাল সাতটা। আমরা দু'জন দুজনকে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে ছিলাম। হঠাৎ দরজাটা বাইরে থেকে খুলে গেলো। খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে আছে আমার স্ত্রী মঙ্গে—আর খোদ বাড়িওয়ালা—

যিনি ওপরেই থাকেন। তাঁর সঙ্গে আবার তাঁর মেয়েটাও। এক কথায়, আমরা হাতে নাতে ধরা পড়ে গেছি। আমি আমার সম্পূর্ণ উলঙ্গ শরীরটা নিয়ে বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে চেয়ারের ওপরে রাখা টাওয়েল দিয়ে লজ্জা নিবারন করলাম। মঙ্গে তার সাক্ষীদেরকে বললো মারাকে ভালোভাবে দেখে রাখতে। মারা তখনো বিছানায়। তার শরীরের ওপর পাৎলা একখানা চাদর।

ঃ মেয়েটাকে যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব বাড়ি থেকে বের করে দিলে ভালো হয়।' মঙ্গে, বললো। তারপর সাক্ষীদের নিয়ে গট গট করে উঠে গেলো ওপর তলায়।

সে কি রাত্রে ওপর তলায়, তার নিজের বিছানায় ঘুমিয়েছিলো? যদি ঘুমিয়ে থাকে, তাহলে সে সকাল অব্দি অপেক্ষা করলো কেন?

ঃ ব্যাপারটাকে সহজ ভাবে নাও মারা। আমরা অন্ততঃ ব্রেক ফাস্ট পর্যন্ত এখানে অপেক্ষা করতে পারি।'

আমি ত্রস্ত হাতে কাপড় চোপর পরে প্রায় দৌড়ে বাইরে গেলাম কিছু বেকন আর ডিমের জন্যে।

আমি যখন নাস্তা বানাচ্ছি—মারা তখন টেবিলের ওপর বসে ঠোঁটের ফাঁকে গুঁজে দিয়েছে একটা সিগারেট। সে বিস্মিত চোখ মেলে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললো, 'আশ্চর্য, এখনো তুমি মাথা ঠাণ্ডা রাখছো কীভাবে? তোমার কি কোনো অনুভূতি শক্তি নেই।'

: অবশ্যই আছে। আমার অনুভব হলো সব কিছু ঘটছে খুব চমৎকার ভাবে। আমি মুক্ত। তুমি কি তা বুঝতে পেরেছো? এখন তুমি কি করবে?

: এখন যাবো অফিসে। বিকেলে যাবো উলরিকের ষ্টুডিওতে। তুমি অবশ্যই সেখানে থাকবে। আমার ধারনা, স্ট্যানলীই হচ্ছে নাটের গুরু। লোকটা আমার বন্ধু বটে। তবে পেছন থেকে তাবৎ কলকাঠি সেই-ই নাড়ছে। ঠিক আছে, দেখা হবে।'

অফিসে গিয়ে স্ট্যানলির কাছে একটা টেলিগ্রাম পাঠালাম। জানালাম, বিকেলে যেন সে অবশ্য অবশ্য উলরিকের ষ্টুডিওতে হাজির থাকে। সারাদিনে একবার একটা টেলিফোন কল এলো মঙ্গের। সে বলছে, আমাকে আলাদা একটা ঘর ভাড়া নিতে। কেননা যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব, সে তালাক নেবে। রাত্রের ঘটনার কোনো উল্লেখ নেই। নেহাৎ সাদামাটা ব্যবসায়িক আলাপ যেন। আমার জিনিষপত্রগুলো কখন ফেরৎ চাই, তা যেন তাকে যথা সময়ে জানিয়ে দিই।

উলরিক ব্যাপারটাকে নিয়েছে খুব সিরিয়াসলি। ঘটনাটা তার কাছে একটা বিরাট পরিবর্তন। একটা নতুন জীবন। মারাও সেই নতুন জীবন আরম্ভ করার জন্যে প্রস্তুত। এখন স্ট্যানলি কি করে তা দেখা দরকার।

স্ট্যানলি এলো। মদ খেয়ে চুর। বহু বছর ওর সঙ্গে আমার দেখা সাক্ষাৎ নেই। ব্যাপারটাকে সে বেশ গুরুত্বপূর্ণ বলে গ্রহন করেছে। তার আশা, এ উপলক্ষে একটা উৎসবও হয়ে

যাবে। সে একের পর এক যে সব কথা বলে গেলো, তা সম্পূর্ণ অসম্ভব। কিন্তু সে বললো, 'ঘটনাটি আমি তোমার জন্যে তৈরী করেছি। তোমার মঙ্গলের জন্যেই করেছি। নয় কি? আমি জানতাম, তুমি কি করবে!'

টেলিফোন বাজলো। ডক্টর ক্রনস্কি চাইছে মিস্টার মিলারকে।

: কংগ্রাচুলেশনস!' সে চেঁচিয়ে বললো, 'আমি কয়েক মিনিটের মধ্যেই তোমার ওখানে আসছি। অনেক কথা আছে তোমার সঙ্গে।'

: ভালো কথা!' আমি বললাম, 'একটা বাড়তি-রুম ভাড়া দেবে—এরকম কারো খোঁজ দিতে পারবে?' আমি জানতে চাইলাম।

: আরে, ওই কথাই তো তোমাকে বলতে চাইছি আমি। জায়গাটা খুব চমৎকার হবে তোমার জন্যে। বাসাটা ব্রনস্কে—আমার এক বন্ধুর। সে ডাক্তার। তুমি ওই বাড়ির একটা মস্ত অংশ পেয়ে যাবে। কেন তুমি মারাকে সঙ্গে নিচ্ছো না? ওখানে তোফা জমবে তোমাদের। নীচ তলায় আছে একটা বিলিয়ার্ড-রুম। লাইব্রেরীটাও বেশ শাঁসালো। আর……'

: সে ইহুদী!'—আমি শেষ করলাম।

: তাই কি? সে একজন জায়নবাদী, সন্ত্রাসবাদী, এবং গর্ভপাতবাদী। দুর্দান্ত ভালো মানুষ। তোমার দরকার হলে সে গায়ের জামা খুলে দেবে। তোমার জন্যে বাড়ি খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ করে ওকে পেয়ে গেলাম। তোমার বউটার

চেহারা তো প্রায় লাশের মতো হয়ে এসেছে। তালাকের পর, ক্ষতি পূরণের যে টাকা সে পাবে, তাতে এখনকার চেয়ে অনেক সুখে সে থাকতে পারবে।'

মারাকে সব কথাই খুলে বললাম। ঠিক করলাম, বাসাটা এক্ষুনি দেখতে যাবো আমরা। স্ট্যানলী অদৃশ্য হয়েছে ইতি মধ্যে। উলরিকের ধারনা, সে বাথরুমে ঢুকেছে।

আমি বাথরুমের সামনে গিয়ে কড়া নাড়লাম। সাড়া নেই। ঠেলে দরজা খুলে ভিতরে ঢুকলাম। কেতাদুরস্ত পোষাক পরা স্ট্যানলি উবু হয়ে পড়ে আছে টাবের মধ্যে। চোখের ওপর হ্যাট। এক হাতে একটা খালি বোতল। আমি ওকে ওভাবে রেখেই বাথরুমের বাইরে চলে এলাম।

ঃ বেটা গেছে। আমার মনে হলো। উলরিককে চেঁচিয়ে বললাম, 'চলো কেটে পড়া যাক।'

৬

ব্রনস্ক্। আমরা এখানেই উঠেছি। একটা বাড়ির পুরো একটি অংশ আমাদের দখলে। রাজহাঁসের পালক আর বিষ্ঠায় ভরপুর, ক্রনস্কি কথিত স্বর্গ। যে স্বর্গপুরীর দেয়াল ভর্তি অসংখ্য আরশোলা। ক্রনস্কির কথা মতোই মারা তার নাম পাল্টে

মোনা হয়েছে। রাত্রেই আমরা ডক্টর অনিরাইফিক্‌সের বাড়িতে উঠেছি। আরশোলারা যেখানে সেখানে সঙ্গমরত। ঘরের কোনায় বিলিয়ার্ড টেবিল। ডক্টর অনিরাইফিকসের পুঁচকে ছেলেটা এসে সেই টেবিলের একটা পায়ার ওপর প্রস্রাব করে দিতেই দৃশ্যটা খোলতাই হয়ে উঠলো। বাড়িতে যাতায়াতের পথটা গেছে আমাদের ঘরের ভিতর দিয়েই। ঘরের একদিকে একটা গ্র্যাণ্ড পিয়ানো। একদিকে ফায়ার গ্লেস। একটা ফাটা আয়না। সোফাসেট। আমাদের ঘরে জানালার সংখ্যা আটটি, রুম বটে একটা।

এখানেই শুরু হলো আমাদের নতুন জীবন। জীবন বটে। আমরা যখন স্নান করি, প্রেমাপ্লুত হই অথবা একজন অন্য জনের চুল আঁচড়ে দিই—তখন নীচতলায় নিঃশব্দে বসে তা লক্ষ্য করে অনিরাইফিক্‌সের বউ ছেলে মেয়েরা। যেন তারা মানুষ নয়—এস্কিমো অথবা পেঙ্গুইন। তারা কী ভাষায় বাক্যালাপ করে, আমরা তা কখনো শুনিনি। নির্বিবাদ, নিরুদ্বেগ জীবন যাপন। কোনো ঘটনাতেই তাদের মনে কোনো প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়না।

ডাক্তার খুব ব্যস্ত মানুষ। তিনি নাকি শিশু রোগ বিশেষজ্ঞ। কিন্তু আমরা এখানে আসা অব্দি একটি পর্ভপাতের কেস ছাড়া তাঁকে আর কোনো কাজ করতে দেখিনি। তাঁর নিজের সন্তান-সংখ্যা তিন। এরা সবাই অস্বাভাবিক। সব চেয়ে ছোটটির বয়েস পাঁচ। বীজ গণিতের যাদুকর বলা চলে তাকে।

অচিরেই যে সে অঙ্কের সম্রাট হয়ে উঠবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। দু'বার সে এই বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলো। তার সর্বশেষ কীর্তি হলো, প্যারাম্বুলেটরে বসা একটি বাচ্চাকে গাড়িসুদ্ধ ধাক্কা দিয়ে ঢালু রাস্তায় ঠেলে দেওয়া। কেবল তাই নয়, ধাক্কা দেবার আগে সে প্যারাম্বুলেটরে যথারীতি আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলো।

এ বাড়িতে ঘমপাল নামে যে ভৃত্যটি আছে, তাকে এক কথায় বলা চলে রহস্যময়। খুব ভালো মানুষ। মুখ বুঁজে কাজ করে যায়। কিন্তু সে কোথায় খায় কিংবা কোন্ ঘরে ঘুমোয়—আমরা আজ পর্যন্ত তা বুঝতে পারিনি। মূলতঃ সবকিছু মিলিয়ে এ বাড়ির মালিক ডক্টর অনিরাইফিক নিজেই যেন কোনো মনুষ্যপদবাচ্য জীব নন। অন্য কোনো প্রাণী। আমার আর মোনার জীবন যাপন শুরু হয়েছে বিচিত্রভাবে। আমি যখন অফিসে চলে যাই, তখন সে গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন থাকে। আবার আমি যখন অফিস থেকে বিকেলে ফিরি—সে চলে যায় তার কর্মস্থল—ডান্স্ হলে। দুটো ট্রেনের মতোই যেন যাওয়া আর আসা আমাদের।

আমি তাকে প্রান দিয়ে ভালোবাসি। সে আমার সর্বস্ব। আর এখনো পর্যন্ত সে আমার কাছে স্রেফ মেয়েমানুষটুকুই নয়। সে আমার কাছে এমন এক আদর্শ প্রাণী—আমি বাল্যকালে যার ধ্যান করতাম। সে এখন সম্পূর্ণই আমার। তবু যেন মনে হয়, সে আমার কেউ নয়। আর আমি? আমি

যেন এক প্রচণ্ড ভালোবাসার কাছে নিজেকে সমর্পণ করেছি। আমি এক বেগবান প্রেমের দাসানুদাস।

একদিন বিকেলে অফিস থেকে ফিরে বাসায় এসে দেখি, এক অদ্ভুত প্রানী! নরম, নম্র ও স্ত্রী জাতীয় জীবটি যেন আলতোভাবে উঠে এসেছে ওল্ড-টেস্টামেন্টের পৃষ্ঠা থেকে। সে এমনি এক ইহুদী মেয়ে—যার নাম রুথ কিংবা এস্থার হতে বাধ্য। অথবা খুব সম্ভব মিরিয়াম! যাই বলো, মিরিয়ামের মতো নাম আর হয় না। এই নামটি ব্যক্তিগত ভাবে আমার কাছে খুবই প্রিয় নাম। মেয়েটি বাগানের এক কোনে হাঁটা-হাঁটি করছিলো। মিরিয়াম—এই নামটি মনে আসার সঙ্গে সঙ্গে এই নম্র সুন্দরী, মেয়েটির উপস্থিতি আমি সম্পূর্ণ ভুলে গেলাম। বরং আমার চোখে ভেসে উঠলো, আমার বারো বছর বয়সে দেখা সেই মিরিয়ামের ছবি। নিজেকে সে বলতো, আঁকিয়ে মিরিয়াম! পনেরো কিংবা ষোলো বছর বয়েস হবে তখন তার। কিন্তু পূর্ণ-প্রস্ফুটিতা। অসম্ভব প্রানবন্ত। ফুলের মতোই ঘ্রাণময়। কিন্তু স্পর্শের অতীত। সে ইহুদী ছিলো না। অথবা ওল্ড টেস্টামেন্টের সেই বয়সী রমণীর সঙ্গেও তার কোনো সম্পর্ক নেই। কিংবা আমি হয়তো ওল্ড টেস্টামেন্ট পড়িনি। এই সুন্দরী মেয়েটি রাস্তায় দেখা হলেই আমাকে জড়িয়ে ধরতো খুশিতে। সে ছিলো একাধারে আমার মা, ধাত্রী অথবা কল্পনার পরী। ওকে নিয়ে খারাপ চিন্তা আমি কখনো করিনি। তাকে কামনাও করিনি কোনোদিন। তাকে আমি

এতো গভীরভাবে ভালোবাসতাম যে যতোবার ওর সঙ্গে আমার দেখা হতো; মনে হতো, ততোবার আমার নবজন্ম হচ্ছে। আমি কেবল একটি কামনাই করতাম যে, ওর যেন কখনো মৃত্যু না হয়। ও অমর হয়ে থাকে। আমি ঈশ্বরকে বারবার ধন্যবাদ জানাতাম, মিরিয়ামের মতো একটি মেয়েকে তিনি সৃষ্টি করেছেন বলে।

কিছু দিন পর আর একটি আদর্শ মেয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। উনা গিফোর্ড। তখন মিরিয়াম আমার জীবন থেকে অদৃশ্য। তার সম্পর্কে আর কোনো চিন্তা ও করিনা আমি। নিজেই ক্রমশ ফুলের মতো ফুটে উঠতে শুরু করেছি। কিন্তু উনা গিফোর্ড ব্যথা ছাড়া আমাকে আর কিছু দিতে পারেনি। আমি তাকে চাইছিলাম। তাকে আমার প্রয়োজন। তাকে ছাড়া আমার বাঁচবার কোনো উপায়ই নেই। কিন্তু তার মুখে হ্যাঁ বা না—কোনো শব্দ নেই। অবশ্য ওই বয়েসে কেউ কখনো বিয়ে করেনা। করলে খুব অস্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে যায় সেটি। কিন্তু আমরা একটু ব্যতিক্রমী হলে ক্ষতিটা কি ছিলো?

মোনা সব কিছু বদলে ফেলেছে। তার নাম, জন্মস্থান, তার মা, তার বন্ধু বান্ধব, তার রুচি অভ্যাস,—এমনকি নিজের আশা আকাঙ্খা পর্যন্ত পাল্টে ফেলেছে সে। সে আমারও একটা পরিবর্তন চেয়েছিলো। সে বললো, 'তোমার নামও পাল্টে ফেলতে হবে!' আর নামটা সে বদলেও ফ্যালে। আমি

এখন—ভ্যাল্। হ্যাঁ আমার নাম এখন ভ্যালেণ্টাইন। মা বাবার দেয়া এই লালটু—মার্কা নামটা আমার একদম পছন্দ হতো না। কেমন মেয়েলী মেয়েলী মনে হতো। কিন্তু মোনার মুখে দারুন শোনালো সেই নাম। অবশ্য অন্য কেউ আমাকে ভ্যাল বলে ডাকেনা। কেবল মোনাই ডাকে এ নামে।

ডক্টর অনিরাইফিকসের বাড়িতে আমাদের প্রথম রাতটা আমরা কীভাবে কাটাই? আমরা এক সঙ্গে গোসল করলাম শাওয়ারের নীচে। তারপর বিছানায় শুয়ে পড়লাম এক কম্বলের তলায়। বিচিত্র জিনিষপত্তরে ঠাসা কিম্ভূত কক্ষটির মধ্যে আমরা সুখ সঙ্গমে লিপ্ত হলাম। গায়ে গা লাগিয়ে শুয়ে ঘুমোলাম আমরা সারাটি রাত। আমি আমার স্ত্রীর থেকে আলাদা হয়েছি। সে বিচ্ছিন্ন হয়েছে তার মা বাবার কাছ থেকে। কিন্তু আমরা কেউ স্বপ্নেও এরকম একটা বিদঘুটে হলঘরে শোবার স্বপ্ন দেখিনি। কিন্তু এ সময়ে আমাদের মাথাটা বোধ হয় ঠিক ছিলোনা। নতুন জীবন শুরু করার আড়ষ্টতার পাশাপাশি এক ধরণের পাপ বোধও সম্ভবতঃ আমাদের তাড়া করছিলো। কেননা, এতোবড়ো একটা অভিযানে নামলে এই বোধ থাকতে বাধ্য। এই অনুভবটা আগে গভীর ভাবে আচ্ছন্ন করতো মোনাকে। সে ভাবতো, সব কিছুর জন্যে সে-ই দায়ী। আমার একটা শিশু সন্তানকে আমি ফেলে এসেছি। এজন্যেও মোনার অনুতাপ কিছু ছিলো। কিন্তু আমাকে সে আরো গভীর ভাবে আঁকড়ে ধরলো।

যা বলছিলাম। আমরা ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। সে তার পাছাটা ঘুরিয়ে শুয়েছিলো আমার দিকে। কখন ওপর থেকে চাদরটা সরে গিয়ে থাকবে—ওর দুর্দান্ত পাছাটা দেখে আমার মাথা ঘুরে গেলো। আমি আমার দুটি হাত নিয়ে গেলাম সেই মাংস খণ্ডের উপর।

কিন্তু সেই চমৎকার স্বাস্থ্য একদিন ভেঙ্গে গেলো। দ্রুত শুকোতে থাকলো মোনা। তার জৌলুষ দ্রুত মরে আসতে শুরু করলো। আমি উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি কি অসুস্থ, মোনা?'

ঃ না তো?'—মোনা সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলো—'আমি স্লিম হচ্ছি।'

ঃ কিন্তু একটু বেশী শুকিয়ে যাচ্ছো না? আমি তো তোমাকে এতো শুকনো দেখতে চাইনা?

ঃ আমি কি এতোই শুকিয়ে গেছি?'—সে প্রায় লাফিয়ে উঠে আয়নার কাছে গেলো।

ঃ না, আমি ঠিক তা বলিনি।—তবে তোমার এক্ষুনি সচেতন হওয়া উচিত।'

ঃ প্লিজ ভ্যাল—আর এসব কথা বোলোনা। তুমি বুঝতে পারছো না·····আচ্ছা, তুমি কি আমাকে এভাবে দেখতে সত্যি পছন্দ করোনা?

ঃ দ্যাখো মোনা, আমি তোমাকে, যে কোনো ভাবেই থাকো না

কেন—ভালোবাসি। তবে কি জানো, তুমি ভীষন শুকোচ্ছো। মনে হয়, আর ক'দিন পর বাতাসে উড়ে যাবে। কোথাও আর তোমাকে খুঁজে পাবোনা আমি। তোমার কষ্ট আমি যে দেখতে পারিনা।'

: অবুঝ হয়োনা ভ্যাল; আমি জীবনে কষ্ট পাইনি আবার কবে! আচ্ছা, তুমি কি এই শনিবারে বাচ্চাটাকে দেখতে যাচ্ছো? আমি শিউরে উঠলাম একথা শুনে। বললাম, 'ভেবেছিলাম, একবার যাবো। কিন্তু কেন? যাওয়াটা কি অনুচিত হবে?'

: না না।'—সে অদ্ভুতভাবে মাথা ঝাঁকিয়ে বললো। তারপর ব্যুরো-ড্রয়ারে ঝুঁকে কী যেন দেখে নিলো। সে যখন উবু হয়ে আছে, তখন আমি ওর কাঁধে হাত রাখলাম।

: মোনা, তুমি কিছু বলো।.....আমি যদি ওখানে যাই, তাহলে কি তুমি খুবই আঘাত পাবে? অকপটে আমাকে বলো। আমি তাহলে সত্যি যাবোনা।'

: তুমি তো জানো, আমি আঘাত পাবোনা। আমি কি কখনো সে রকম আভাস দিয়েছি?

: না-আ-আ-আ-া—আমি বললাম। 'না, তুমি সেরকম আভাস কখনো দাওনি।'

: একথা তুমি কেন বলো!' সে চীৎকার করে কেঁদে উঠলো। 'তোমার কি নিজের মেয়েকে দেখতে যাবার অধিকার নেই? তোমার জায়গায় আমি হলে অবশ্যই যেতাম।' একটু থামলো সে। পরক্ষনেই উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো।

'সে যদি আমার সন্তান হতো, আমি কখনো তাকে ছেড়ে আসতাম না। আমি কোনো কিছুর বিনিময়েই তাকে পরিত্যাগ করতাম না।'

: মোনা, কী বলছো। এসবের মানে কি?

: মানে একটাই। তুমি কি করে এটা পারলে? আমি এতোটা ত্যাগের যোগ্য নই।

: এসব কথা থাক।' আমি বললাম। 'এতে ত্যাগের কোনো ব্যাপার নেই। আমি তোমাকে চেয়েছিলাম—পেয়েছি—ব্যাস্। আমি সুখী। দরকার হলে আমি সবাইকেই ভুলতাম। তুমিই যে আমার সবকিছু—তা তুমি জানো।'

আমি তাকে আমার দিকে মুখ করে বসালাম। তার গাল বেয়ে অবিরল ধারায় অশ্রু ঝরছে।

: শোনো ভ্যাল, আমি তোমাকে কোনোকিছু পরিত্যাগ করতে বলিনি। কিন্তু—'

: কিন্তু কি?

: কাজের শেষে ঘরে ফিরলে তুমি মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে মিলিত হতে না?

: হ্যাঁ, দুপুর দু'টো নাগাদ।

: আমি জানি···খুব বাজে সময়। কিন্তু ডান্স-হল ছেড়ে যাবার পর পরই খুব নিঃসঙ্গ মনে হতো নিজেকে। বিশেষ করে সেই সব লোকদের সঙ্গে নাচার কারনে, যারা অত্যন্ত জঘন্য মানুষ। আমি বাড়ি আসি, তুমি ঘুমোও, আমি কি পাই তাহলে?

: একথা বোলোনা, প্লিজ। আমি অবশ্যই তোমার সঙ্গে মিলিত হবো। যখন তখন!

বস্তুত আমি যেন যাপন করে চলেছি দু'টি জীবন। একটি চাকরী জীবন। অন্যটি মোনার সঙ্গে গৃহীর জীবন। মাঝেমধ্যে ফ্লোরি এসে সঙ্গ দেয় রেস্তোরাঁয় খাবার সময়। সম্প্রতি ওর এক নতুন নাগর জুটেছে। এক জার্মান ডাক্তার। বিশাল শিস্নের অধিকারী। ফ্লোরির জন্যে চমৎকারভাবে মানান সই। একেবারে যাকে বলে মনি-কাঞ্চন সংযোগ।

সেদিন বিকেলে মোনাকে ওর কাজের জায়গায় পৌঁছে দিয়ে আমি রাস্তা দিয়ে হাঁটাহাঁটি করছিলাম। হঠাৎ ভাবলাম, সিনেমা দেখি। তারপর নাচের আসরের বিরতিতে মোনার ওখানে যাবো। একটি ডোর ওয়ে পেরিয়েছি; হঠাৎ কে যেন ডাক দিলো আমার নাম ধরে। মেয়েলী গলা! দেখি, ফ্লোরি আর হান্না বেল। আমরা রাস্তা পেরিয়ে একটু গলা ভেজাতে গেলাম। কিন্তু ওদের দু'জনকেই মনে হচ্ছে খুব উদ্বিগ্ন, উৎকণ্ঠিত। তারা জানালো, কয়েক মিনিটের মধ্যে এখান থেকে তাদের পালাতে হবে। তারা মদ খাচ্ছে নেহাৎ দায়ে ঠেকে—সামাজিক দায়। আমি ফ্লোরির হাতটা ধরে তাকে আশ্বস্ত করতে চাইছি। হঠাৎ সে আমার ফ্লাইয়ের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিয়েছে। আর ঠিক সেই মুহূর্তে একটা লোক এসে ঢুকলো,

যাকে দেখে সাদর সম্ভাষন জানালো ওরা সমস্বরে। আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললো,

'আমাদের বন্ধু, মোনাহ্যান।—ইনি একজন ডিটেকটিভ।'

ভদ্রলোক সবেমাত্র চেয়ারে বসেছেন, সঙ্গে সঙ্গে ফ্লোরি লাফিয়ে উঠে হান্নার হাত ধরলো। তারপর ঝড়ের বেগে অদৃশ্য হয়ে গেলো বার-এর ভেতর থেকে।

: অদ্ভুত আচরণ!'—মোনাহ্যান বললেন—'এতে লাভটা কী?' আমি ওয়েটারকে ডেকে আরেকটি হুইস্কি দিতে বলে ওর দিকে তাকালাম। কোনো গোয়েন্দার খপ্পরে পড়তে আমি আদৌ রাজী নই। কিন্তু মোনাহ্যান লোকটা খারাপ নন। কথাবলবার মতো একজনকে পেয়ে তিনি খুশিই মনে হলো। আমাকে দেখেই তিনি অনুমান করে ফেলেছেন আমি অতি অবশ্য কোনো না কোনো ধরনের শিল্পী।

: আপনি একজন আর্টিস্টের মতো পোষাক পরেছেন।'—তিনি বললেন, 'কিন্তু আপনি অঙ্কন শিল্পী নন। আপনার আঙ্গুল গুলোই অন্য রকম।' বলতে বলতে আমার হাত ধরে ফেললেন তিনি। তারপর খুটিয়ে খুটিয়ে পরীক্ষা করলেন। বললেন, 'আপনি সঙ্গীত শিল্পীও নন। তবে কোন্ ধরনের শিল্পী আপনি? ও আছে; একটা এখনো বাকি আছে। আপনি কথাশিল্পী—লেখক—।'

আমি অর্ধ-বিস্মিত আর অর্ধ বিরক্ত ভাবে মাথা নাড়লাম। অদ্ভুত লোক। এরকম পরস্পর বিরোধী চরিত্রের মানুষ খুব

কমই দেখা যায়। এই আমাকে যুক্তিতর্কের বাকযুদ্ধে হারিয়ে দিয়ে বকাসকা করছেন। আবার এই বলছেন, আপনাকে আমার খুব ভালো লাগছে!—অদ্ভুত ব্যাপার নয়?

'আমি আপনার মতো একটা লোকই খুঁজছিলাম!' তিনি বললেন। তারপর আরো পানীয় দিতে বললেন ওয়েটারকে। 'আপনি আমার চেয়ে বেশী জানেন, কিন্তু আপনি তেমন বলিয়ে-কইয়ে নন। আমাকে আপনার পছন্দ হবে না। আমি উচ্চ ভ্রূ নই। কিন্তু কিছু কিছু তো আমারও জানা থাকতে পারে। আপনি কেন আমাকে কিছুই জিজ্ঞেস করছেন না?'

কিন্তু আমি বলবো? তার কাছ থেকে আমার কীই বা জানার আছে! আমি নিজের চেয়ারে হেলান দিয়ে বসেনি কিম্বা উঠে পড়েনি। তাতে খামোখা একটা লোককে অপমান করা হয়। তাছাড়া, আমি বেশ খানিকটা ধাধায়ও পড়েছি। ফ্লোরির ওরকম রহস্যময় আচরনের কারণ কি? অমন হুদ্দাড় করে ভাগলোই বা কোথায়? অথচ এখনো ফ্লাইয়ের ওপর তার হাতের ছোঁয়া পাচ্ছি যেন আমি।

কিন্তু লোকটা বকবকাতেও পারে। অদ্ভুত কৌশলে পেটের ভেতর থেকে কথা বের করবার অসাধারণ ক্ষমতা তার। যখন আমার শিরঃপীড়া শুরু হলো, তখন অনুগ্রহ করে তিনি থামলেন। আমার হাত ধরে বললেন, 'আমি তোমার বন্ধু হতে চলেছি। আশা করি, আমার সাহয্যে নেবে। তোমার বউটা খুব সুন্দরী। তবে কি জানো হেনরী? ওকে ওই হোটেল

থেকে সরিয়ে নাও। ভালো হবে। আমি তোমার মনে ব্যথা দিতে চাই না। আমি তোমার স্ত্রী সম্পর্কে তেমন কিছু জানিও না…'

: সে আমার স্ত্রী নয়!

: তা সে যাই হোক না কেন—তাকে এই জয়েন্ট থেকে সরিয়ে নাও। আমি বন্ধু ভেবেই তোমাকে এ অনুরোধ করছি।

কিন্তু আমার আদৌ কান নেই ওসব কথায়। আমি ভাবছি, ফ্লোরি আর হান্নার কথা। কোথায় পালালো ওরা? কিন্তু লোকটা যেন নাছোড় বান্দা। বললো, 'তোমার বউ যদি অন্য কোথাও চাকরী করতে চায়, আমি দেখতে পারি। অমন একজন সুন্দরী মহিলা!'

: ওসব কথা এখন থাক।'—আমি বললাম—'আর হ্যাঁ, আপনার সদিচ্ছার জন্যে ধন্যবাদ!'

কিছুক্ষনের নীরবতা। তারপর পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করে টাকা পয়সা যা আছে বের করলেন। গুনে দেখলেন, আড়াই শো ডলার। টাকাটা প্লেটের ওপর রেখে বললেন, 'এটা নাও। আর রেখে দাও তোমার পকেটে। তোমার স্ত্রীকে নাটকে চেষ্টা করতে বলো। কেন বলবে না?' বলতে বলতে তিনি কাঁটা-চামচ নিয়ে ঝুঁকে পড়লেন স্প্যাগেটির প্লেটের ওপর। আমি টাকাটা তুলে নিয়ে চটপট পুরে ফেললাম আমার ট্রাউজারের পকেটে।

ওখান থেকে বেরিয়েই আমি মোনার সঙ্গে দেখা করার জন্যে

ডান্স-হলের দিকে রওনা হলাম। আমার তখন অদ্ভুত এক মানসিক অবস্থা। দারুন রকম পানাহার হয়েছে। পকেট গরম। দেহটা যেন প্রজাপতির মতো ফুরফুরে। কোথায় গেলো ডিটেকটিভের রহস্যময় আবরণ, কোথায়ই বা গেলো ফ্লোরি আর হান্নার অলৌকিক অন্তর্ধানের দুশ্চিন্তা। একটা অকারণ ভালো লাগায় আচ্ছন্ন হয়ে, মনে মনে গুন গুন করে এগোতে লাগলাম সামনের দিকে। ক্রনস্কি বলে, এ আমার এক ধরনের ব্যাধি—আমি মূলত—ইউফোরিক। হতে পারে। তবে নিশ্চিত—এ আমার পানানন্দ নয়। যাকে বলে অ্যাল-কোহালিক-জয়। হুইস্কি তোমার মনকে অল্প একটু উস্‌কে দিতে পারে। তার বেশী কিছু নয়।

নাট্যশালার পাশ দিয়ে যাবার সময় বিলবোর্ডে একটা মুখ দেখে আমি চমকে উঠলাম। চেনা চেনা মনে হচ্ছে না? কিন্তু এখন তো আমার চমকাবার অবস্থা নয়। খোঁয়ারি কেটে গেলে এনিয়ে পরে মাথা ঘামানো যাবে। আপাততঃ পুরনো বন্ধু বিল উডরাফের মুখখানা মন থেকে কিছুতেই ঝেড়ে ফেলা যাচ্ছে না।

'হ্যালো, হ্যালো; কেমন আছো হে, হ্যাঁ হ্যাঁ চমৎকার, অনেক দিন পর দেখা, তাই না, কী করছো এখন? বউ কেমন আছে। ঠিক আছে, পরে কথা হবে—আমি বড্ড ব্যস্ত এখন। অবশ্যই আসবো এক সময়, গুডবাই…' যেন স্রোত বইছে কথার। দু'টি নিরেট শরীর অসময়ে মুখোমুখি হয়েছে, বিনিময় করছে

স্মরনিকা, ডায়াল করছে ভুল নম্বরে, প্রতিজ্ঞা এবং পুনঃ প্রতিজ্ঞা করছে, ভুলে যাচ্ছে, বিচ্ছিন্ন হচ্ছে, স্মরণ করছে আবার। ···দ্রুত, যান্ত্রিক, নিরর্থক, আর এ সব কিছুর যোগফলটাই বা কি অশ্ব ডিম্ব ?

উডরাফ—দশ বছর পরেও যাকে দেখে আগের মতোই লাগে। আমি আয়নায় তক্ষুনি নিজের মুখ দেখতে চেয়েছিলাম।—কুইক। দশ বছর। আর সে একটি কথায় জানতে চায়, তাবৎ খবরা খবর। ব্যাটা বদ্ধ কালা। এমন আবেগ প্রবন হতে আছে মানুষের ? দশ বছর। আমি প্যাঁচালো নলের মতো একটা করিডোর দিয়ে দৌড়ে চলেছি সময়ের পেছনের দিকে। নলপথের দু'পাশেই ফাটা আয়না লাগানো। আমি এখানেই একটি নির্দিষ্ট জায়গায় দাঁড়িয়ে যেন পরলোকবাসী উডরাফকেও দেখতে পাই। তাকে সেখানে সংরক্ষণ করা হয়েছে বিশেষ দ্রব্য হিসেবে। যেন অনুবীক্ষন-যন্ত্রের নীচে রাখা এক দুর্লভ প্রজাতির নমুনা। ওখানেই, নিজের অক্ষে সে অসহায়ের মতো ঘুরপাক খাচ্ছে। আর হ্যাঁ, ওই জায়গাতেই আসে আর একজন—যার মুখ নাট্যশালার বিলবোর্ডে এক পলক দেখেই আমার চট্‌কা ভাঙ্গবার উপক্রম হয়েছিলো। সে একটি মেয়ে—যাকে দেখে উডরাফ ক্ষেপে গিয়েছিলো। যাকে ছাড়া সে বাঁচবে না—এরকম প্রতীয়মান হয়েছিলো সবার। মেয়েটিকে সে যাতে পায়—এজন্যে সবাই তাকে সহায়তা করেছিলো। এমনকি তার মা বাবা। তাছাড়াও—

সাহায্য করেছিলো তার প্রুশিয়ান শ্যালকটিও—যাকে সে অহংকারী বলে ঘৃনা করতো।

আইডা ভের্লেন! যেন এই নামটির জন্যেই জন্ম মেয়েটির। সে ছিলো তার নামটির মতোই সুন্দর। সুন্দরী, নাটুকে, অবিশ্বাসী, নষ্ট। যেন অপরূপা এক ড্রেসডেন-পুতুল। আইডা, আইডা,.....এই নামটি আওড়াতে আওড়াতে আমাদের কান পচিয়ে ফেলতো উডরাফ। মেয়েটির ফিগার ছিলো সত্যি অতুলনীয়। চুলগুলো ছিলো কালো কুচকুচে। কোর্টে বিয়ের সময় বেঁকে বসায় সে কি অবস্থা! উডরাফ অশ্রু সজল চোখে তাকে বিদায় জানালো। পরদিন সে ওর কাছে পাঠিয়ে ছিলো অর্কিড আর মস্ত বড়ো চকোলেটের বাক্স। আইডা অজগরের মতো সব কিছু গিলে ফেললো অবলীলায়। মেয়েটি ছিলো হৃদয় হীনা!

পরে অবশ্য মেয়েটিকে সে বিয়ে করতে সমর্থ হয়। এজন্যে নিশ্চয়ই তাকে বিশেষ মূল্য দিতে হয়েছিলো। গাচ্চা দিতে হয়েছিলো লোভনীয় অঙ্কের অর্থ। চমৎকার, ছোট্ট একটি বাড়ি করে দিয়েছিলো ওকে। সপ্তাহে একাধিক বার নাটক দেখতে নিয়ে যেতো। মিষ্টান্ন দিয়ে ঢেকে রাখতো প্রায়। আর ঋতুমতী হলে হাত ধরে চুপচাপ ওর পাশে বসে থাকতো। ও একটু কাসলেই সে ছুটতো ডাক্তারের সঙ্গে কনসাল্ট করতে প্রাকাশ্যে সে পুরোদস্তুর একটা স্ত্রৈনের আচরণ করতো সব সময়। কিন্তু এতো করেই বা আইডার মন পেলো কোথায় উডরাফ?

মেয়েটি আপাদমস্তকে ছিলো একটা দানবী। আস্তে আস্তে জানা গেলো মেয়েটি নিরাবেগ, শীতল! একথা আমরা কেউ বিশ্বাস করতাম না। বিশ্বাস করতো কেবল উডরাফ নিজে। একই অভিজ্ঞতা হয় তার কাছে পরবর্তী কালেও। দ্বিতীয় তৃতীয় এবং চতুর্থ স্ত্রী—সবাই ছিলো তার কাছে উষ্ণতাহীন। তবে আইডার ব্যাপার অন্য রকম। শীতল তো শীতল, সে যদি তার দু'টি পা-ও হারিয়ে ফেলতো—উডরাফের ভালোবাসায় সামান্য ভাটা পড়তো না। বরং আরো গাঢ় হয়ে উঠতো তার প্রেম।

উডরাফের জনাছয় ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলো। আমি আবার তাদের মধ্যে একটু বেশী অন্তরঙ্গ। সব চেয়ে পুরনো বন্ধু তো বটেই। আমি যে কোনো সময় যাতায়াত করতে পারতাম ওদের বাড়িতে। আমি সেখানে খাওয়া দাওয়া এবং ঘুমোনো থেকে শুরু এরে স্নান এমনকি শেভও করতে পারতাম। যেন আমি তাদের পরিবারেরই একজন।

তবে হ্যাঁ, গোড়া থেকেই আমি অপছন্দ করতাম আইডাকে। ফলে সে-ও আমার সামনে সহজ হতো না। সে যাই হোক, আমি তাকে বন্ধু পত্নী ছাড়া আর কোনো কিছুই ভাবতাম না আর সে যে আমার এ মনোভাব পছন্দ করতো না—তা বলাই বাহুল্য। সে চাইতো, উডরাফ বা অন্যান্য বন্ধুর মতো আমিও তার আনুগত্য মেনে চলি। কিন্তু আমি তাকে পাত্তা দিলে তো?

মাঝে মধ্যে উডরাফ কাজে বেরিয়ে যাবার সময় আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে আইডা বলতো, তাকে একাকী বাসায় রেখে না-যেতে। বিশেষ করে অন্য একটা লোক যখন এখানে রয়েছে। কিন্তু দরজায় দাঁড়িয়ে উডরাফ বলতো, 'অসুবিধের কিছুই নেই।' হয়তো আমি তখন অপেক্ষা করছি, আইডা কখন আমার ব্রেকফাস্ট নিয়ে আসবে। আবার শুনতাম উড-রাফের গলা: এভাবে বলে না, ছিঃ। ও সেরকম মানুষ নয়, বুঝলে! আমি ওকে গভীরভাবে বিশ্বাস করি!'

মাঝেমধ্যে আমি হো হো করে হেসে উঠে বলতাম, 'মাত্ ঘাবড়াও আইডা। আমি তোমাকে ধর্ষণ করতে যাচ্ছি না। আমি পুরুষত্বহীন!'

: তুমি ধ্বজভঙ্গ?'—ক্ষেপে গিয়ে চেঁচিয়ে বলতো আইডা—ভণ্ডামীর আর জায়গা পাওনি!'

: ওর ব্রেকফাস্ট এনে দাও লক্ষ্মীটি!' এই কথা বলে হয়তো অফিসে চলে যেতো উডরাফ।

কিন্তু আমি বিছানায় শুয়ে নাশতা খাবো, এটা আইডা একদম সহ্য করতে পারতো না। এমনকি সে তার স্বামীকেও এ ব্যাপারে আমল দিতো না কখ্খনো। আমি অবশ্য বিছানায় ব্রেকফাস্ট করিনা। কিন্তু আইডাকে ছেল্ ধরাবার জন্যেই এ বাড়িতে এধরনের আবদার করতাম।

: উঠে এসে টেবিলে বসতে তোমার অসুবিধেটা কি?' বলতো আইডো।

: একটু ঝামেলা আছে। গরম গরম ভাব!'—আমি জবাব দিতাম।

: ওহ্—থামাও তোমার আবোল তাবোল!' খেঁকিয়ে উঠে আইডা বলতো, 'সেক্স ছাড়া আর কোনো চিন্তা তোমার মাথায় আসেনা?'

এ ধরনের কথা শুনে মনে করা স্বাভাবিক যে, যৌনতা ব্যাপারটাকে সে মনে প্রানে ঘেন্না করে। কিন্তু তার আচরণ ছিলো সম্পূর্ণ উল্টো। প্রচণ্ড রকমের কামুকী। তবে শীতলতা যা ছিলো, তা ওর মৌলিকত্বের দরুন। বস্তুতঃ ওর হৃদয়টা ছিলো বেশ্যার। বিছানায় ব্রেক ফাস্ট দিতে এলে আমি তার পুষির ওপর টোকা দিতাম। ট্রেটা আমার কোলের ওপর রেখে ও বলতো, 'ভালো লাগছে? আশা করি এতেই সন্তুষ্ট হবে। আর বিলও তার বন্ধুর ওপর আরো বেশী বিশ্বাসী হয়ে উঠবে নিশ্চয়ই?'

: ওকে বলে দিলেই তো পারো।' একদিন আমি বললাম।

: সে কিছুতেই আমার কথা বিশ্বাস করবে না। ভাববে আমি তাকে তোমার ওপর চটিয়ে দিতে চাইছি।'—জবাব দিলো আইডা।

একদিন আমি গোসল করতে গেছি বাথরুমে। কিন্তু গায়ে সাবান লাগিয়ে দেখি, আইডা টাওয়েল দিতে ভুলে গেছে। আমি বললাম, 'আইডা, তোয়ালে দিয়ে যাও!'

সে বাথরুমে ঢুকে আমার হাতে টাওয়েল তুলে দিতে এলো।

পরণে তার পাৎলা ঘরোয়া পোষাক। পায়ে সিল্কের মোজা। সে উচু হয়ে বাথটাবের পাশে র‍্যাকে টাওয়েল রাখতে যাবে, হঠাৎ তার পোষাকের মাঝখানে বিরাট ফাঁক! আমি সঙ্গে সঙ্গে হাঁটু গেড়ে বসে ওর পোশাকের ফাঁক দিয়ে মাথা ঢুকিয়ে দিলাম। ব্যাপারটা এতো তাড়াতাড়ি ঘটে গেলো যে আইডার আর বাধা দেবার সুযোগ হলো না। অথবা হয়তো বাধা দেবার ইচ্ছাও তার ছিলোনা। মুহূর্তের মধ্যে ওকে তুলে ফেললাম বাথটাবে। ওর পোষাক খুলে ছুঁড়ে ফেললাম মেঝের ওপর। তবে হ্যাঁ, পায়ের মোজা জোড়া অমনিই থেকে গেলো। কেননা মোজা পায়ে এ অবস্থায় ওকে ধারালো মনে হচ্ছিলো আরো। আমি চিৎ হয়ে শুয়ে ওকে টেনে নিলাম বুকের ওপর। ক্ষ্যাপা কুত্তির মতো চটে গেছে ও। আঁচড়ে কামড়ে লাফিয়ে দাপিয়ে অস্থির করে তুললো আমাকে। আমার নুনুর মধ্যে সে চিমটি কাটতে লাগলো জোরে জোরে। ওকে টেনে তুলে, আমিও উঠে দাঁড়ালাম। ভাবখানা, কাছে থেকে ভালো করে চিমটি কাট। ছোট্ট যোনিটা রসে ভরে আছে। আমি ওর গলার কাছটাতে কামড়ে দিলাম, দাঁত লাগালাম কানের লতিতে। সুন্দর, সাদা পাছার ওপরও বাসিয়ে দিলাম দাঁতের স্পষ্ট দাগ। কারো মুখে কোনো কথা নেই।

আমাদের শেষ হলে সে গেলো নিজের ঘরে পোষাক পরতে। তার মুখে আনন্দের গুঞ্জন ধ্বনি। ব্যাস—এভাবেই শুরু হলো।

এই দিনটির পর থেকে সে কেবল অপেক্ষা করতো, উডরাফ কখন বাইরে যাবে আর কখন সে নিজেকে নিক্ষেপ করবে আমার ওপর। একদিন আমি বললাম : তোমার ভয় করে না? হঠাৎ যদি ও এসে পড়ে?'

: সে তার চোখকে বিশ্বাস করবে না।'—বললো আইডা।—'ভাববে ভুল দেখছে। তোমাকে আমার যা ভালো লাগছে না! ওহ! মনে হয়, তুমি সত্যি আমাকে পছন্দ করো। তাই না?

: আমি ওইটা পছন্দ করি।' একটা ছোট্ট ঘুষি দিয়ে আমি বললাম, 'আমি তোমার যোনিটা পছন্দ করি। তোমার ওই জিনিষটা সত্যি দুর্দান্ত!'

কুত্তা! এই জন্যেই তো আমি তোকে ঘেন্না করতে চাই!' বললো আইডা

: ঘেন্না করতে চাও। তা করোনা কেন?

: ওহ্, কোনো কথা নয়।' সে আবেগ জড়িত গলায় বললো —'আমাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরো। এখানে। আমার স্তনের ওপর কামড়াও। তেমন শক্ত নয়। এখানে, হ্যাঁ এইখানে।' বলতে বলতে সে আমার আঙুল নিয়ে ঢুকিয়ে দিলো তার ফাটার মধ্যে।

: ঢুকাও!' সে অস্ফুট স্বরে বললো। তার চোখের তারা ঘুরছে। নিঃশ্বাস ছোট হয়ে আসছে।

কিছুক্ষন পর লাঞ্চ খেতে বসে : তুমি কি এক্ষুনি ভাগবে? আর

কিছুক্ষন থাকা যায়না ?

জবাবে আমি ওর গায়ের পোষাক উঁচু করে ধরে কফি খেতে লাগলাম। বললামঃ এসো কফিটুকু খেতে খেতে একটু ঘাঁটাঘাটি করা যাক।

ঃ অসভ্য কোথাকার !' সে বললো। কিন্তু আমার প্রস্তাব অনুযায়ী কাজ করলো। 'তোমার দু'টি আঙ্গুল নিয়ে এটা ফাঁক করো।'—আমি বললাম।—'এর রঙটা আমার খুব পছন্দ। মনে হয়, ভেতরে প্রবাল জড়ো হয়ে আছে। তুমি বলো, বিলের ল্যাওড়াটা মস্তবড়ো। আমি ভাবি, অতো ছোট্ট জায়গায় সে অতোবড়ো জিনিষটা ঢোকায় কী ভাবে।' কথা বলতে বলতে পাশের মোমদানী থেকে একখানা মোমবাতি নিয়ে আমি ওর হাতে দিলাম।—'দেখি, পুরোটা ঢোকাতে পারো কিনা ?'

সে পা ফাঁক করে কাজ শুরু করে দিলো। সে চেয়ে চেয়ে নিজের কীর্তি দেখছিলোও। সে পেছনের দিকে ঘুরতে শুরু করলো। তারপর পাছা ঘোরালো। আমি ওর পোঁদের তলা থেকে চেয়ারটা সরিয়ে মেঝেয় হাঁটু গেড়ে বসে ঘটনাটি লক্ষ্য করছিলাম অখণ্ড মনোযোগের সঙ্গে।

ঃ আমাকে দিয়ে তুই যা খুশি তাই করাস—শয়তান কোথাকার !'

ঃ তুমি এটা পছন্দ করো। নয় কি ?

মনে হলো, ওর সময় হয়ে গেছে। আমি সঙ্গে সঙ্গে মোমটা টেনে বের করে এক সঙ্গে আমার তিনটে আঙুল ঢুকিয়ে

দিলাম ওর ফুঁসে ওঠা পুষির মধ্যে।

আর কিছু করার নেই তোমার?—বললো আইডা।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে ফ্লাইয়ের বোতাম খুলে ফেললাম আমার। সঙ্গে সঙ্গে সে খপ্ করে আমার নুনুটা ধরে নিয়ে নিজের মুখের মধ্যে পুরে চুষতে লাগলো। রগড়াতে লাগলো জিহ্বা দিয়ে। যেন একটা ক্ষুধার্ত শকুন আমাকে ঠুকরে খাচ্ছে।

: গড!' সে বললো, 'আমি আগে কখনো এটা করিনি!' সে বাথরুমের দিকে দৌড় দিলো—যেন বিষ খেয়ে ফেলেছে। আমি ভেতরে গিয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লাম বিছানায়। ধরিয়ে নিলাম একটা সিগারেট। তারপর অপেক্ষা করতে থাকলাম ওর জন্যে। কেননা, আমি বুঝতে পেরেছিলাম, ঘটনা আরো গড়াবে।

সে ফিরে এলো সিল্কের বাথরোব পরে। নীচে কিছুই নেই।

তোমারটা শিগ্‌গীর বের করো।'—সে বললো নিজের কাপড় চোপর খুলে ছুঁড়ে ফেলতে ফেলতে। তারপর ঝাঁপ দিয়ে পড়লো আমার ওপর। আমরা দু'জন দুজনকে জাপ্টে ধরলাম। ওর যোনি ভিজে সপ্ সপ্ করছে।

তোমার শরীরে কী চমৎকার ঘ্রাণ!' আমি বললাম। 'কীভাবে এই গন্ধ হয়?'

অনুমান করো তো?

সে বিছানা থেকে টলতে টলতে চলে গেলো পাশের বাথরুমে। ফিরে এলে দেখি, হাতে পারফিউমের শিশি। সে তার হাতে

খানিকটা মাখলো এবং আমার গোপন অঙ্গে তা মাখিয়ে দিতে শুরু করলো। আমি যেন আগুনের মতো জ্বলে উঠলাম এবার। আমি শিশিটা তার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে পাগলের মতো মাখিয়ে দিতে শুরু করলাম ওর পা থেকে মাথা পর্যন্ত—শরীরের সর্বত্র। তারপর আমি দাঁত বসালাম ওর বগল তলায়, যোনির চুলের গোছা মুখে নিয়ে তা চিবুতে শুরু করলাম। এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার জিহ্বাটা ঢুকিয়ে দিলাম ওর পুষির ভেতরে। যেন একটা সাপ গর্তে ঢুকছে। তারপর প্রচণ্ড উত্তেজিত আমার শিস্নটা সজোরে ঢুকিয়ে দিলাম জায়গা মতো। সেও উত্তেজিত হয়ে উঠলো ভীষণ। আমরা যে কতো ভঙ্গীর আশ্রয় নিলাম, তার ইয়ত্তা নেই। কখনো ছোট টেবিলটার ওপর নিয়ে শোয়ালাম ওকে। কখনো বিদ্ধ অবস্থাতেই দু'হাতে উঁচু করে ওকে ধরে নিয়ে ঘুরে বেড়ালাম সারা ঘরময়। তারপর ওকে দু'হাতে ভর দিয়ে পা উঁচু করে হাঁটলাম। শিস্ন বিদ্ধ আছে যথারীতি। কখনো তা বের করছি, কখনো ঢোকাচ্ছি। যাতে সে আরো বেশী উত্তেজিত হয়।

তার ঠোঁট দু'টো প্রায় ছিঁড়ে গেছে। সারা মুখে এবং শরীরের অন্যান্য জায়গায় নানা রকম দাগ। কোনোটা সবুজ, কোনোটা নীল। আমার মুখের ভেতরে—আঠা আর শ্যানেল ৯৭৬ ১/২—এর অদ্ভুত আস্বাদ। আমার লুনুটা ইঞ্চি দুই বেশী লম্বা হয়ে ফাটা ছেঁড়া রবারের নলের মতো দুলছে। মনে হয়, কে যেন চিবিয়ে ওটার রসকষ সব বের করে নিয়ে গেছে।

রাস্তায় বেরিয়ে খুব ক্লান্তি বোধ করলাম আমি। যেন হাঁটতেই পারছি না। ড্রাগ স্টোরে ঢুকে মল্টেড মিল্ক খেলাম বেশ খানিকটা। ভাবলাম, রাজকীয় সঙ্গমের কামড় বলে একেই। চিন্তা করছিলাম, উডরাফের সঙ্গে দেখা হবার পর অবস্থাটা কী দাঁড়াবে?

কিন্তু উডরাফের জন্যে অপেক্ষা করছিলো আরো বড়ো ভয়ঙ্কর। প্রথমেই তার ব্যাঙ্কের চাকরিটা চলে গেলো। আইডা কেটে পড়লো তার এক প্রেমিকের হাত ধরে। বিল যখন শুনলো, ছেলেটার সঙ্গে আইডা গত এক বছর যাবৎ শুচ্ছে—সে ভয়ানক অসুস্থ হয়ে পড়লো। বিছানায় শুয়ে থাকলো ঝাড়া একটি বছর। এরপর চলন্ত গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে সে মস্তিষ্কে পেলো প্রচণ্ড আঘাত। এই দুর্ঘটনার পর পরই ওর বোনটা পাগল হয়ে গেলো। তারপর বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিলো একদিন। আর সে আগুনে পুড়ে মরলো তার নিজের বাচ্চাটাই। আহা, একমাত্র সন্তান! আশ্চর্য! কেন এই বিপর্যয়! বিল মনে মনে ভেবে তাজ্জব হয়ে যায়। সে তো কোনোদিন কারো ক্ষতি করেনি?

মাঝেমধ্যে ব্রডওয়েতে দেখা হয়ে যায় বিলের সঙ্গে। আমরা রাস্তার এক কোনায় দাঁড়িয়ে কথাবার্তা বলি। সে কখনো এরকম আভাস দেয় না যে তার বউয়ের সঙ্গে আমার মেলামেশার খবর সে রাখতো। আইডার কথা উঠলেই যা মুখে আসে গালাগাল করে। কিন্তু আমি তো জানি, এ গালা-

গাল নয়—বরং ভালোবাসারই নমুনা। যাই হোক, ইতি মধ্যে সে আর একটি মেয়েকে বিয়ে করেছে। আইডার মতো অতোটা সুন্দরী নয়। তবে অনুগত এবং নির্ভরযোগ্য। —'এক সময় তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবো!' বলে উডরাফ।

: আইডার মধ্যে কী পেয়েছিলে? বিদায় নেবার সময় এক-দিন ওকে জিজ্ঞেস করেছিলাম।

: কিচ্ছু না। আমি পেতলকে ভেবেছিলাম সোনা!' জবাব দিলো বিল।

আইডা ভেরলেন! আমি ডান্স্-হলের প্রবেশ দ্বারের, কাছে এসেও অতীতের সেই সহজ স্বাধীন দিন গুলোর কথা ভাব-ছিলাম। আরো কয়েক মিনিট আমাকে অপেক্ষা করতে হবে। আমার পকেটের টাকার কথা আমি ভুলে গিয়েছিলাম। যেন আমি এখনো বিচরণ করছি অতীতে। আশ্চর্য, আমি থিয়েটারে গিয়ে মঞ্চে আর দেখিনি তাকে। কিংবা ওপর তলার ড্রেসিং রুমে গিয়েও কথা বলিনি আইডার সঙ্গে। তার শরীর কি আগের মতোই সাদা, সুন্দর? তার কালো একরাশ চুল ছড়িয়ে থাকতো কাঁধের ওপর। আর অমন দুর্দান্ত যোনি সংসারে ক'টা মেয়ের হয়? আর বিল উডরাফ তো ওটা দেখেই অমন মজেছিলো; বেচারা! মনে পড়ে একবার বিল বলছিলো, সে প্রতি রাত্রেই আইডার পাছার ওপর চুমো খেয়ে নিজের আনুগত্য প্রমান করতো। কিন্তু তাতে কি

লাভ হতো কোনো? আইডা পাত্তাও দিতো না ওকে! অবশ্য ওর মতো নপুংসকের ওটাই ছিলো প্রাপ্য!

আরো একটা বিষয় ভেবে হাসি পেলো আমার। অনেকে মনে করে, দীর্ঘ শিস্নের অধিকারী হওয়াটাই জীবনের পরম পাওয়া। তাদের ধারনা, ওইটি মেয়েদের সামনে দোলাতে পারলেই কেল্লা ফতে। হ্যাঁ, প্রকাণ্ড পুরুষাঙ্গ ছিলো বিল উডরাফের। যেন ঘোড়ার ধন! মনে পড়ে, আমি প্রথম যেদিন ওটা দেখি, আমার কাছে অবিশ্বাস্য মনে হয়েছিলো। যেন নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। আইডাও নিশ্চয়ই তা দেখেছে। তার তো ওর ক্রীত দাসী হয়ে থাকবার কথা। বিশেষ করে দীর্ঘ শিস্ন সম্পর্কিত ওইসব প্যাঁচালে যদি বস্তু কিছু থেকে থাকে। ওটি আইডাকে আকৃষ্ট করতো বটে, কিন্তু ভুলভাবে। সে সব সময় আড়ষ্ট হয়ে থাকতো ওই অতিকায়ের সামনে। খুবই সংকুচিত বোধ করতো আইডা। এবং তাকে যতোবারই বিল লাগাতো, ততোবারই তার যোনি ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হতে থাকতো। মনে হয়, বিল ওর বুকে অথবা বগলে নুনু ঠেসে কাজ সারতো। আর আইডাও মনে হয়, ওটাই উপভোগ করতে ভালোবাসতো। যদিও উডরাফের মাথায় যে এ চিন্তা আসতে পারেনা, আমি তা জানি। তাহলে তারা কীভাবে কি করতো এসব? কে জানে বাবা!

আইডা ভেরলেন! আমার একটা ইচ্ছে ছিলো, তার সঙ্গে একবার দেখা করবো। কিন্তু সেই টাটকা মসৃন যোনিটা কি

আগের মতোই আছে? তা কি করে সম্ভব। এতোদিনে নিশ্চয়ই জায়গাটা অনেক ছড়িয়েছে। বড়ো হয়েছে বৃন্ত তবুও, এখনো যদি তা থেকে আঠা বেরোয়—যদি পাছাটা এখনো নরম থেকে থাকে—আমি এখনো প্রস্তুত।

এসব কথা চিন্তা করে আমি মনে মনে বেশ গরম হয়ে উঠলাম উত্তেজিত হয়ে উঠলো আমার শিস্ন।

আমি আধ ঘন্টা অপেক্ষা করলাম। কিংবা তার বেশীই হবে। কিন্তু মোনা কোথায়? আমি ওপরে গিয়ে ওর খোঁজ করতেই শুনলাম, আজ সে একটু আগে আগেই বাড়ি চলে গেছে। তার নাকি মাথা ধরেছিলো খুব।

৭

আগে ভাগে ডান্স-হল থেকে বাড়ি ফেরার আসল কারণ বুঝতে পারলাম পরদিন। মা বাবার কাছ থেকে খবর পেয়ে মোনা বাড়ি চলে গিয়েছিলো, আসলে আমার এখানে এসে উঠলেও সে তার পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক রেখেছিলো। কিন্তু ওর মা বাবা ভাইবোন সম্পর্কে ও কোনোদিনই খুব বেশী কিছু আমাকে খুলে বলেনি। আমি অবশ্য আঁচ করতে পারি। সেই পুরনো সমস্যা। আমি অবশ্য ওর পরিবারের সাহায্যের

ব্যাপারে ওকে সহযোগিতা করতে চাই। কিন্তু মোনা তা নেবে না। বলবে, 'তুমি কেন ঝকমারি পোহাবে? আমার বোঝা আমাকেই টানতে দাও।' বলতে বলতে পাগলের মতো কাঁদবেও সে কখনো কখনো।

কথার ফাঁকে হঠাৎ আমি বলে উঠলাম, 'তোমার জন্যে কিছু টাকা এনেছি মোনা। এই নাও!'—বলতে বলতে পকেট থেকে সেই আড়াই শো ডলার বের করে ওর হাতে দিলাম। টাকাটা হাতে নিয়ে সে অদ্ভুত ভাবে হাসতে লাগলো। আমি ওর কাঁধে হাত রেখে বললাম, 'সহজ হও মোনা। এতো ভেঙ্গে পড়লে চলবে কেন?' চোখের পানি মুছতে মুছতে সে বললো, 'আমি যে পারিনা ভ্যাল। তোমার এই সহৃদয়তা দেখলেই আমার বাবার কথা মনে পড়ে যায়। তিনিও ঠিক এই রকমটি ছিলেন। অতি দুঃসময়েও তিনি ফুল আর উপহারের প্যাকেট নিয়ে বাড়ি ফিরতেন। ঠিক তোমার মতো। তোমরা দু'জনেই স্বাপ্নিক। সেই জন্যেই তো তোমাকে ভালোবাসি। আমাকে কি বলবে, টাকাটা কোথায় পেলে? বলবে না! না বললে। আমি কিছুই মনে করিনা। তুমি চুরি করলেও তো আমি কিছু মনে করবো না। আমিও তোমার জন্যে চুরি করতে পারি। কী? পারি না? কিন্তু বুঝলে ভ্যাল, এই টাকার দাবীদার ওরা নয়। বাবার জন্যে আমার সহানুভূতি আছে। কিন্তু ওই খাওয়ানী সৎমা আর বেকার, অলস ভাই গুলো—। নাঃ, এ টাকার ওপর ওদের কোনো অধিকার নেই। বরং এ টাকায়

তোমার জন্যে কিছু কিনে ফ্যালো। অথবা—তোমার—ওই বাচ্চাটির জন্যেও কেনাকাটা করতে পারো। এমন কিছু কিনে দিতে পারো, যা খুব সুন্দর—চিরদিন থাকে।'

একটা বড়ো আরাম কেদারায় আমরা বসেছিলাম। আমি মোনাকে কোলে তুলে নিয়ে আঙুল দিয়ে ওর চুল আঁচড়ে দিচ্ছিলাম। বললাম, 'তোমার বাবা কি কোনোদিন সেরে উঠবেন?'

: জানি না ভ্যাল! তবে তিনি মরলেও বেঁচে যেতেন। আর সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে ফেলতাম আমি। তুমি কি বিশ্বাস করবে, আচার অচরণ ছাড়াও আমার বাবার সঙ্গে তোমার চেহারার কতো মিল? কিন্তু বাবাকে শুষতে শুষতে মা একেবারে শেষ করে ফেলেছে। একেবারে রক্ত চোষার মতোই। তোমাকে একদিন আমার বাবার কাছে নিয়ে যাবো। তার মৃত্যুর আগেই। আমার অনেক দিনের স্বপ্ন এটা।'

: যাওয়া যাবে একদিন।' বললাম আমি। যদিও এ নিয়ে কোনো দিনও ভাবিনি কিছুই।

: তোমার খুবই পছন্দ হবে তাঁকে। খুবই রসিক মানুষ। দারুন সব গল্প করতে পারেন। ওই ডাইনিটাকে বিয়ে না করলে বাবা লেখক হতে পারতেন।'

কথা বলতে বলতে অনেক সময় কেটে গেছে। মোনার বেশ দেরী হয়ে গেছে ডান্স-হলে যেতে। সে আয়না থেকে হঠাৎ ঘুরে আমার দিকে তাকিয়ে বললো, 'ভ্যাল, তুমি অবসর

সময়ে লেখো না কেন? তুমি তো সব সময় লিখতে চাইতে। তা লিখছো না কেন, বলোতো। আমি কাজ থেকে ফিরে এসে দেখবো, তুমি টাইপ রাইটারের সামনে বসে লিখছো—কতো আনন্দ হবে আমার। তাছাড়া সারাটা জীবনই তো আর তুমি চাকরি করবে না?'

বাইরে বেরুবার পোষাক পরে মোনা আমার কোলে এসে বসলো আবার। তারপর আমাকে জড়িয়ে ধরে বললো, 'শোনো লক্ষ্মীটি···আমার জন্যে নিজের জীবন ধ্বংস করো না। তোমাকে নাম করা লেখক হতে হবে। আমি তোমাকে সাহায্য করতে চাই। ভ্যাল—তুমি শুনছো না?' আমাকে আস্তে নাড়া দিয়ে সে বললো, 'কী ভাবছো তুমি?'

: না, কিছুই ভাবছি না।' আমি বললাম, 'স্বপ্ন দেখছিলাম।'

: ভ্যাল, কিছু করো—দোহাই। এভাবে চলে না। এই রকম একটা বিচ্ছিরি জায়গায় আমরা কতোদিন থাকবো? এখানে কী করছি আমরা? আমরা দু'জনই কি খানিকটা করে পাগল? ভ্যাল—আজ রাত্রেই শুরু করে দাও। কেমন? লিখে কিন্তু কেবল টাকাই নয়—অরো অনেক কিছুই পাওয়া যায়। ভ্যাল, আমাদের দু'জনকে একটা পথ বের করতেই হবে। শুনছো, লক্ষ্মীটি?'

আমি চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, 'মোনা, আমাদের ভেতরে একটা পরিবর্তন ঘটবে শিগগীরই। খুব শিগগীর। আমার তাই-ই মনে হচ্ছে। চলো, তোমাকে স্টেশন অব্দি

এগিয়ে দিয়ে আসি। আমার খানিকটা মুক্ত হাওয়ার দরকার।'
আমার কথায় মোনা কিছুটা হতাশই হয়েছে মনে হলো।
সে আরো ইতিবাচক কিছু আশা করেছিলো।
রাস্তায় হাঁটতে হাঁটত আমি বললাম, 'দ্যাখো, এক মুহূর্তে সব সমস্যার সমাধান করা যায়না। আমি লিখতে চাই। লিখতে আমাকে হবেই। কিন্তু তার আগে নিজেকে কিছুটা গোছগাছ করাতে হবে। কিন্তু চট্ করেই তা হবেনা। সময় লাগবে। তোমার চাকরিটাকে তুমি যেমন ঘেন্না করো, আমার চাকরিটাকেও আমি তেমনি ঘৃনা করি। আমি এক চাকরি ছেড়ে আর এক চাকরি নিতে চাইনা। আমি চাই পরিপূর্ণর পরিবর্তন। আমি অনেককে চিনি—কিন্তু নিজেকে চিনিনা। নিজেকে জানার জন্যে আমার সময়ের দরকার। আর চিন্তা করা তো একটা বিলাসিতা।'
সে আমার হাতে মৃদু চাপ দিয়ে জানালো, ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে। স্টেশনে পৌছে, ওকে গাড়িতে তুলে দিয়ে আমি বাড়ির দিকে পা চালালাম। হঠাৎ মনে পড়লো, আড়াই শো ডলার ওর হাতে দেবার সঙ্গে সঙ্গে ও টেবিলের ফুলদানির নীচে তা চাপা দিয়ে রেখেছিলো। টাকাগুলোর অর্ধেক বেরিয়ে ছিলো বাইরে—যা অন্যের নজরে পড়তে বাধ্য। ভাবলাম, টাকা গেছে। কেননা ক্রনস্কির চোখে ওটা পড়বেই। এবং চোখে পড়লে—নিজের প্রয়োজনে না হোক—আমাকে কষ্ট দেবার জন্যেই গাপ করবে।

যা ভেবেছি। টাকাটা ফুলদানির নিচে নেই। হঠাৎ মনে হলো মোনার কাছে তো মোনাহানের কথা বলা হয়নি আমার। বলা উচিত ছিলো। তখন কিছুই মনে হয়নি আমার। কিন্তু এ মুহূর্তে মনে হচ্ছে, টাকাটা দেবার পেছনে মোনাহানের কোনো কু মতলব আছে। আমি সঙ্গে সঙ্গে ডান্স-হলে ফোন করে বিষয়টা মোনাকে বলবো কিনা, ভাবলাম। তাছাড়া টাকাটা আমার অজান্তে মোনা সঙ্গে করে নিয়ে গেছে কিনা তা-ও জিজ্ঞেস করা দরকার। কিন্তু টেলিফোন না করে, এই বিচিত্র বাড়িটার ভিতরে খানিকটা বিচরণ করার ইচ্ছে জাগলো আমার মনে। আমি বাড়ির একটা অদেখা অংশে ঢুকে পড়লাম। কয়েক পা হাঁটবার পর একটা মস্ত ঘরে পৌঁছে গেলাম আমি। বাতি জ্বেলে কাপড় চোপর শুকোতে দেয়া হয়েছে। স্কুলের বেঞ্চের মতোই, দেয়াল ঘেঁষে রাখা আছে এক খানা বেঞ্চ। মখমলের স্কাল্-ক্যাপ পরা, সাদা দাড়িওয়ালা এক বুড়ো বসে আছে সেই বেঞ্চির ওপর। সামনের দিকে কিছুটা ঝুঁকেই বসে আছে মানুষটা। দু'হাতের মুঠোয় বেতের ছড়ি। সে ওই হাতের মুঠোয় চিবুক ঠেকিয়ে চুপচাপ বসে আছে। চোখের মনি নড়ে ওঠায় বোঝা গেলো, লোকটা জ্যান্ত। আমি এ বাড়ির অনেককেই দেখেছি। কিন্তু একে কখনো দেখিনি। আমি জার্মান ভাষায় তাকে সম্বোধন করলাম।

ইচ্ছে করলে ইংরেজীতেও কথা বলতে পারো তুমি।' সে বললো।

আমি কি আপনাকে বিরক্ত করছি ?

: মোটেই না।

ভাবলাম, নিজের পরিচয়টা একে দেয়া যাক। বললাম, 'আমার নাম……'

: এবং আমি—সে আমার নাম শুনবার অপেক্ষা না করেই বললো—'আমি ডক্টর অনিরাইফিক্সের বাবা। মনে হয়, সে আমার কথা কখনো তোমাকে বলেনি ?'

না, তা বলেনি!—তার সঙ্গে আমার দেখাও হয় খুবই কম।

সে ব্যস্ত মানুষ, মনে হয় খুবই ব্যস্ত…কিন্তু একদিন তাকে শাস্তি পেতে হবে। যে মানুষটি জন্মায় নি, তাকেও হত্যা করা যায় না!'…

: ক'টা আলো নিভিয়ে দেবো কি ?'—তার চিন্তাকে অন্য খাতে নিয়ে যাবার জন্যে আমি বললাম।

: না, বাতি থাকবে। আরো আলো…আরো আলো। সে ওপরে কাজ করে অন্ধকারের মধ্যে। সে খুব গর্বিত। সে শয়তানদের জন্যে কাজ করে। তার চেয়ে এই ভিজে কাপড়ের স্তূপের ভিতরে বসে থাকা অনেক ভালো। এখানে অনেক শান্তি।' বলতে বলতে লোকটা একটু থামলো। এখন কেবল কানে আসছে মেঝের ওপর কাপড় থেকে পানির ফোঁটা পড়বার আওয়াজ। আমি চমকে উঠলাম এই কল্পনা করে—যেন রক্ত পড়ছে ডক্টর অনিরাইফিকসের হাত থেকে।

: হ্যাঁ, রক্তের ফোঁটা!—' যেন আমার মনের কথা পড়ে ফেলে

বুড়োটা বলে উঠলো, 'সে একটা কসাই। সে মৃত্যুকেই তার ধ্যান-জ্ঞানে পরিনত করেছে। এ হচ্ছে মানব-মনের বিপুল অন্ধতা—যে শিশু পৃথিবীতে আসবার জন্যে সংগ্রাম করছে—তাকে আগেই শেষ করে দেয়া। এভাবে পশুরাও ভ্রূন-হত্যা করেনা! আমার ছেলে সবই জানে, সবই বোঝে—কিন্তু সে জানেনা, হত্যাই হলো সব চেয়ে বড় পাপ। এখানে এই কুঠরীতে বসে তার বাপ তার মঙ্গলের জন্যে প্রার্থনা করে। আর ওখানে সে কসাইগিরি—কসাইগিরি করে। ওখানে কেবল রক্ত আর রক্ত। সারা বাড়িটাই পচে গেছে। দূষিত হয়ে গেছে। কেবল এই কক্ষটাই পরিস্কার। আর আলোকিত। আলো কী সুন্দর। আলো, আলো। মানুষ অবশ্যই অন্ধকারে কাজ করবে না। মন নিশ্চয়ই থাকতে হবে পরিষ্কার। সে কি করছে না করছে, তা তার নিশ্চয়ই অবগত থাকতে হবে।'

আমি তো স্তব্ধ নিশ্চুপ। ভক্তিতে মন ভরে গেছে আমার। ব্লাইণ্ডিং লাইটের নীচে নিজেকে কেমন যেন সম্মোহিত মনে হচ্ছে। মাতৃভূমি থেকে নির্বাসিত রাজবৈদের মতো বসে আছে বুড়ো। মুর-শাসিত স্পেনের স্বনামধন্য চিকিৎসকের কথা মনে পড়ে যায় তাকে দেখলেই। হঠাৎ আমার কানে এলো চটির আওয়াজ। ঘোমপাল গরম দুধের পাত্র নিয়ে ঘরে ঢুকলো। সঙ্গে সঙ্গেই যেন বদলে গেলো বৃদ্ধের মুখভাব। সোজা হয়ে বসে সে স্বস্তির দৃষ্টিতে ঘোমপালের দিকে তাকালো। অতি-অনুগত হিন্দু ভৃত্যটির মুখের দিকে তাকানোও যেন তার জন্যে কতো

আনন্দের ব্যাপার। সত্যি, স্বভাবে, সহিষ্ণুতায়, মৌলিকত্বে এই ঘোমপালের কোনো তুলনা হয় না। আমি কল্পনায় দেখতে চাইলাম, এই দায়িত্বে নিয়োজিত থাকলে ক্রনস্কি কী করতো? দুধ খাইয়ে ঘোমপাল ভেতরে গিয়ে নিলো এক জোড়া বেড-রুম-স্লিপার। তারপর উবু হয়ে সে চটি জোড়া পরিয়ে দিতে লাগলো বুড়োর পায়ে। বুড়ো আদর করে আস্তে আস্তে টোকা দিতে থাকলো ঘোমপালের মাথায়।

বুড়ো ঘোমপালের থুতনি ধরে তার চোখের দিকে তাকিয়ে বললো, 'তুমি এক আলোর সন্তান!' একই মুগ্ধতাবোধ ঘোমপালের চোখেমুখেও। তাদের দু'জনের ভাব বিনিময় আর চোখে মুখে যে আলো ফুটে উঠেছিলো, তার কাছে ব্লাইডিং-লাইটের উজ্জ্বলতাও যেন ম্লান হয়ে গেছে।

আমি আমার ঘরে ফিরে ঘোমপালের জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। সে যেন আমাকে কি বলবে। দেখলাম, ক্রনস্কি চেয়ারে বসে একটা বই পড়ছে।

ঃ আরে, তুমি তাহলে বাড়িতেই ছিলে!'—ক্রনস্কি বললো। আর্থার ম্যাকহেনের 'দি হিল অব ড্রিম্‌স' বইখানা ছুঁড়ে ফেললো টেবিলের ওপর। এমন সময় ঘরে ঢুকলো ঘোম-পাল। তারপর আমার হাতে তুলে দিলো টাকা। আমি মৃদু হেসে, টাকাটা পকেটে রেখে ওকে ধন্যবাদ জানালাম। ক্রনস্কি ভাবলো, আমি তার কাছ থেকে ধার নিচ্ছি। সে তাজ্জব হয়ে গেলো। তার চেয়ে বেশী হলো বিরক্ত।

: যীশু! তুমি ওর কাছ থেকে ধার নিলে?

ঘোমপাল খুলে বলতে যাচ্ছিলো ব্যাপারটা! কিন্তু তাকে থামিয়ে দিয়ে ক্রনস্কি বলে উঠলো, 'ওর জন্যে তোমাকে আর মিথ্যে কথা বলতে হবে না। আমি ওর চালাকি বুঝি।'

ঘোমপাল সহজ স্বাভাবিক ভাবে বললো, 'মিস্টার মিলার আমার সঙ্গে কোনো চালাকি করছেন না।'

: আচ্ছা বেশ বেশ।'—ক্রনস্কি বললো, 'তাই বলে ওকে ফেরেশতা বলে গন্য করার দরকার নেই। বুঝলে বোকা হিন্দু?'

ঘোমপাল জবাবে প্রশ্রয়ের হাসি হাসলো। এরকম অসুস্থ মানসিকতার সঙ্গে তার পূর্ব পরিচয় আছে। কিন্তু ঘোমপালের হাসিতে ক্রনস্কির গায়ে যেন জ্বালা ধরে গেলো। বললো, 'অমন মাতব্বরী-হাসির ধার ধারিনা। আমি কোনো নীচু জাতের লোক নই! আমি একজন ডাক্তার। আমি একজন—'

: তুমি স্রেফ একটা শিশু!' সহজ অথচ দৃঢ়স্বরে বললো ঘোমপাল। বললো, 'স্বল্প বুদ্ধির যে কোনো লোকই ডাক্তার হতে পারে।'

আর যাবে কোথায়। তেলে বেগুনে জ্বলে উঠেছে ক্রনস্কি। চেঁচিয়ে উঠলো, 'তাই বুঝি? যে কেউ পারে—তাই না?'—সে থুথু ফেলবার জায়গা খুঁজতে শুরু করলো।

: ভারতে আমরা বলি—'। ঘোমপাল শুরু করে এমন কোনো শিশু তোষ গল্প, যা কোনো যুক্তিবাদী মন মেনে নেবে না।

সে সব পরিস্থিতির ওপর একটি করে নীতিমূলক গল্প বলতে পারে। আমি প্রচুর শুনেছি। গল্পগুলো হোমিওপ্যাথিক ওষুধের মতো। কিন্তু একবার শুনলে কখনো আর ভোলা যায় না। আমরা সহজ একটা আইডিয়াকে ব্যাখ্যা করবার জন্যে মোটা মোটা বই লিখি। কিন্তু প্রাচ্যে তা খুবই সংক্ষেপে বোঝানোর মতো ব্যবস্থা আছে। সংক্ষিপ্ত, কিন্তু হীরের মতো দ্যুতিময়। এখনকার গল্পটি হচ্ছে একটি জোনাকী নিয়ে, যে একদা এক মনভোলা দার্শনিকের পদতলে পিষ্ট হয়েছিলো। ক্রনস্কি এ ধরনের অসম উপমাবহুল গল্প পছন্দ করেনা। কিন্তু এই গল্পটি সে বেশ উপভোগই করলো বলে মনে হলো। মনে হলো, একটু আগের নিষ্ঠুর আচরণের জন্যে সে অনুতপ্ত। আসলে ঘোমপালকে সে পছন্দ করে। আমাকে কোন ঠাসা করবার জন্যেই সে ওকে আক্রমণ করেছিলো। কথায় কথায় ক্রনস্কি ঘোষের কথা জিজ্ঞেস করলো ওকে।

: ঘোষ ভারতে ফিরে যাবার অল্প দিনের মধ্যেই মারা গেছে।' জানালো ঘোমপাল।

: কী সাংঘাতিক।' মুখমণ্ডলে বিতৃষ্ণা জাগিয়ে ক্রনস্কি ভারত নামে অখাদ্য দেশটির মুণ্ডুপাত করতে থাকলো। বিষন্ন হেসে আমার দিকে তাকিয়ে সে জিজ্ঞেস করলো, 'ঘোষকে তোমার মনে আছে হেনরী! সেই যে বুদ্ধদেবের মতো চেহারার বেঁটে মোটা ছোকরাটা?'

আমি মাথা নেড়ে বললাম, 'মনে থাকবে না মানে? ওর

ভারতে যাবার ভাড়ার জন্যে আমি চাঁদা তুলিনি?'

: ঘোষ ছিলো একটা সন্ন্যাসী।'—বললো ক্রনস্কি।

: না, না—সন্ন্যাসী নয়।—ঘোমপাল হাত নেড়ে বলে উঠলো। বললো, 'ভারতে এরকম অনেক মানুষ আছে, যারা……'

: আমি জানি, তুমি কি বলতে চাও—ক্রনস্কি ফুঁসে উঠলো, 'কিন্তু আমাশয়ে এখনো মানুষ মরে নাকি? এটা কি মধ্য যুগ চলছে? নাকি তার চেয়েও আগের যুগ চলছে এখন ভারতে?'

ক্রনস্কি আমশয় রোগ সম্পর্কে এমন ভয়াবহ বিবরণ দিতে শুরু করলো যে, তা শুনে শরীর শিউরে উঠে। রোগ ব্যাধি থেকে দুর্ভিক্ষ, দাসত্ব, অসহায়তা কোনো কিছুই আর বাদ পড়লো না। অপদার্থ রাজা মহারাজা অধ্যুষিত বৃটিশ-কবলিত বিশাল ভারত একটি পচন ধরা দেশ ছাড়া ক্রনস্কির কাছে আর কিছুই নয়। কিন্তু ভারতের স্থাপত্য, সঙ্গীত, দর্শন, ধর্ম সম্পর্কে কোনো মন্তব্য নেই। মন্তব্য নেই সে দেশের মহিলাদের সৌন্দর্য, বর্ণাঢ্য পোষাক, সমধুর ঘণ্টাধ্বনি, জমকালো নিসর্গ, পুষ্প সম্ভার, জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও ভাষার বিভিন্নতা সম্পর্কে। পরিসংখ্যান গত ভাবে সে কেবল ভারতের নেতিবাচক একটি দিকই তুলে ধরেছে। কিন্তু ভালো দিকটার উল্লেখ করেনি সে। একবারও সে উচ্চারণ করেনি আগ্রা, দিল্লী, লাহোর, মহীশূর, দার্জিলিং, করাচী, বোম্বাই, কলকাতা বেনারস আর কলম্বোর নাম। বলেনি, একটি সাম্রাজ্যবাদী

অবকাশ সৃষ্টির উপকরণ হিসেবে সেখানে পার্শি, জৈন, হিন্দু, বৌদ্ধ—একই নিপীড়নের শিকার হচ্ছে।

ওদের দু'জনের মধ্যে কী কী কথা হয়েছে, তার সম্পূর্ণ আমার কানে ঢোকেনি। অর্ধেকটার মতো শুনেছি। মাঝে মধ্যে আমার কানে এসেছে এই সব শব্দ, যেমন বাংলা গুজরাট, মালাবার উপকূল, কালি ঘাট, নেপাল, কাশ্মীর, শিখ, ভাগবৎ-গীতা, উপনিষদ, রাগ, স্তূপ, প্রকৃতি, শূদ্র, নির্বাণ, চেলা, গুরু, হনুমান, শিব।.....

৮

শনিবার দুপুরের দিকেই আমি অফিস থেকে বেরিয়ে আসি। হাইম, লবচের, রোমেরো অথবা ওরুরকি আর মারার সঙ্গে লাঞ্চ খাই। কখনো কালিং কখনো বা গ্রীক কবি জর্জ মিলটিয়াদেস আমাদের সঙ্গে যোগ দেয়। এই কবি ও পণ্ডিত আমাদের বার্তাবহ-বাহিনীর অন্যতম সদস্য। মারা কখনো কখনো দাওয়াত করে ইরমা আর ডলোরেসকে। খাওয়া দাওয়া শেষ হতে তিনটে থেকে চারটে বেজে যায়। তারপর আমি মঙ্গে এবং বাচ্চাটাকে দেখার জন্যে ব্রুকলীনের দিকে রওয়ানা হই। এটা আমার ফি শনিবারের কর্মসূচী।

বরফ পড়ছে খুব। আমরা বেশ কিছুদিন ধরে পার্কে হাঁটা-হাটি করতে পারিনা। মঙ্গে'র ঘরটা বেশ গরম। কৌচের ওপর ক্যাণ্ডির বাক্স যথারীতি রয়েছে। আমরা পরস্পরকে যেভাবে সম্ভাষন জানালাম, তাতে অনেকের মনে হবে, আমরা পুরনো বন্ধু। বাচ্চাটা প্রায়ই থাকেনা। পাশের বাড়িতে সমবয়সীদের সঙ্গে খেলতে যায়।

ঃ সে তোমার জন্যে তিনটে পর্যন্ত অপেক্ষা করেছে।' মঙ্গে জানালো আমাকে।

ঃ কী করবো বলো—অফিসের নানা ঝামেলায় দেরী হয়ে যায়।' আমি কৌফিয়তের ঢঙে বলি। মঙ্গে জিজ্ঞেস করে, 'তোমার বন্ধু ডলোরেশ কেমন মেয়ে?' তারপর আমার দিকে এক তীব্র কটাক্ষ হেনে বলে—'তার সঙ্গে তোমার আর ওঠা বসা নেই?' মঙ্গে অবশ্য কখনো মোনার নাম উচ্চারণ করেনা। 'সে' 'তার' এই ভাবে বলে চালিয়ে দেয়। আমিও মঙ্গে'র সামনে মোনার নাম বলিনা।

ঃ আমার পাশে এসে বসো!'—মঙ্গে বললো, 'আমি তোমাকে কামড়াবো না।'

পাশাপাশি বসে কতো রকম কথা! মঙ্গের মুখে তার শারীরিক অবস্থার খবর পেয়ে চিন্তিত হবার চেয়ে রোমাঞ্চিতই হলাম বেশী। আশ্চর্য! যার সঙ্গে এতোগুলো বছর দাম্পত্য-জীবন কাটিয়েছি, যার শরীরের প্রতিটি অংশ আমার মুখস্থ-তার গোপন অঙ্গের অসুস্থতার সংবাদে রোমাঞ্চ জাগে কেন?

ডাক্তার কীভাবে তার যোনি পরীক্ষা করেছে তার বর্ণনা শুনে বড়োই রহস্যময় মনে হয় মঙ্গেকে।

: তা, ডাক্তার হিলারী তোমাকে কীভাবে পরীক্ষা করলেন?' আমি জিজ্ঞেস করি।

মঙ্গে অশ্লীল ভঙ্গীতে হাসলো। সে খারাপ খারাপ কথা বলবার সময় এরকম হাসে।

: তিনি কী করলেন?

: ওহ, তেমন কিছু নয়, সত্যি বলছি। সে যোনিটা ফাঁক করলো আঙুল দিয়ে।'—লক্ষ্য করলাম, সে 'আমার যোনি' বললো না।—'অবশ্য তার আঙুলের ওপর রাবার লাগানো ছিলো!'

কিছুক্ষণের মধ্যেই মঙ্গের যোনির রোমগুচ্ছের ওপর আমি আলতোভাবে আঙুল বুলোতে লাগলাম। অতীতের কতো কথা মনে হচ্ছিলো আমার।

: দেখি না তোমার কী হয়েছে?' আমি বললাম, 'আমাকে দেখতে দেবে?' ফিসফিস করে কথা বলতে বলতে আমি ওর যোনির ওপর আঙুল ছোঁয়ালাম। ফুটো দিয়ে রস গড়াচ্ছে। আমি সামান্য চাপ বাড়াতেই তার দু'টি পা আর একটু ফাঁক হলো।

: এখানে···ক্ষতটা কি এখানে?' আমি তার গা ঘেঁষে বসে বললাম।

তার দু' চোখ আধ খোলা। সে এমন ভাবে মাথা নাড়লো,

যাতে হ্যাঁ বা না দুটোই বোঝায়। আমি ওর আরো একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে আরো দু'টি আঙুল ঢুকিয়ে দিলাম যোনির মধ্যে। ওর কাধের ওপর একটা হাত তুলে দিয়ে আমার দিকে টেনে আনলাম। আমার আঙুল গুলো যথারীতি নড়াচড়া করছে জায়গামতো। রসে ভরে যাচ্ছে আমার হাত। আমি ওর হাতটা খপ করে ধরে নিয়ে আমার ফ্লাইয়ের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলাম সরাসরি। বোতাম-কীভাবে খুলে গেলো, জানিনা। যেন ম্যাজিক। সে আমার নুনুটা হাতে নিয়ে অভ্যস্ত ভঙ্গীতে রগড়াতে শুরু করলো।

অল্পক্ষনের মধ্যেই বাঁধ ভেঙ্গে গেলো। আমরা পরিণত হয়েছি দু'টি আদিম মানব মানবীতে। ওর অসুখ, তাই মাঝেমধ্যেই কাঁৎরে উঠছে। কিন্তু সঙ্গমে ক্ষান্ত দিচ্ছেনা। প্রায় শেষ মুহূর্তে আমি বিপুল বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়েছি—হঠাৎ—দরজায় করাঘাত! কী সর্বনাশ! আমরা দু'জনেই এমন চমকে উঠলাম, যেন এক্ষুনি হৃদস্পন্দন বন্ধ হয়ে যাবে। সে-ই আমার কাছ থেকে মুক্ত হয়ে দরজার দিকে দৌড়ে গেলো।

: কে?'—সে জিজ্ঞেস করলো।

: আমি!'—গলার আওয়াজেই চিনতে পেরেছি।

: ও তুমি! তাই বলো। কী ব্যাপার?

: আমি কেবল জানতে চাই, এখানে হেনরী আছে কিনা!'

: হ্যাঁ, সে অবশ্যই এখানে।' মঙ্গে বললো, 'কিন্তু ব্যাপারটা কি বলোতো?'

: একটা টেলিফোন এসেছে ওই নামে!'—বললো মেলাইন। তারপর আস্তে আস্তে বললো—'মনে হয়……ব্যাপারটা…খুব জরুরী!'

: আমি যাচ্ছি।' আমি ফ্লাইয়ের বোতাম লাগাতে লাগাতে বললাম।

রিসিভার তুলেই শুনি কার্লি'র গলা। সে আরশোলা-সদন, মানে আমাদের বাসা থেকে ফোন করেছে। কী ঘটেছে, সে তা বলছেনা। কেবল বলছে আমার এক্ষুনি বাসায় ফেরা দরকার। যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব।

কিন্তু কী হয়েছে, তা বলবে তো? মোনার কিছু হয়েছে?

: হ্যাঁ, তাই। তবে শিগগীরই সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে?

: মরে নি তো?

: না, অল্পের জন্যে বেঁচে গেছে। তুমি জলদি চলে এসো।' এ পর্যন্ত বলেই কার্লি' রিসিভার রেখে দিয়েছে।

আমি মেলাইনের স্মৃতিময়ী অবয়ব দেখতে দেখতে দ্রুত হলঘর পার হলাম। তার চোখে সহানুভূতি আর প্রবৃত্তির মিশ্রন। সে বললো: আমি তোমাকে বিরক্ত করতে চাইনি। কী করবো? ওরা বললো খুব জরুরী—তাই!'—

কিন্তু আমি মঙ্গের হাত ধরে দ্রুত নামতে লাগলাম নীচে।

: কী হয়েছে?' জানতে চাইলো মঙ্গে। কিন্তু আমাকে নীরব দেখে বললো, 'তাহলে কি ওর, মানে ওর কিছু হয়েছে?'

: তেমন কিছু নয়।' আমি বললাম। তারপর ক্লাকরুম থেকে

তুলে নিলাম কোট আর হ্যাট।

: ঠিক মতো যেয়ো!'—মঙ্গে বললো। তার কণ্ঠে উদ্বেগের অধিক কিছু ছিলো। কিছুটা অসন্তুষ্টি—কিছুটা অননুমোদন। আমি বেরুতে বেরুতে বললাম, 'তোমাকে এভাবে ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছে না আমার। কিন্তু কি করবো বলো!' বলতে বলতে হঠাৎ ওকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করলাম। জবাবে সে তার ঠোঁট দুটো বাড়িয়ে দিলো। আমিও আমার জিহ্বাটা ঢুকিয়ে দিলাম ওর গলার ভেতরে। ওর শরীরটা আমার দিকে আরো একটু ঘনিষ্ট হয়ে এলো। (জলদি জলদি—! কালির গলা যেন এখনো শুনতে পাচ্ছি)। 'হ্যাঁ, আমি তাড়াতাড়িই করবো!' আমি মনে মনে আওড়ালাম কথা ক'টি। তারপর ওর গাউনটা উচু করে আঙ্গুল ঢুকিয়ে দিলাম ওর গোপন অঙ্গে। আর কী আশ্চর্য—সে আমার ফ্লাই খুঁজে বের করলো ত্রস্ত হাতে। বোতাম খুলে করতলগত করলো সে আমার শিশ্ন। আমি ওকে দেয়ালের সঙ্গে চেপে ধরে নুনুটা সোজা ঢুকিয়ে দিলাম ওর যোনির মধ্যে। তারপর যা শুরু হলো, তা বর্ণনা করা একটু কঠিন। তার আচরণে আমার এটাই মনে হচ্ছিলো যে আমার পুরুষাঙ্গটি ঠিক আমার নয়—তারই নিজস্ব সম্পত্তি! আমরা দাঁড়ানো অবস্থাতেই চালাচ্ছিলাম। মঙ্গে প্রস্তাব দিলো ফ্লোরের ওপর শুয়ে পড়তে।

: তোমার ঠাণ্ডা লাগবে!' আমি বললাম।

: লাগুক।' সে জবাব দিলো। তারপর আমার প্যান্ট-ট্যান্ট

খুলে নীচে ফেলে দিলো। আমি আমার নুনুটা পুরো ঢুকিয়ে দিয়েছি। ও কাম-তাড়নায় অস্থির হয়ে হিস হিস করে বললো, 'ওহ্ আমি আর পারছি না!···তোমার অণ্ডকোষ সুদ্ধ ঢুকিয়ে দাও।' সে তৃপ্তিতে দু'চোখ মুঁদে ফেললো।

আমি ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চাই না এখন। আমি এক্ষুনি বেরিয়ে পড়বো। কিন্তু পারলাম না। তার আবেদনের গভীরতার কাছে আমাকে আত্ম-সমর্পন করতেই হলো। ('জলদি জলদি।'—কিন্তু আমি তো এ আশ্বাসও পেয়েছি যে, সে মরে নি) আমি না হয় একটা ট্যাক্সি নেবো। কতোক্ষণ লাগবে পৌঁছতে? দু'এক মিনিট দেরী হলে ক্ষতি কি? কে বুঝতে পারবে—আমার দেরী হবার আসল কারণ?

(ঠিক আছে, চলুক গাড়ি, চলুক মজা···লুটে নাও আনন্দ)। সে বুঝতে পেরেছে আমি আর দৌড়ুবো না। সে বুঝতে পেরেছে, যতোক্ষণ ইচ্ছে আমাকে সে আটকে রাখতে পারবে। অনেকক্ষণ পর, আমি আমার শিস্নটা একটু বাইরে বের করেছিলাম। কিন্তু সে তক্ষুনি আবার তা ঢুকিয়ে দিলো হাত দিয়ে। আমি তখন পরিপূর্ণ ভাবে প্রবিষ্ট হলাম। কয়েকটি আঘাত। ব্যাস—ওর হয়ে গেলো। যেন পাগল হয়ে গিয়ে দাপাদাপি করতে লাগলো সে আমাকে জাপ্টে ধরে। তারপর গোঙাতে গোঙাতে শুয়ে পড়লো চিৎ হয়ে।

পথে, মাথার মধ্যে নানা চিন্তার ঘূর্ণি। আবার কোন্ অঘটনের সামনে পড়তে হচ্ছে কে জানে। অবশ্য আমি তো জানি, বিপদ কেটে গেছে মোনার। সত্যি কথা বলতে কি, খবরটা আমাকে খুব একটা শিহরিত করেনি। কেননা, এরকম একটা কিছু যে ঘটতে পারে, তা আমি বেশ কিছুদিন ধরেই অনুমান করছিলাম। তা, কয়েক সপ্তাহ তো হবেই। যার সমস্ত ভবিষ্যত অনিশ্চিত, সে মেয়ে অন্যদের থেকে আলাদা চোখে তা কীভাবে দেখবে? বিশেষ করে, একটা পাপবোধে, একটা অপরাধবোধে যে ভুগছে।

আমি নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করলাম, 'ঘটনাটা কীরকম হতে পারে? সে কি জানতো যে, কালি ঘটনার সময় ওখানে থাকবে? তাকে সে উদ্ধার করবে?'

'সে বিষ খেয়ে মরতে চেয়েছিলো!'

ডক্টর অনিরাইফিক্সের বাড়ির ভেতরে ঢুকবার সঙ্গে সঙ্গে এই শব্দ—গুলো আমাকে সম্ভাষন জানালো। কণ্ঠস্বরটা অবশ্যই কালির।

মনে হলো, সে শুয়ে আছে। ঘুমোচ্ছে। ক্রনস্কি তার দেখাশোনা করছে। সে বললো, 'এসব কথা যেন ডক্টর অনিরাইফিক্সের কানে না-ওঠে।'

কালি বললো, 'ঘরে ঢুকেই আমার নাকে এলো ক্লোরো-

ফর্মের গন্ধ। সে চেয়ারের ওপর বসে আছে—যেন অজ্ঞান হয়ে গেছে। ভাবলাম, গর্ভপাতের কেস টেস কিনা—'

: ও কি কিছু বলছে, এ ব্যাপারে ?'—আমি জিজ্ঞেস করি, 'কেন এরকম করলো ?'

কালি চুপ করে থাকলো। আমি বললাম, 'আচ্ছা, তাহলে কি জেলাসিই এর কারণ ?'

বলতে পারছি না।' কার্ল জানায়, 'তবে সে বারবার বলছিলো, 'এ আমি সইতে পারবো না, এ আমি সইতে পারবো না।'

কী সইতে পারবে না ?

: মনে হয়, স্ত্রীর কাছে তোমার যাতায়াতের কথাই বুঝিয়েছিলো সে। সে তোমাকে ফোন করার জন্যে রিসিভার তুলেছিলো। হঠাৎ তার ধারনা হলো, কিছু একটা ঝামেলা হয়েছে।'

আসলে সে কী কী কথা বলেছিলো—ঠিকঠাক বলো দেখি।

হ্যাঁ, সে অনেক আবোল তাবোল কথাই বলেছে। বলেছে সে প্রতারিত, সে হ্যানো সে ত্যানো। সে বলেছে, তুমি তোমার বাচ্চাটাকে দেখতে যাওনা। তুমি আসলে যাও তোমার বউয়ের কাছে।'

আমি অবাক হয়ে তাকালাম কালির মুখের দিকে। বললাম, 'সে সত্যি সত্যি তোমাকে বলেছে এসব কথা ? তুমি বাড়িয়ে বলছো না তো ?'

কালি কথাটা না শোনার ভান করলো। সে অন্য কথা পাড়লো

হঠাৎ। বললো, 'এমন চমৎকার মিথ্যে কথা সে বানিয়ে বলতে পারবে না!'

মিথ্যে কথা? তার মানে?

তোমার সম্পর্কে যেসব কথা সে বলেছে। তোমার সেসব কথা শোনা উচিত ছিলো। ঈশ্বর, যেন সে সত্যি সত্যি তাকে ভালোবাসছে! সে তোমার সম্পর্কে এমন সুন্দর সুন্দর সব কথা বললো, যা ভাবা যায় না। কথা শেষ হলেই সে শিশুর মতো মাথা আছড়ে কাঁদতে শুরু করলো। ভাবো হে একবার তোমার সেই কথাগুলো। 'তুমিই আমাকে বদলে দিয়েছো। তোমাকে পাবার পর থেকেই আমি অন্য কোনো নারীর মুখের দিকে তাকাই না!'

এতে কোনো মিথ্যে আছে?' আমি ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললাম।

আছে!

কীভাবে জানলে?

: তা আর জানবো না। তোমাকে আমি হাড়ে হাড়ে চিনি মিয়া। তুমি কখনো বদলাতে পারো? কথাই তো বলে, 'স্বভাব যায় না মলে!'

আমি বিছানায় বসে ওর মুখের দিকে তাকালাম। বললাম, 'অবস্থা নিশ্চয়ই কিছুটা ভালো?'

কী করে তা জানবো! সে তো আর আমার বউ নয়!' কথাটা যেন ছুরির ফলার মতো চকচক করে উঠলো।

: তোমার কী হয়েছে কালি?'—আমি বললাম, 'তুমি কি

আমাকে হিংসা করো? ও ঘুম থেকে উঠলেই তুমি ওকে নিয়ে গিয়ে পুষতে পারো। তুমি তো আমাকে চেনোই—'

আমার কথা গুলি মারো।' কালি খেকিয়ে উঠলো, 'তোমারই উচিত ছিলো ওর হাত ধরে রাখা। যখন কেউ তোমাকে চায়, তখন তোমার পাত্তাও পাওয়া যায়না। আমার তো মনে হয়, তুমি মঙ্গের হাত ধরেই বসেছিলে! কিন্তু তোমাকে সে আর কখনো চাইবে না। আমার মনে আছে, তুমি কী দুর্ব্যবহার ওর সঙ্গে করতে। আমি তখন ছোট ছিলাম, সব কিছু বুঝতাম না। ডোলোরেসের কথাও আমি ভুলিনি! বুঝলে?'

: এই আস্তে!' আমি নীচু গলায় বললাম। 'ওর ঘুম ভেঙ্গে যাবে!'

সে এতো তাড়াতাড়ি উঠবে না। ঘাবরাও মৎ।' বললো কালি।

আচ্ছা, ঠিক আছে·····ডোলোরেসের কথা কি বলছিলে?' আমি নীচু গলায় বললাম, 'ডোলোরেসের ব্যাপারে আমি কি করেছি যাতে তোমার ক্ষতি হয়েছে?'

কালি ফুঁসে উঠলো, 'তুমি তাদের ধ্বংস করেছো। বুঝলে?'

তার মানে আমার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হবার পর তুমি ডোলোরেসকে বঁড়শিতে আটকাতে চেয়েও পারো নি। নয় কি?'

আগে পরের কথা নয়। আমি জানি, তার কী অবস্থা হয়েছিলো তখন। সে আমাকে খুলে বলেছিলো সব কথাই।

তোমার পেছনের দরজা বন্ধ হবার পর কী ঘটেছিলো, তুমি তার কিছুই জানো না। জানো কি?'

না তো?' আমি মুখ টিপে বললাম, 'কী ঘটেছিলো, বলো না?'

তুমি যদি জানতে চাও।' সে খোলাখুলি বললো, 'হ্যাঁ, আমি করেছিলাম। যদিও তা ছিলো একটা শুকনো কাঠ। আমি তাকে কাঁদতে দিলাম। কেননা তাহলে ওর কাঁধের ওপর হাত রাখা যায়। এবং সবশেষে আসল কাজ। কম বয়েসী হলেও আমার ভূমিকা ছিলো যথাযথ। আমি তোমার সুন্দরী ডোলোরেস সম্পর্কে কিছু কথা বলতে পারি।'

মাথা নেড়ে আমি বললাম, 'শোনা যাক তো, দারুন লাগছে।'

কিন্তু কে শোনে কার পাঁচালি।

সে শুয়ে আছে চুপচাপ। মুখে, ওই অবস্থাতেও এক চিলতে রহস্যময় হাসি। তার শরীরটা মনে হচ্ছিলো পালকের তৈরী। এ কি মৃত্যুরই প্রতিচ্ছবি? অবশ্য তার বেঁচে থাকাটা ছিলো জবরদস্তী। বলা চলে অতিপ্রাকৃত বেঁচে থাকা। সে ঘুম ছাড়া আর কখনো বিশ্রাম নেয়নি। আর ঘুমোলে সে পরিণত হতো পাথরে।

: তুমি কখনো স্বপ্ন দেখেছো?' আমি একবার ওকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। সে স্মরণ করতে পারছিলো না। অনেক দিন আগে সে একটা স্বপ্ন দেখেছিলো বলে আবছাভাবে তার মনে পড়ে।

ঃ কিন্তু স্বপ্ন দেখে প্রত্যেকেই।' আমি বলি, 'তোমার মনে পড়ার কারণ ঘটে না—তাই……'

অল্প দিনের মধ্যেই ও অবশ্য জানায়, সে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে আবার। তবে সেগুলো সব অস্বাভাবিক স্বপ্ন। যার সঙ্গে ওর কথাবার্তার কোনো মিল নেই।

৯

তেলাপোকা-ভবন থেকে নিষ্ক্রমনের দ্রুত সিদ্ধান্ত। কেন? কেননা রেবেকার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে।…

রেবেকা হচ্ছে আমার পুরনো বন্ধু আর্থার রেমণ্ডের দ্বিতীয় স্ত্রী। রিভার সাইড ড্রাইভের তীরে এক জমকালো অ্যাপার্টমেণ্টে ওরা থাকে। তারাই ক'টা ঘর ভাড়া দেবে। খবররটা প্রথম আনে ক্রনস্কি। জানায়, সে ওখানে একখানা রুম নিচ্ছে।

ঃ তুমি এসে ওর বউয়ের সঙ্গে কথা বলো না। তোমার পছন্দ হবে। মোনাও একটা বোন পাবে। বলেছিলো ক্রনস্কি।

ঃ তার নাম কি? আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম।

ঃ রেবেকা, রেবেকা ভ্যালেণ্টাইন।'

রেবেকা—এই নামটাই আমাকে উত্তেজিত করে তুললো।

আমি অনেক দিন থেকে—বেকী নয়; রেবেকা নামের কোনো মেয়ের সঙ্গে পরিচিত হবার বাসনা পোষন করছিলাম।

রেবেকা, রুথ, রোক্সেন, রোজালিণ্ড, ফ্রেডারিকা, উরশুলা, শীলা, নর্মা, গুইনিভের, লিওনোরা, সাবিনা, ম্যালভিনা, সোলেঞ্জ, ডেইরড্রে—কী চমৎকার এক একটা নাম। যেন ফুল, যেন নক্ষত্র।

নতুন বাসায় ওঠার ব্যাপারে মোনার খুব একটা উৎসাহ ছিলোনা। কিন্তু যখন সে বাড়িটা দেখলো এবং আর্থার রেমণ্ডের পরিচয় পেলো, সুর পাল্টে ফেললো।

আর্থার রেমণ্ডের ছোট বোন রেনী আমাদের দরজা খুলে দিলো। বছর উনিশ হবে বয়েস। দারুন দেখতে। আর গলার আওয়াজ কী মিঠে! অমন মিষ্টি কণ্ঠস্বরে সে যে কথাই উচ্চারণ করুক—সবাই সমর্থন করবে। তারপর আমাদের দেখা হলো রেবেকার সঙ্গে। রূপসী বটে। মোনাকে পেয়ে সে যেন তার বোনটিকেই পেয়ে গেছে। কেউ কারো চেয়ে কম সুন্দরী নয়। রেবেকা একটু বেশী পরিণত, বেশী নিরেট। তার সরাসরি তাকানোটা আমার কাছে ভালো লাগলো।

আর্থার কিছু ক্ষনের মধ্যেই এসে পড়লো। খানিকটা বেঁটে; কিন্তু স্বাস্থ্যবান, প্রানবন্ত পুরুষ। স্বতস্ফুর্ত হাসি লেগেই আছে। অনেক দিন আগেও ওকে আমি এরকমটাই দেখেছি। তখন মঙ্গেকে নিয়ে আমি থাকি ওদের পাড়াতেই। আমি

ছিলাম প্রিয় পাত্র। সদ্য কোনো বই পড়লে, সেই বইয়ের কাহিনী শোনাতাম ওকে তিন চার ঘণ্টা ধরে। দিন বা রাত যাই হোক না কেন। আমার স্পষ্ট মনে পড়ে জেনারেল আইভলজিন, ম্মেরদিয়াকভ কিংবা পাভেল পাভলোভিচ সম্পর্কে আলোচনা করে সারা বিকেল কাটিয়ে দিতাম আমরা। আলাপ করতাম ইডিয়ট অথবা ফিলিপভনা উয়োম্যানের সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা দৈবী আত্মা নিয়ে। ও তখন ইরমাকে বিয়ে করেছে। যে পরে আমার সহকর্মী হয় কসমোডেমোনিক টেলিফ্রকাস কোম্পানীতে।

ক্রনস্কি বড়ো রুমটা আগেই দখল করে নিয়েছে। তার মানে আমরা ছ'জন মানুষ বসবাস করবো একটা ছোট্ট গর্তে।

: ওহ্, ঠিক আছে। এতে কোনো অসুবিধে হবে না। বেশী রুমের দরকার কী ? দরকার হলে পুরো বাড়িটাই তো রয়েছে।'

—আর্থার হা হা করে হেসে উঠলো। বললো, 'এসে পড়ো এখানে। সবাই মিলে বেশ হৈ চৈ করে থাকা যাবে। হা হা হা।'

ও যে বেপরোয়া মানুষ, তা আমি জানি। তার যে আরো টাকার দরকার, এটা জানান দিতে সে গর্ববোধ করে। রেবেকা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। তার মুখে কি লেখা আছে, আমি তৎক্ষণাৎ তা পড়ে ফেললাম। হঠাৎ মোনা বলে উঠলো, 'অবশ্যই আমরা এটা নেবো।' ক্রনস্কি হাত ঘষতে ঘষতে খুশি খুশি গলায় বললো, 'নিশ্চয়ই নেবে। যা জমিয়ে

থাকা যাবে না এখানে। তুমি দেখে নিও। উফ!' তারপর সে ঢুকে পড়লো দরদস্তুরের প্যাঁচালের মধ্যে। কিন্তু টাকার ব্যাপারে আর্থার রেমণ্ড কিছু বলবে না।—'তোমরাই ঠিক করে নাও—!' তার এক কথা। পরক্ষনে সে পাশের ঘরে চলে গেলো। সেখানে একটা পিয়ানো আছে। হঠাৎ পিয়ানো বেজে উঠলো। কিন্তু রেবেকা এসে দাঁড়িয়েছে আমার সামনে। নানা রকম প্রশ্ন করতে শুরু করলো সে। কাজেই আর পিয়ানো বাদন শোনা হলো না আমার।

কয়েক দিনের মধ্যেই আমরা নতুন বাসায় এসে উঠলাম। এখানে এসে একটা জিনিষ আমি লক্ষ্য করলাম, সবাই একই সময়ে বাথরুম ব্যবহার করতে চায়। যেন লাইন লেগে গেছে। সিংকটা সব সময় ভরে আছে লম্বা লম্বা চুলে। আর আর্থার রেমণ্ডের নিজেস্ব কোনো টুথব্রাশ কখনো থাকেনা। সে যারটা হাতের কাছে পায় তারটা দিয়েই দাঁত ব্রাশ করে। ওর বড়ো বোন জেসিকা একজন অভিনেত্রী। সে প্রায়ই এসে রাত কাটায় এ বাড়িতে। যাতায়াত লেগেই আছে রেবেকার বুড়ী মায়ের। আর তাছাড়া অষ্ট পহর আসছে ক্রনস্কির বন্ধু বান্ধব, রেবেকার বন্ধু বান্ধব, আর্থারের বন্ধু বান্ধব এবং রেনীর বন্ধু বান্ধবরা। দিনরাত্তিরের কোনো বাছাবাছি নেই। যখন তখন আসছে যাচ্ছে। প্রথম প্রথম অবশ্য পিয়ানোর বাদন শুনতে ভালোই লাগতো। কিন্তু ক্রমেই তা যেন অত্যাচার বলে মনে হতে লাগলো আমার কাছে।

মোনা ডান্স হলের চাকরি ছেড়ে দিয়েছে। নাটকে সুযোগ হয় কিনা সেই খোঁজে আছে সে। আমরা সবাই রান্নাঘরে খেয়ে নিই। যার যার বিছানায় যাই প্রায় মধ্যরাত্রে। কিন্তু আর্থার রেমণ্ডের সময় সম্পর্কে কোনো মাথা ব্যাথা নেই। কোনো কিছু নিয়ে মেতে উঠলে সে আহার নিদ্রা এমনকি যৌনতার কথাও ভুলে যায়। ভোর পাঁচ টায় যদি সে ঘুমায় —ওঠে ঠিক আটটার সময়। যদি সে উঠতে চায়। আবার যদি মনে করে আঠারো ঘণ্টা ঘুমোবে—তাই সই। কোনো অসুবিধে হয় না। রেবেকার ওপর সে ভার দিয়ে রাখে তার কার্যসূচী নির্বায়নের। এরকম জীবন যাপন যে একটা অস্বাভাবিক পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটায়, তা বলাই বাহুল্য। যখন অবস্থা খুবই নাজুক হয়ে দাঁড়ায়—রেমণ্ড ক্ষান্ত দেয় হঠাৎ। মাঝে মধ্যে বেশ কিছুদিনের জন্যে সে উধাও হয়ে যায়। আর তার অনুপস্থিতিতে নানা সত্য মিথ্যা গল্প রটতে থাকে মুখে মুখে। গুজবের গরু গাছে ওঠে।

বাহ্যিক নানা সাদৃশ্যের কারণে সবাই মোনা আর রেবেকাকে গন্য করে বোন হিসেবে। কিন্তু ভিতরে ভিতরে দু'জনের মধ্যে কোনো মিলই নেই। রেবেকা কখনো তার ইহুদীরক্তের কথা গোপন করেনা। জীবন যাপন করে পুরোপুরি বর্তমানের মধ্যে। সে সুস্থ, স্বাভাবিক ও বুদ্ধি মতী। কথা বলে সহজ ভাবে—এবং আমার মনে হয় ধর্ষিত এবং নিদ্রিতও হয় সুষ্ঠুতার সঙ্গে। এক কথায়, একজন স্ত্রীর কাছে কোনো স্বামী

যা চায়, তার সব কিছুই তার আছে। সে একজন প্রকৃত রমনী। তার উপস্থিতিতে বেশীর ভাগ আমেরিকান মহিলাকে মনে হবে ক্রুটির স্তুপ।

নম্রতা তার বিশেষত্ব। দক্ষিন রাশিয়ায় জন্ম। তার মধ্যে রাশিয়ার ওই অঞ্চলের অধিবাসীদের সারল্য ফুটে উঠেছে। কেননা ওদের মধ্যেই সে বয়ঃপ্রাপ্ত হয়েছে। তার বাবা ছিলো ইহুদীদের পুরুত—র‍্যাব্বি।

কিন্তু মোনাকে দেখে তার শিকড় চিনবার উপায় নেই। অনেক দিন সে বলেছে, তার জন্ম নিউ হ্যাম্প শায়ারে। পড়েছে নিউ ইংল্যাণ্ড কলেজে। যদি সে বলে যে তার জন্ম হয়েছে পর্তুগিজ, কিংবা বাস্ক্, কিংবা রুমানীয়-জিপ্সীর ঘরে, অথবা তার বাবামা হাঙ্গেরীয় কিংবা জর্জীয়—অবিশ্বাসের কোনো অবকাশ নেই। দারুন ইংরেজি বলে। যে কোনো স্থানে তার উপস্থিতি যেন নির্মান করে এক অনিবার্য অস্তিত্ব। তার নিজস্ব ওয়েভ—লেংথ্ আছে। যা ছোট অথচ শক্তিশালী। যা অন্য সব ট্রান্স মিশনকে ছিন্নভিন্ন করে দেয়। বিশেষ করে যারা তার সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করতে চায়। বাত্যা-তাড়িত সমুদ্রের ওপর সে যেন বিদ্যুতের নাচানাচি।

নতুন পরিবেশে এসে সে যেন মুখোমুখি হয়েছে একটা চ্যালেঞ্জের। তার মনে হচ্ছে, এর মোকাবেলা করতে সে সক্ষম হবেনা। যেন তার পাসপোর্টটা ঠিকই আছে। কিন্তু মাল-

পত্র সন্দেহ উদ্রেককারী। যাবতীয় সংঘর্ষের শেষ পর্যায়ে এসে সে শক্তি প্রয়োগ করে। কিন্তু সে নিজেও জানে, তার শক্তি বহু ব্যবহারে কমে আসছে ক্রমশ।

ছোট্ট ঘরটির মধ্যে আমি ওর সেবা করি। তৈরী করে তুলি পরবর্তী সংঘর্ষের জন্যে। আমি ওকে সরাসরি কোনো কথা জিজ্ঞেস করিনা। আমি জানি, বরফের স্তরটা কোথায় পাৎলা। আর সেভাবেই অগ্রসর হই আমি। তার গোপনীয়তা যেন আমাকেও পেয়ে বসেছে। যা তাকে রক্ষা করছে—এবং আমাকেও।

রেবেকা মোনাকে চমৎকার ভাবে গ্রহন করেছে। যেন সত্যিই দু'টি বোন। কিন্তু আমাদের চারজনের ভেতরে একটা অদৃশ্য খেলা বেশ জমে উঠেছে। একটা চতুস্কোন দ্বন্দ্ব। রেবেকা চাইছে মোনার স্ব-কক্ষে অবস্থানের আস্থাবৃদ্ধি। আর্থার রেমণ্ড কামনা করে, আমার মনোভাবনা তার খাতেই বয়ে যেতে থাকুক। যদিও এরকম কামনা বাসনার কোনো কারণ ঘটেনি। সব ব্যাপারে আমি রেবেকাকে তুলে ধরছিলাম উচ্চে। এবং সেও আমাকে। ক্রনস্কি চমৎকার ভাবে পালন করছিলো রেফ্রীর ভূমিকা। কিন্তু তার স্ত্রীর কোনো ভূমিকা নেই এ ব্যাপারে। তুমূল আড্ডার মধ্যেও প্রায়শ তার ঘুম পায়। সে ঘুমের দোহাই দিয়ে কেটে পড়ে এবং শ্লথ পায়ে হেঁটে যায় বিছানার দিকে। কিন্তু ক্রনস্কি ঘুমোতে গেলে দু'জনের যা ঝগড়া শুরু হয়ে যায়! ওহ্, ভাবা যায়না। স্ত্রীকে উপেক্ষা

করার ফল হাতে হাতে পেতে শুরু করে ক্রনস্কি।

আমরা আমাদের ঘরে শুয়ে পড়লেও আর্থার এসে দরজা ধাক্কাতে থাকে। জানতে চায় আমি আর মোনা ঘুমিয়ে পড়েছি কিনা। আমরা জেগে থাকলে আর রক্ষা নেই। ঘরে ঢুকে অবিরাম বকবক করতে থাকে সেই নির্ঘুম বাচাল। ঘুমে আমার দু'চোখ জড়িয়ে এলেও নিয়মিত বিরতিতে আমাকে হ্যাঁ হ্যাঁ —না না এই শব্দ গুলো উচ্চারণ করতেই হয়।

একদিন ভোর বেলা বাথরুমে ঢুকে শাওয়ার-বাথ করছি। হঠাৎ নুনুর দিকে নজর পড়ায় শিউরে উঠলাম। নুনুটার আগায় রক্ত। বলাই বাহুল্য আমি আতঙ্কিত হয়ে পড়েছি সঙ্গে সঙ্গে। বিদ্যুৎ চমকের মতোই মনে হলো, আমি উপদংশে আক্রান্ত হয়েছি। সিফিলিস। আমার মনে আর কোনো সন্দেহই থাকলো না যে এই কালব্যাধি আমাকে উপহার দিয়েছে মোনা।

যাই হোক, এসব ক্ষেত্রে সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারের কাছে দৌড়ুনো আমার স্বভাব নয়। কারন তাদের খপ্পড়ে পড়বার ইতিহাস আমার অজানা নেই। মনে মনে আওড়ালাম, 'অসুখ হয়েছে, অসুখ একা একাই সেরে যাবে।' ক'দিন পর ভাবলাম মোনাকে একবার এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে কেমন হয়।

: শোনো!' আমি সোজাসুজি হাসতে হাসতে বললাম, 'তোমার যদি কোনো খারাপ অসুখ থাকে, আমাকে খুলে বলো। আমি তোমাকে একবারও জিজ্ঞেস করবো না, এ

ব্যারাম তুমি কোত্থেকে পেলে? আমি সত্যি কথাটা জানতে চাই—ব্যাস্।'

আমার অকপট জিজ্ঞাসায় সে অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো।

: টয়লেটে বসে এই রোগটা তুমি কামাও নি তো?' আমি বললাম। তার প্রচণ্ড হাসি এবার বাঁধ ভাঙ্গা হয়ে উঠলো। আর থামতেই চায়না।

: নাকি পুরনো কোনো ঘটনার জের হিসেবেই এটি অর্জন করেছো?' আমি বললাম, 'কবে এবং কোথায় কী ঘটেছে, তা জানার দরকার নেই আমার। জিনিষটা তোমার আছে কিনা, এটাই আমার জানা প্রয়োজন।'

জবাব ছিলো—না। নিরেট না। জবাব দেবার সঙ্গে সঙ্গেই তার মুখভাবও পরিবর্তিত হলো। সামান্য রাগান্বিত মনে হলো মোনাকে। ভাবখানা এই, আমি তাকে এই ধরনের দোষারোপ করতে পারলাম কিভাবে।

: ঠিক আছে।' আমি বললাম, 'যদি তা হয় তো খুব ভালো কথা। এ নিয়ে উদ্বিগ্ন হবার কিছু নেই। বাতাস থেকে তো আর রোগ জীবানু এসে কারো শরীরে ঢুকতে পারেনা। আমি এটা ভুলে যেতে চেষ্টা করবো।'

কিন্তু ভুলতে চাইলেই কি ভোলা যায়। অতো সহজ নয় ব্যাপারটা। সপ্তাহ খানেক কেটে গেলো। সঙ্গমহীন। কিন্তু যারা প্রতিদিন একই রাত্রে একাধিকবার মিলিত হয়, তাদের পক্ষে ব্যাপারটা হৃদয় বিদারক। একবার ভেবেছিলাম কনডম

ব্যবহার করলে কেমন হয়। কিন্তু বস্তুটি খুবই ক্ষতিকর। এক-মাত্র উপায় ছিলো হস্ত মৈথুন। আমরা ওইভাবেই চালাতে লাগলাম ঠ্যাকা কাজ। সত্যি বলতে কি এটাও যেন একটা আবিস্কারের মতো মনে হতে লাগলো আমার কাছে। আমি মানসিকতার কথাই বলছি। আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায় আমার পাশে শুয়ে মোনা যেন হয়ে উঠেছিলো কেমন অচেনা, রহস্যময়ী। ওর পুষির মধ্যে আঙ্গুল চালিয়েই আমি বের করে নিলাম এক রোমহর্ষক কাহিনী। যা কোনোদিনও আমাকে সে বলেনি। আমার আঙ্গুলের খোঁচায় ওর গর্ত থেকে বেরিয়ে এলো রস···মোনার ভাষায়—নোংরা।'

মোনা উগরে দিলো সেই অবিশ্বাস্য কাহিনীও। গাড়িতে চড়ে তিন অদ্ভুত আগন্তুকের সঙ্গে তার নৈশ অভিযানের গল্প। তখন সে ডান্স হলে কাজ করে। সে মুখে একরকম বললেও আমি প্রকৃত অবস্থাটা আঁচ করে নিলাম।····· ভাবলাম, পরিবারের স্বার্থে, নগদ পঞ্চাশ ডলার হাতে পেয়েই সে অচেনা দুই বদ ইতালীয়ের হাতে সপে দিয়েছিলো নিজেকে।···গাড়িতে চেপে, অন্যের নজর এড়িয়ে কোলের ওপর মাগি বসিয়ে মজা লোটা নতুন কিছু নয়। মদফদও কষে গেলা হয় সে সময়। যাই হোক, গাড়িতে উঠে মোনা নাকি মদ খাবার ভান করছিলো ; কিন্তু খায় নি। অন্যরা গলা পর্যন্ত গিলেছে। অবশ্য চুমো জিনিষটা খেতে বা খেতে দেবার ব্যাপারে মোনার কোনো সংস্কার নেই। ব্যাপারটা তার

কাছে তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। বিস্তু লোক দু'টো যেভাবে তার পাছা টিপতে থাকলো, আর হাঁটুর ওপর দিকে নিজেদের হাত চালিয়ে নিয়ে যেতে থাকলো, তাতে ঘাবড়াবার কথাই। এবং দু'জন একই সঙ্গে—ভাবো একবার! গাড়িতে ছিলো আরো দু'টি মেয়ে। তারা চলন্ত গাড়িতে সীট বদলাবদালি করে কায়কারবার চালাচ্ছিলো অভ্যস্ত ভঙ্গীতে। কিন্তু ওরা ছিলো বাজারের মেয়ে। ওরাও ভেবেছিলো, মোনা যা তা মেয়ে নয়। টম হ্যারি ডিকের সঙ্গে শোয়না। তাই মোনার প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে তারা পেছনে এসে তাকে সামনের ভদ্রগোছের লোকটার পাশে বসতে দিলো। তারপর নিজেরা পুরুষদের কোলে গিয়ে টপাটপ বসে পড়লো। তাদের পাছার কাপড় অবলীলাক্রমে সরে গেলো। তারপর হেসে হেসে, সিগারেট খেতে খেতে এমন ভাবে নড়াচড়া করতে শুরু করলো যাতে মরদদের আনন্দে কোনো ব্যাঘাত না-ঘটে।

: অন্য লোকটা তখন কী করলো?'—আমি হঠাৎ জিজ্ঞেস না করে পারলাম না।

: কিছুই করলো না!' সে জবাব দিলো, 'আমিই তার হাত ধরলাম। স্বাভাবিকভাবে কথা বার্তা শুরু করলাম, যাতে কুচিন্তা থেকে ওর মনটা দূরে থাকে।'

: তারপর?' আমি বললাম, 'গুল-গাপ্পা রাখো। আসলে কী ঘটলো, ঝেড়ে কাসো! সে কি করলো তারপর?'

: বলছি। সে অনেক ক্ষন আমার হাত ধরে থাকলো— বিশ্বাস করো আর না করো। তাছাড়া তার করবারও তো কিছুই নেই। কেননা গাড়িটা সে-ই চালাচ্ছিলো।'

: তার মনে, তুমি বলতে চাইছো, সে গাড়ি থামাবার কথা কখনো ভাবেনি।

: অবশ্যই ভেবেছিলো। সে অনেক বার চেষ্টা করেছিলো নিশ্চয়ই।'

কিন্তু মোনা কীভাবে সত্যটা উচ্চারণ করবে, তা ভাবছে এখন।

: তারপর কী হলো?'—আমি সহজ ভাবে জিজ্ঞেস করলাম।

: হঠাৎ লোকটা আমার হাতটা ঝেড়ে ফেললো'—

: বলো? থামলে কেন?

: তারপর হাতটা আবার ধরে তার কোলের ওপর রাখলো। তার ফ্লাই খোলা। নুনুটা খাড়া হয়ে আছে। দুলছে। উরি ব্বাস্। অতো বড়ো একটা ডাণ্ডার কথা ধারনাও করা যায়না। আমি ভীষণ ঘাবড়ে গেলাম। ঝাপটা দিয়ে ছাড়িয়ে নিলাম নিজেকে। সঙ্গে সঙ্গে সে গাড়িটা থামিয়ে আমাকে ধাক্কা মেরে বাইরে ফেলে দেবার চেষ্টা করলো। আমি বললাম, 'আমাকে ফেলে দিও না। গাড়িটা আস্তে চালাও। যা করো —পরে কোরো। অতো তাড়া কীসের?'...আমার বুক থর থর করে কাঁপছে। সে রুমালে মুখ মুছে, আবার চালিয়ে দিলো গাড়ি। মুখে অশ্লীল, অশ্রাব্য কথা। উঃ যা নোংরা-মাগো, ভাবা যায়না।'

: কী বললো ? কী কথা বললো লোকটা ? তোমার কি মনে আছে ?

: ওহ্, সেকথা আমি উচ্চারণ করতে চাই না।···জঘন্য।'

: এতো অসুবিধা।'—আমি বললাম।

: তাহলে শোনো।-সে বললো, "তোমার মতো মেয়েকেই চাই। তোমাকে করতে চাই অনেকটা সময় নিয়ে। তুমি তো কুমারী নও। তাহলে আর এতো ধানাই পানাই কেন ? কতোবার শুয়েছো, তার হিসেব আছে নাকি ? তোমার পুষি হাঁ হয়ে গেছে কবেই তো ?" এই সব কথা সে বলতে থাকলো।'

: গরম হয়ে যাচ্ছি কিন্তু।'—আমি বললাম, 'থামলে কেন, বলো, বলে যাও।'

এখন মনে হচ্ছে, অকথিত এতগুলো কথা বলবার পর মোনার বুক অনেকটা হালকা হয়ে গেছে। আর আমরা দু'জনেই অনুভব করছি এই স্বস্তি। মোনা বলে চললো; এমন কি পেছনের সীটে বসা লোক গুলোও তাকে রেপ করার জন্যে ক্ষেপে উঠলো। সে তো ঘেমে উঠলো আরো। এখন উপায় ? তখন সে এমন একটা ভাব দেখাতে শুরু করলো, যেন একজনের পর একজনের কাছে সে দেহদান করবে। সামনের শয়তানটা তার এ ইঙ্গিতে তক্ষুনি গাড়ি থামিয়ে তাকে নিয়ে বাইরে যাবার জন্যে তৈরী।

: আস্তে চালাও।' আমি তখন বললাম, 'আমি পরে দেবো

তোমাকে। আমি চাইনা, একই সঙ্গে সবাই আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ুক।' কথা শেষ করে আমি ওর নুনুটা হাতে নিয়ে রগড়াতে শুরু করলাম। জিনিষটা এক মিনিটের মধ্যে লৌহদণ্ডের মতো শক্ত হয়ে উঠলো। আকারেও তা বহুগুন বড়ো হয়ে উঠলো আগের চেয়ে। যীশু গো—আমি জীবনেও এতো ভয় পাইনি। সে অবশ্যই একটা পশু। সে তার অণ্ডো-কোষ জোড়াও গুঁজে দিলো আমার হাতের মুঠোয়। সেও এক বিশাল ব্যাপার। আমি তার অণ্ডকোষ জোড়া ঝাঁকাতে লাগলাম, যাতে আগে ভাগেই ওর বীর্য পাত ঘটে যায়।'...

: শোনো।' আমি বৃহৎ অশ্ব-শিস্নের গল্পে উত্তেজিত হয়ে বললাম, 'এসো, আমরা খোলাখুলিই আলাপ করি। আচ্ছা, অমন ঢাউস নুনুটা হাতে নিয়ে চটকাতে চটকাতে তোমার নিশ্চয়ই একবার ধর্ষিত হতে সাধ জাগলো, তাই না?'

: রোসো।' সে বললো। তার চোখ চকচক করছিলো। আমার হস্তলাঘবক্রিয়ায় তার মুত্রদ্বার ইতিমধ্যে ভিজে সপ সপ করছে।...'আমাকে এক্ষুনি কুপোকাৎ করো না।' সে মিনতি জানালো, 'তাহলে তো আমি গল্পটা শেষ করতে পারবো না। যীশু—আমি কখনো ভাবিনি, তুমি এমন করে পুরো কেচ্ছাটা শোনবার জন্যে গোঁ ধরবে।' বলতে বলতে সে তার পা দু'টোকে আমার হাতের ওপর এগিয়ে দিলো। যাতে সে বেশী গরম না হয়ে ওঠে। 'শোনো, আমাকে চুমো খাও।'—বলতে বলতে সে তার জিহ্বাটা সোজা ঢুকিয়ে দিলো

আমার গলার ভেতরে।—'ওহ্, এখন আমাদের সঙ্গমরত হওয়া দরকার আর পারিনা। আর সহ্য করতে পারিনা। এটা একটা অত্যাচার। তুমি এতো তাড়াহুড়ো করছো—ওহ্, আমি পাগল হয়ে যাবো গো।'…

অতো ক্ষেপে যাচ্ছো কেন?' আমি বললাম, 'তারপর কী ঘটলো বলবে তো! লোকটা কী করলো?'

: সে আমার ঘাড়ে ধরে, আমার মুখটা তার কোলের ওপর সজোরে চেপে ধরলো। বললো, 'তোমার কথা মতোই কিন্তু আমি গাড়িটা আস্তে চালাচ্ছি। তুমি রগ্‌ড়ে যাচ্ছো—রগড়ে যাও। তারপর আমি তোমাকে লাগাবো। কষে লাগাবো খন!' আমি ওর নুনুটা দেখে অবাক হয়ে গেলাম। মনে হলো কামড়াই! সত্যি বলছি ভ্যাল। আমি এরকমটা আর জীবনেও দেখিনি। তখন যেন আমার আত্ম-সমর্পিত অবস্থা। যেন তখন সে আমাকে যা খুশি তাই-ই করতে পারে।

: তুমি জানো, আমি কি চাই!'—লোকটা বললো, 'তোমার জিহ্বটাকে কাজে লাগাও। এর আগেও নিশ্চয়ই মুখে নুনু নিয়েছো! কি নাও নি?' বলতে বলতে সে আমার মুখের মধ্যে তার শিশ্নটা দ্রুত ওঠানামা করাতে শুরু করে দিলো। সারাটা সময় আগের মতোই সে আমার ঘাড়টা তার কোলের ওপর চেপে ধরে রাখলো। আমার তো প্রায় পাগল হয়ে যাবার অবস্থা। হঠাৎ তার এসে গেলো! উহ্—কী ভয়ঙ্কর ব্যাপার! আমার মনে হলো, বীর্যের সেই স্রোত আর কখনো

ফুরোবে না। আমি চট করে মুখটা হ্যাঁচকা টানে সরিয়ে আনতেই—যেন ষাঁড়ের বীর্যে আমার মুখচোখ ভরে গেলো।' এমন সময় আমার নিজের অবস্থাই হয়ে উঠেছিলো কাহিল। একটা ভিজে মোমবাতির মতো আমার পুরুষাঙ্গটি লাফিয়ে উঠছিলো বারবার।

সিফিলিসই থাকুক আর যাই-ই থাকুক—আজ রাত্রে আমি এক রাউণ্ড লাগাবোই। আমি মনে মনে ভাবলাম।

আর মোনা বলে চললো তার গল্প। কীভাবে এক হাতে গাড়ি ড্রাইভ করতে করতেই লোকটা তাকে পেড়ে ফেললো এবং ওই অবস্থাতেই চিৎ করে শুইয়ে রেপ করতে লাগলো, তার রুদ্ধশ্বাস বর্ণনা। কারবার চলছে আর গাড়িটা মাতালের মতো আঁকাবাকা হয়ে ছুটছে। কখনো রাস্তার বাঁ পাশে কখনো ডান পাশে ছুটে যাচ্ছে গাড়ি। ওই অবস্থায় সে দু' আঙুলে কীভাবে ওর পুষি হাঁ করিয়ে তার মধ্যে টর্চের ফোকাস ফেললো, ঠোঁটের ফাঁকে যেরকম গুঁজে দেয় সেরকম-ভাবে কী কায়দায় যোনির ফাঁকে সিগারেট গুঁজে দিলো, কী ভাবে পেছনের একজন তার মুখের মধ্যে নিজের নুনু ঠেলে দিতে চেষ্টা করলো; কিন্তু বেহেড মাতাল বলে কিছুই করতে পারলো না—সব ফিরিস্তি দিতে লাগলো মোনা। বললো, গাড়ির অন্য মেয়েগুলো সম্পূর্ণ ন্যাংটো হয়ে পচা পচা গান গাইছিলো। গাড়িটা কতোক্ষণ ছুটবে, কোথায় পৌঁছবে তা কারো জানা নেই। বোঝাই যায়, লোকগুলো যাচ্ছে তাই

ধরনের খারাপ লোক। যা খুশি তাই করতে পারে। মোনা সর্বক্ষণ একটা চিন্তাই করছিলো যে, কীভাবে এই লম্পট-গুলোর হাত থেকে ছাড়া পাওয়া যায়। সে ওদের কাজ কারবার দেখে ভয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিলো। সামনের লোকটা বারবার বলছিলো: রোসো তুমি সুন্দরী কুত্তী, ...আমি তোমার পাছা মারবো। তোমার বয়েস কতো? রোসো মাগি—'বলতে বলতে সে নিজের নুনুটা হাতের মুঠোয় নিয়ে নাচাচ্ছিলো। বলছিলো, 'তুই কি জানিস, আমি তোকে কতোবার লাগাতে পারি? অনুমান করে বল্ না?'—মোনা বলতে পারতো 'দু'বার? তিনবার?' বলতে পারতো, 'আমার তো মনে হচ্ছে, তুমি ভালোভাবে কখনো কাউকে করতে পারোনি?'

লোকটা ক্ষ্যাপা গলায় বলে যাচ্ছিলো, 'বী রকম লাগে তোমার, বোনটি? আমি ঢুকিয়ে দেবার পর আমারটা আরো দু'এক ইঞ্চি বেশী লম্বা করে ফেলতে পারি, জানো? তোমার একেবারে—যাকে বলে—সেই আগা পর্যন্ত গিয়ে ঠেকবে জিনিষটা। তোমার কেমন লাগে তখন, বলোতো? তবে কথা হলো, তোমাকে আমি একবার যুৎ মতো লাগাতে পারলে তোমার এক মাসের জন্যে আর চিন্তা নেই!'—এই হলো তার কথার নমুনা।

: যীশুর দোহাই!—এই জায়গায় থেমো না!'—আমি, চেঁচিয়ে উঠলাম।

: তারপর কি হলো ? তারপর ?'

: কী আর হবে। লোকটা গাড়ি থামালো একটা মাঠের ধারে। মেয়েগুলো ত্রস্ত হাতে কাপড় পরছিলো। কিন্তু মেয়ে গুলোকে একটা সুতো পর্যন্ত পড়তে দিলো না ওরা। তারা কাঁপতে লাগলো ঠক ঠক করে। একটা মেয়ের গালে ছিলো ব্যাথা। সে মাঠের ওপর কাটা কলা গাছের মতো পড়ে কোঁকাতে শুরু করলো। আর একজন বোধহয় জোড়হাতে প্রার্থনা জানাতে চেয়েছিলো, কিন্তু ভয়ে তার গলা দিয়ে কোনো আওয়াজই বেরুচ্ছে না। সামনের লোকটা গাড়ির দরজা খুলে দেবার সঙ্গে সঙ্গে আমি লাফ দিয়ে নীচে নেমেই মাঠের ওপর দিয়ে দৌড় দিলাম।' বললো মোনা। 'আমার জুতো খুলে কোথায় পড়ে থাকলো। পা কেটে ছিঁড়ে রক্তারক্তি। আমি পাগলের মতো ছুটছিলাম। আর সে ছুটছিলো আমার পেছনে পেছনে। দেখতে না দেখতেই লোকটা আমাকে পাকড়াও করে ফেললো। আমার কাপড় খুলবার সময়টাও তার হাতে নেই। সে ফাঁস্ করে ছিঁড়ে ফেললো আমার পোষাক। দেখলাম, তার হাত উঠছে ওপরের দিকে। পর মুহূর্তে আমার চোখের সামনে ফুটে উঠলো একরাশ তারা। আমি চিৎ হয়ে আছি। আমার পিঠে ফুটছে সূঁচ। ওপরের আকাশে চকচক করছে রাশি রাশি সূঁচ। সে আমার ওপরে চড়াও হলো একটা মুর্তিমান জন্তুর মতো। মনে হলো, আমার হাড় গোড় ধুলো হয়ে যাবে। সে আমার নাকে, মুখে, চোখে, কানে, কাঁধে, বুকে মারতে

মারতে ক্ষিপ্ত জানোয়ারের মতো ধর্ষণ করতে লাগলো আমাকে। মনে হলো, আমার দেহের কোনো একটি অংশও আর অক্ষত অটুট নেই। যখন সে আমার ওপর থেকে সরে গেলো, মনে হলো, তার শেষ হয়েছে। আমি কাঁদতে শুরু করলাম।'

'চোপ।'—লোকটা গর্জে উঠলো—'নইলে মুখের ওপর লাথি মারবো।'

'আমার মনে হচ্ছিলো, আমি কাচের ওপর শুয়ে আছি। আমি শুয়ে আছি। লোকটাও চিৎ হয়ে শুয়ে বললো, 'হাত লাগাও।' নুনুটা তেমনি বিশাল, শক্ত, দাঁড়ানো। আমি ভাবলাম, দেয়া যাক ঝামেলাটা চুকিয়ে। কিন্তু শয়তানটা হুকুম দিলো 'মুখ লাগাও। তাড়াতাড়ি।' সে খুব হাঁফাচ্ছিলো শুয়ে শুয়ে। মুখটা হাঁ হয়ে আছে তার। সে আমাকে টেনে নিজের ওপর নিয়ে ফেললো। তারপর আমাকে ধরে ওঠানামা করতে লাগলো পালকের মতোই। আমাকে নিয়ে লোফালুফি করতে লাগলো—যেন আমি এক টুকরো রাবার।'

: এটাই ভালো, তাই না। এখন তুই লাগা কুত্তী।' লোকটা বললো। আর আমি ওর বাহুর বাঁধনে আটকা পড়ে প্রানপন শক্তিতে আরম্ভ করলাম বিপরীত বিহার। তোমার গা ছুঁয়ে বলছি ভ্যাল। যৌন—প্রবৃত্তি আমার মধ্যে তখন এক ফোঁটাও ছিলোনা। কেবল এটাই অনুভব করতে পারছিলাম যে, একটা লাল তোলোয়ার আমাকে বারবার এফোঁড় ওফোঁড় করছে।'

: এদিকের ঝামেলা খতম!'—লোকটা বললো—'এবার এই-দিকে!' বলতে বলতে সে আমাকে দু'হাত দিয়ে উঁচু করে তুলে সজোরে বসিয়ে দিলো তার শিশ্নের আগায়। একটা শূলের মতো নুনুটা ঢুকে গেলো সোজা আমার পোঁদের ভিতরে। তারপর ওর অণ্ডকোষ জোড়া জোর করে আমার হাতের মধ্যে গুঁজে দিয়ে হুকুম দিলো, 'টিপে দে মাগি! যদি একটু ব্যাথা পাই, তবে এই মাঠের মধ্যে পুঁতে ফেলবো কিন্তু।' অল্পক্ষনের মধ্যেই, একটা ঘটনার মতোই পশুটার বীর্যপাত হলো। যেন জল প্রপাতের নীচে শুয়ে আছি আমি। আমার মুখ চোখ, পাছা থেকে শুরু করে সারাটা শরীর ভরে গেলো সাদা, আঠালো, গরম বীর্যে। "তোর গুষ্টি মারি—"এই অস্ফুট, পাশবিক গোঙানিটুকু আমার কানে আসার সঙ্গে সঙ্গে সে একটা পাহাড়ের মতো ধসে পড়লো আমার ওপর। তারপর আমার আর কিছু মনে নেই। অনেক ক্ষন পর চেতনা ফিরে এলে দেখি, শীতার্ত, উলঙ্গ, রক্তাক্ত দেহ নিয়ে আমি মাঠের ওপর পড়ে আছি। মাঠের এই জায়গাটুক ভিজে এবং আশে পাশে জন— প্রণীর নাম নিশানাও নেই। আমি একা!'

ঠিক এইখানে এসেই গল্পটা মোড় নিলো অন্য দিকে। তারপর অন্য দিকে। এবং তারপর আর একদিকে। এ সময়ে গল্পের উৎস, তার অসুখ অর্জনের আদি পর্বের ব্যাপারে আমি উদাসীন ছিলাম। ব্যাপারটা সে খেয়াল করেনি। কেননা খারাপ হেমোরয়েড্‌সের শুরু কীভাবে হলো, তা তার অজান্তেই ব্যক্ত

হয়েছিলো। ভিজে মাঠে শুয়ে থেকেই এ ব্যারামটা যে সে পেয়ে গেছে, তাই তার বদ্ধমূল ধারনা। অন্ততঃ ডাক্তারদের অভিমত এটাই। তারপর অন্য অসুখটি আসে। অবশ্য যথা সময়ে ডাক্তারের কাছে সে গিয়েছিলো এবং সুচিকিৎসায় আরোগ্য লাভও করেছিলো।

তারপর উঠলো দাদের প্রসঙ্গ। ওর দাদের খবর আমার অজানা থাকার কথা নয়। কিন্তু উৎসটি জানা ছিলো না। ফলে আর একটি নতুন গল্পের শুরু। তবে প্রথম গল্পের সমাপ্তির ব্যাপারে আমার খুব একটা মনোযোগ ছিলোনা। শূন্যমাঠ থেকে বিধ্বস্ত অবস্থায় কী ভাবে কার হাতে পায়ে ধরে বিনে পয়সায় নিউইয়র্ক পৌঁছুলো, ফ্লোরির কাছ থেকে পোষাক চেয়ে নিয়ে কখন তা পরলো এসব তথ্য ছাড়া ছাড়া ভাবে কানে এসেছে আমার। ঘটনাটি কতোদিন আগে ঘটে—এ কথা জিজ্ঞেস করলে মোনা যে সময়ের কথা বলে, আমার তা বিশ্বাস হয়নি। কিন্তু হঠাৎ দুয়ে দুয়ে যোগ করতেই ফলাফল চার পেয়ে গেলাম। লক্ষ্য করলাম, সে ক্যারুদার্স সম্পর্কে কথা বলছে। ওর ওখানে থেকে কী কী কাজ করেছে, রান্না বাড়া করে দিয়েছে, এইসব। কিন্তু কীভাবে এই যোগাযোগ ঘটেছিলো ?

: একথা তো তোমাকে আমি বলেছিই।'—মোনা বললো, 'কোনোদিন আর বাড়ি ফিরে যাবো না বলেই ওর ওখানে গিয়ে উঠেছিলাম। লোকটা খুবই দয়ালু। সে নিজের মেয়ের

মতোই দেখতো আমাকে। আমি যাই ওর চেনা ডাক্তারের কাছেই। সে-ই আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যায়।'

: তখন তোমার বয়েস কতো?

: সতেরো। তখন যুদ্ধ চলছে। আমি বাড়ি থেকে বেড়িয়ে পড়েছি। নিউ জার্সিতে গিয়ে একটা চাকরি নিই। সেখানে ক'মাস কাজ করবার পর ক্যারুদার্স আমাকে চাকরি থেকে ছাড়িয়ে কলেজে ভর্তি করে দেয়।'

: তাহলে তোমার পড়াশুনোর পাট চুকিয়েই ফেলেছো!' আমি সন্দেহাচ্ছন্ন মন নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

অবশ্যই চুকিয়েছি।' সে রেগে গিয়ে বললো—'আশা করি বারবার তুমি—'

: ক্যারুদার্সের সঙ্গে তাহলে চাকরি করতে গিয়েই তোমার পরিচয়?'

: না, তা ঠিক নয়। সে পাশের এক ফ্যাক্টরিতে চাকরি করতো। মাঝে মধ্যে নিউইয়র্কে নিয়ে যেতো আমাকে। সে ছিলো খুব সম্ভব ভাইস প্রেসিডেন্ট। যাই হোক, সে যা খুশি তাই করতে পারতো। সে আমাকে নিয়ে যেতো নাইট ক্লাবে আর থিয়েটারে। সে নাচতে পছন্দ করতো!'

: তখন তাহলে তুমি ওর ওখানে বসবাস করছো না?

: না, ওখানে যাই আরো পরে। ধর্ষিত হবার পরও ওর ওখানে উঠিনি। আমি ওর ঘর বাড়ি দেখতাম, রান্না করে দিতাম, এই আর কি। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্যেই আমি এটা

করেছি। সে কখনো আমাকে তার রক্ষিতা হতে বলেনি। বিয়ে করতে চেয়েছিলো···কিন্তু পঙ্গু বউটাকে পরিত্যাগ করার মতো হৃদয় ওর নয়।'

: বউটা কি যৌনতার দিক থেকে অথর্ব ?

: আমি ওর সম্পর্কে সব কথাই তোমাকে বলেছি। পঙ্গু মানে তো সর্বতো ভাবেই পঙ্গু।

: তাই কি ?

: অবশ্যই তাই। তুমি সব কথাই জিজ্ঞেস করো। আবার কোনো কথাই বিশ্বাস করোনা। এটা কী রকম ?

হঠাৎ আমার একটা কথা মনে পড়ে গেলো। ইতালীয় লম্পটের—ধর্ষনের গল্পটা তো বানোয়াট নয় ? ব্যারামটা সে নর্থ উডে বেড়াতে গিয়েই বয়ে আনেনি তো ? হেমোরয়েড় কিংবা গনোরিয়া ?

: চলো, কালকেই দুজনে মিলে ডাক্তারের কাছে যাওয়া যাক। রক্ত পরীক্ষা করা দরকার হয়ে পড়েছে।' আমি বললাম।

: চলো। কালকেই চলো!'—সে জবাব দিলো। তারপর দু'জন দু'জনকে জড়িয়ে ধরে আমরা সঙ্গমে লিপ্ত হয়ে পড়লাম। সঙ্গমের মধ্যেই আমার মনে উদয় ঘটলো কয়েকটি প্রশ্নের। সে ক'দিন আগেই গেছে ডাক্তারের কাছে। রক্তে কোনো গণ্ড-গোল থাকলে নিশ্চয়ই তা ধরা পড়তো ? তাহলে ? তাহলে কি রোগটা আমিই বহন করে চলেছি শরীরের মধ্যে ? এবং

তা পাচারও করেছি ওর দেহেও। আশঙ্কাটা অবশ্য আমি উড়িয়ে দিতে চাইলাম। একজন ডাক্তার পরীক্ষা করে হয়তো বা বের করতে পারে; কার রোগ কার শরীরে গিয়েছে? এখন প্রশ্ন এই, ও যদি আমাকে এই রোগ দিয়ে না থাকে, তবে দিলোটা কে?

সঙ্গম শেষ হবার আগেই মোনা বললো, পনেরো বছর বয়েসেই তার মধ্যচ্ছদা ভাঙ্গে। দোষ তার নয়, তার মায়ের। মহিলা ওই বয়েসেই ওর কানের কাছে খালি আওড়াতো, টাকা টাকা টাকা। ফলে এক সিনেমা হলে মোনাকে ক্যাশিয়ারের চাকরি নিতে হয়। হলের মালিক ছিলো মস্ত ধনী। দেশ জুড়ে তার অনেক গুলো সিনেমা হল। রোলস রয়েসে চড়ে ঘুরে বেড়ায়। হাতে ঝকমক করে হীরের আংটি। পকেট ভর্তি টাকা। বয়েস চল্লিশের ওপর। বেশ কামুক ধরনের মানুষ। মালিক তার কিশোরী ক্যাশিয়ারকেও উপহার দিতো মাঝে মধ্যে। কিন্তু টাকা কখনো নয়। কিন্তু মোনার মা এসব উপহারে খুশি নয়। তার ইচ্ছে মেয়ে নগদ টাকা ঘরে আনুক। সুযোগ যখন এসেছে।

মালিক একবার শিকাগোয় একটা নতুন সিনেমা হলের উদ্বোধনে নিয়ে গেলো তাকে। চমৎকার ব্যবহার তার। দামী পোষাক কিনে দিলো। টাকা দিলো। বেড়াতে নিয়ে গেলো নানান জায়গায়। একদিন রাত্রে ডিনারের পর লোকটা তাকে নিয়ে গেলো থিয়েটারে। থিয়েটারে যাবার আগে সে মোনাকে

জিজ্ঞেস করলো—সে এখনো কুমারী কিনা। মোনা বললো হ্যাঁ। সে ভেবেছিলো, এটাই হবে তার রক্ষা কবচ। কিন্তু অবাক হয়ে সে লক্ষ্য করলো, লোকটার দু'টি চোখ খুশিতে চকচক করছে। কিছুক্ষনের মধ্যেই লোকটা অকপটে তার মনের কথা খুলে বললো। জানালো, কুমারী মেয়েদের কুমারীত্ব হরণ করাই তার একমাত্র নেশা। সে বহু মেয়ের কুমারীত্বের অবসান ঘটিয়েছে। এবং বিনিময়ে তাদের হাতে তুলে দিয়েছে প্রচুর টাকা। সরাসরি প্রস্তাব দিয়ে সে মোনাকে আশ্বস্ত করলো যে এতে তার কোনো ক্ষতি হবে না। এজন্যে তাকে দেবে নগদ এক হাজার ডলার। এমনকি সে আগেই মোনাকে টাকাটা দিয়ে রাখতে চাইলো। তাড়া লাগাচ্ছিলো মোনাই বরং। কিন্তু লোকটি বেশ ধীরগামী। মোনার মধ্যচ্ছদা ছিঁড়তে লোকটার সাতদিন সময় লাগলো। যৌনতায় লোকটা ছিলো নম্র, সহিষ্ণু। বাজে কথা মোটেই বলতো না। যেমন অন্য পাজিরা বলে থাকে। বরং যৌনাচারের খুটিনাটি নিয়ম সে শিক্ষকের মতোই শেখাতো তাকে। একদিন মোনা খুবই উত্তেজিত হয়ে উঠলো যখন সে তার পুরুষাঙ্গ দিয়ে ওর ঠোঁটের চারদিকে ঘষতে শুরু করলো। সে এক সাংঘাতিক রকম উপভোগ্য ব্যাপার।

: তুমি সত্যি উপভোগ করলে?' আমি জিজ্ঞেস করি।

: উপভোগ মানে? আমি পাগল হয়ে গেলাম। শক্ত করে ওকে জাপ্টে ধরে আমার ওপরে এনে বললাম, 'কর্ কর্!

আমাকে কর্।' সেই সঙ্গে চুমো খেতে লাগলাম ওর মুখে অনবরত। সে-ও নিজের ওপর সমস্ত নিয়ন্ত্রন হারিয়ে আমাকে ধর্ষণ করতে শুরু করলো। রেতঃপাত হলো আমার তিনবার। কিন্তু তবু যেন পিপাসা মেটে না। আমার কী ক্ষতি হতে পারে, সে কথা আমি একবারও ভাবলাম না।'

মোনা অকপটেই সব কথা আমাকে খুলে বলতে থাকলো। আমি অবাক হয়ে ভাবলাম, একটি মেয়ে যদি কোনো পুরুষকে মনে প্রাণে বিশ্বাস করে, তার কাছে কোনো কিছুই গোপন রাখেনা।

ঃ আমি কিছুদিন তার রক্ষিতা ছিলাম।' মোনা বললো, 'তার কাছে আমি অনেক কিছু শিখেছি। আমাকে নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে সে সারাটা দেশ। সে আমাকে খুবই ভালোবেসেছিলো। একদিন বলেই ফেললো, "অন্য কোনো কুমারী মেয়ের মধ্যচ্ছদা ছেঁড়ার ইচ্ছে আর আমার নেই। আমি তোমাকে ছাড়বো না।" কিন্তু সত্যি বলতে কি, আমার মতিচ্ছন্ন হয়েছিলো। আমি ওকে দুঃখ দেবার জন্যেই যার তার সঙ্গে মেলামেশা করতে শুরু করলাম। এমনকি তাদের কারো কারো সঙ্গে বিছানায়ও যেতাম। এতে সে খুবই ব্যথিত হতো। বলতো, "তুমি এক রত্তি মেয়ে। বুঝতে পারছো না—কী ক্ষতি করছো নিজের।" কিন্তু আমি তাকে যা তা বলে গালাগালি করতাম। বলতাম, 'অন্য কোনো ছুকরির কাছে যাও। এক হাজার ডলারের কমেই পেয়ে যাবে। আমার টাকা থাকলে প্রত্যেক

রাত্রে তোমার জন্যে একটা করে ছুড়ি নিয়ে আসতাম।' একদিন রাত্রে সে বিয়ের প্রস্তাব দিলো। বললো, আমি হ্যাঁ বলার সঙ্গে সঙ্গে সে তার বউকে তালাক দেবে। আমাকে ছাড়া সে বাঁচবে না।'

: কিন্তু আমি তোমাকে ছাড়া বাঁচতে পারবো।' আমি বললাম। সে বললো, 'তুমি নিষ্ঠুর।' কিন্তু সে যতোই আন্তরিক হোক না কেন, তাকে বিয়ে করার ইচ্ছে আমার একদম ছিলোনা। আমি তার টাকার পরোয়া করতাম না। অবশ্য কেন ওকে এরকম ঘেন্না করতাম, তাও বুঝতে পারতাম না আমি। একদিন ওকে ত্যাগ করে চলে এলাম। কিন্তু ক'দিনের মধ্যেই নিজের আচরণের জন্যে লজ্জিত হয়ে ওর কাছে গেলাম আবার। কিন্তু সে তখন অন্য একটা মেয়ে নিয়ে থাকে। আমার সঙ্গে এমনভাবে কথা বলতে লাগলো, যেন বাবা তার মেয়ের সঙ্গে কথা বলছে। আমি তিক্ততার বোঝা ভারি করে ফিরে এলাম। কখনো আর ওর কাছে যাইনি।'

পরদিন ভোর বেলা মোনাকে মনে করিয়ে দিলাম, আজ আমাদের ডাক্তারের কাছে যাবার কথা। আমি ফোন করে জানাবো, কখন যেতে হবে। এ ব্যাপারে ক্রনস্কির সঙ্গে কিছু পরামর্শও আছে। সে জানালো, যা ভালো বোঝো—করো।

ক্রনস্কির চেনা ডাক্তারের কাছে আমরা যথা সময়ে গেলাম। রক্ত-পরীক্ষার পর আমরা এক সঙ্গে ডিনার খেলাম। ডাক্তার পরিস্কার করে কিছু জানালো না। দ্বিতীয় বার ডাক্তারের

কাছে যাবার আগে আমি গিয়ে দেখা করলাম মঙ্গের সঙ্গে। সব কথা খুলে বললাম তাকে। সে একবাক্যে বললো: যে মোনাই এ রোগের জন্যে দায়ী। সে আগেই এরকম অনুমান করেছিলো। আমার অসুস্থ পুরুষাঙ্গ নিয়ে মঙ্গের এই উৎসাহ সত্যিই খুব হাস্যকর। যেন জিনিসটা এখনো তার ব্যক্তিগত সম্পত্তি। আমি ওটা বের করে ওকে দেখালাম। ও জিনিষটা হাতে নিয়ে দেখতে লাগলো খুটিয়ে খুটিয়ে। মনে হলো, তার সতর্কতা দ্রুত কমছে। কিন্তু আমার তো সাবধান হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু সে আমার শিস্নটাকে ফ্লাইয়ের ভেতরে নিতে দিলো না। বললো, 'চলো বাথরুমে গিয়ে মলম লাগিয়ে দিই!' তার দৃঢ় বিশ্বাস, যে সামান্য অসুখ হয়েছে, তা এতেই সেরে যাবে।

ডাক্তারের কাছে দ্বিতীয় বার গেলে আমি জানতে পারলাম, অসুখের কোনো স্পষ্ট প্রমান পাওয়া যায়নি। তবে এ ব্যাপারে নিশ্চিত কিছু এখুনি বলা যাচ্ছে না। চূড়ান্ত প্রমাণ পাবার জন্যে অপেক্ষার প্রয়োজন আছে।

: তবে কি জানেন?'—ডাক্তার যেন আমি তার কাছে যাবার আগেই ভেবে চিন্তে বসে আছে—'ভাবছি, শিস্নের ওপরকার চামড়াটাই যতো ঝামেলা করছে?'

: ঝামেলা?

: হ্যাঁ। ওই চামড়াটা অনাবশ্যকভাবে দীর্ঘ আপনার। ওটা কেটে ফেললেই—মানে একটা অপারেশন—অর্থাৎ আপনাকে

খত না করালেই ঘা'টা বেরিয়ে আসবে এবং আপনি সেরে উঠবেন। অবশ্য এ জন্যে আপনাকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হবে। সপ্তাহ খানেক লাগবেই তো ঘা শুকোতে।'

: তা, কতো খরচ খরচা হবে ?

: ঠিক বলতে পারছি না। তা, ধরুন, মনে হয়, একশো ডলার। আমি বললাম : এ ব্যাপারে আমি ভেবে দেখবো। তবে আমার নুনুর চামড়া কাটতে আমি মোটেই রাজি নই। যতোই তা স্বাস্থ্য সম্মত হোক না কেন ? অবশ্য একথা ভাবলাম আমি মনে মনেই।

মোনা বেশ ক'সপ্তাহ যাবৎ ডান্স-হলে যায় না। আজকাল বিকেলে আমরা বাসাতেই থাকি। কী করবে—সে সম্পর্কে আপাততঃ কোনো স্পষ্ট ধারণা নেই আমার। অবশ্য টাকার চিন্তা না করে তার উপায়ও নেই। কিন্তু একটা ব্যাপারে সে দৃঢ়সংকল্প, ডান্স-হলের চাকরিতে আর নয়। তাছাড়া আরো একটা স্বস্তিকর ব্যাপার এই যে তার রক্ত পরীক্ষায় কোনো দোষ ধরা পড়েনি।

আমি যদি মঞ্চে নামি, কী রকম হয় ?—জিজ্ঞেস করলো মোনা একদিন।

ওহ্, দারুন হয় কিন্তু তাহলে !' আমি জবাবে জানাই। জিজ্ঞেস করি, 'অভিনয় করতে পারবে ?'

: পারবো ভ্যাল পারবো। তোমাকে দেখাবো আমি। অপেক্ষা করো।

সেরাত্রে আমরা দেরী করে বাড়ি ফেরলাম। এবং বিছানায় গেলাম ফুরফুরে মন নিয়ে। আমার নুনু রগড়াতে রগড়াতে সে বেশ কিছু কথা বললো আমাকে। 'আমি রাগ করতে পারবো না।' এরকম প্রতিশ্রুতি সে আদায় করে নিয়েছিলো আগেই। কাজেই চুপচাপ শুনতে হলো তা আমাকে। ডান্স হলে সে বুড়ো গ্রাহকদের পাশে বসে সঙ্গ দিতো। আর কিছু নয়। বিছানায় যাবার তো প্রশ্নই ওঠে না। নাচবারও কোনো দরকার ছিলো না। বুড়োরা নিজেদেরকে কোনো যুবতীর পাশে দেখতে চায়—এই আর কি। তাতে নিজেদের অধিকতর অল্প বয়েসী মনে হয়। মনে হয়, আরো উৎফুল্ল, আরো আশাবাদী। ওরা সবাই নকল দাঁত লাগানো সফল, বুড়ো বেজন্মা। তা, টাকা পয়সা ভালোই দিতো এজন্যে।

কী? শুনে রাগ হচ্ছে তোমার?' জিজ্ঞেস করলো মোনা।

না।' আমি সংক্ষিপ্ত জবাব দিলাম। একটা নিরবতা।

নিশ্চয়ই তোমার খারাপ লাগছে, ভ্যাল।···তাই না? তোমার খারাপ লাগছে জানলে এসব কথা কি কখনো আমি বলতাম?

আমি বিরক্ত হইনি। তবে কিনা, পদ্ধতিটা আমার কাছে পছন্দ হচ্ছে না।

কিন্তু ওই পদ্ধতি ছিলো খুবই ক্ষনস্থায়ী।

ঠিক আছে। ওসব কথা থাক। ভুলে যাওয়াই ভালো। সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি, আমার পুরুষাঙ্গে অসুখের কোনো চিহ্ন নেই। আজ ডাক্তারের কাছে যাবার কথা ছিলো। কিন্তু

এখন আর তার দরকার কি? টেলিফোন করে জানিয়ে দিলাম ডাক্তারকে যে, আমি যাচ্ছিনা। ডাক্তারকে টেলিফোন করার আগেই অবশ্য ব্যাপারটা মোনাই প্রথম প্রত্যক্ষ করেছে এবং আনন্দে আত্মহারা হয়ে আমার নুনুকে চুমো খেয়েছে। পরে ফোনে মঙ্গেকে এই খবরটা জানতেই সে বললো, 'আমি একথা বিশ্বাস করিনা।'

: ঠিক আছে আগামী সপ্তাহে আমি যখন আসবো, তখন নিজের চোখেই দেখো।

রোববারে একটু আসতে পারবে না! এসো না লক্ষ্মীটি। শোনো, চলো না কোথাও পিকনিক করে আসা যাক। আমরা তিনজন। আমি, তুমি আর বাচ্চাটা। ব্যাস। কেমন?

ঠিক আছে। আসবো আমি। তা ধরো আটটা নাগাদ। রোববার সকালে।

কথা ঠিক থাকবে তো?

অবশ্যই ঠিক থাকবে। আমি রোববারে তোমাকে ওটা দেখাবো।

মঙ্গে কামান্ধ কণ্ঠে হেসে উঠলো। আমি রিসিভার নামিয়ে রাখলাম।

১০

মিনিওয়ালার কাছাকাছি একটা মাঠ। আমি আর মঙ্গে শুয়ে আছি ঘাসের ওপর। বাচ্চাটা ছুটোছুটি করে ফুল তুলছিলো। বড্ড গরম পড়েছে। আমার নুনুটা বাইরে বের করে ওর হাতে তুলে দিয়েছি। সে লাজুকভাবে ওটাকে পরীক্ষা করছে। হঠাৎ জিনিষটাকে হাতছাড়া করে ও চিৎ হয়ে পা দু'টো ছড়িয়ে দিলো। আমি ওর প্যান্ট খুলে ফেললাম। কিন্তু ঢঙ করবার অভ্যাসটি ওর আগের মতোই আছে। অমন প্রকাশ্যে সঙ্গম লিপ্ত হবার ব্যাপারে খুঁৎ খুঁৎ করতে লাগলো। কিন্তু আশে-পাশে জনপ্রানীর চিহ্নও নেই। আমি ওর দু'টি পা আরো খানিকটা ছড়িয়ে যোনির মধ্যে আঙুল ঢোকালাম। ভিজে সপ্ সপ্ করছে ফাঁকটুকু। আমি ওর ওপর চড়াও হবার উপক্রম করতেই ও আঁৎকে উঠলো। বাচ্চাটাকে নিয়েই ওর এই ভয়। আমি চারদিকে ভালো করে তাকিয়ে বললাম, 'ও ওর মতো খেলছে। এদিকে ওর আদপেই খেয়াল নেই।'

: কিন্তু হঠাৎ যদি এখানে চলে আসে···আর দেখে ফ্যালে!'

মনে করবে আমরা ঘুমোচ্ছি। কী হচ্ছে, ও তার কী বুঝবে?'

আমাকে ঠেলে সরিয়ে সে চেঁচিয়ে উঠলো : নিজের সন্তানের সামনে এসব করবে ? কী ভয়ানক কথা !'

: মোটেই ভয়ানাক ব্যাপার নয়। ভয়ানক যদি কিছু থাকে —তা তুমি নিজে। আরে মিয়া—ও হচ্ছে অবোধ শিশু। ও যদি দেখেও ফ্যালে, বড়ো হলে মনে করবে এটা খারাপ কিছু নয়। খারাপ যেটা তা হচ্ছে তোমার মন। বুঝলে ? কিন্তু ভবি ভোলবার নয়। সে অখণ্ড মনোযোগের সঙ্গে আর অতি দ্রুত প্যান্টিটা পরে নিতে লাগলো। আমি ফ্লাই লাগালাম না। আগের মতোই চিৎ হয়ে শুয়ে থাকলাম ঘাসের ওপর। বিরক্তিতে ছেয়ে গেছে মনটা। বললাম : ঠিক আছে। তা এখন তো আমাদের কিছু খেতে হয়। সঙ্গমলিপ্ত হতে না পারলেও, খেতে দোষ নেই।

: হ্যাঁ। যে কোনো সময় তুমি খেতে পারো। তোমার তো ওটাই আছে। আহার আর নিদ্রা।

: নিদ্রা নয়'—আমি শুধরে দিলাম—'আহার আর মৈথুন !'

: ভালোভাবে কথা বলতে শিখলে না এখনো ? তুমি সব পণ্ড করবে। ভেবেছিলাম, একটা সুন্দর দিন কাটাবো। অন্ততঃ একটি বারের জন্যে। কতোবার তুমি আমাদের পিকনিকে নিয়ে যেতে চেয়েও যাওনি। কখনো যাওনি। তুমি নিজের কথা আর বন্ধুদের আর মেয়ে বন্ধুদের কথা ছাড়া আর কিছু ভাবতেই তো পারোনা। আমিই একটা বোকা। ভেবেছিলাম তোমার মধ্যে পরিবর্তন এসেছে। ছি ছি ছি।

বাচ্চাটার কথাও একবার মনে হয়না তোমার। তুমি তার সামনেই—! যাক্, তোমার ভণ্ডামী আর দেখতে হবেনা। সামনের সপ্তাহ থেকেই তো আমি মুক্ত। তোমার খপ্পর থেকে মুক্ত। তুমি আমাকে বিষাক্ত করে ফেলেছো। একটা ঘৃন্য জীবে পরিণত হয়েছি আমি তোমার পাল্লায় পড়েই। তুমি কখনো আমাকে ভালোবাসোনি। কখনো না। নিজের প্রয়োজন মেটাতে আমাকে ব্যবহার করেছো একটা পশুর মতো!' বলতে বলতে সে আমার হাতে তুলে দিলো একটা স্যাণ্ড উইচ। আমি সঙ্গে সঙ্গে তা চালান করে দিলাম আমার মুখের ভেতরে। আমার আঙুলে এখনো লেগে আছে ওর যোনির রস—গন্ধ আসছে নাকে। আমি তাকে দেখিয়ে আঙুল শুঁকতেই সে মুখ বাঁকিয়ে বললো, 'জঘন্য!'

ঃ মোটেই জঘন্য নয়! এই গন্ধটার জন্যেই তো তোমাকে আমার ভালো লাগে!' আমি বললাম।

রাগে সে কাঁদতে শুরু করলো।

ঃ আরে, আরে—কান্নার কী হলো আবার। পাগল নাকি?' আমি বললাম, 'মেয়েদের কাছে যোনির প্রশংসা করার চাইতে বড়ো প্রশংসা আর কী আছে?'

কিন্তু এ'কথায় চিঁড়ে ভিজলো না। সে আরো শব্দ করে কাঁদতে লাগলো। তার কান্না শুনে দূর থেকে ছুটে এলো বাচ্চাটা। 'কী হয়েছে? মা অমন কাঁদছে কেন?'

ঃ না কিছু হয়নি!' মঙ্গে চোখ মুছতে মুছতে বললো।

তারপর ঝুড়ির ভেতর থেকে একটা স্যাণ্ডউইচ বের করে মেয়ের হাতে দিলো।

: হেনরী, তুমি কিছু করছো না কেন? থামাচ্ছো না কেন ওকে?—চোখে একরাশ প্রশ্নের ঝিলিক তুলে বাচ্চাটা আমাকে জিজ্ঞেস করলো।

আমি মঙ্গের হাঁটু চাপড়ে সান্ত্বনা দেবার ভঙ্গী করলাম। কিন্তু সে আমার হাতটা সরিয়ে দিতে দিতে বললোঃ ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না আমাকে।'

: কিন্তু ও তো তোমাকে আদর করছে?' শিশুর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা।

: হ্যাঁ, বাবা আদর করছে।'—আমি বললাম। তারপর ওর হাঁটুর ওপর মৃদু চামড় দিতে লাগলাম।

: ওকে চুমো দাও, চুমো দাও।'—কাঁদতে কাঁদতে আমার দিকে চেয়ে অনুরোধ করলো বাচ্চাটা।

আমি সঙ্গে সঙ্গে ঝুঁকে পড়ে মঙ্গের চিবুকে চুমো দিলাম। আর কী আশ্চর্য! সে দু'হাতে গভীর আবেগে আমাকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করে দীর্ঘ চুম্বনে লিপ্ত হলো। তার জিহ্বা ঢুকে পড়েছে আমার মুখের ভেতরে। কিন্তু আবার সে কাঁদতে শুরু করলো। আমি বিব্রতভাবে সান্ত্বনা দিতে লাগলাম তাকে।

: ঈশ্বর—একি প্রহসন!' সে কাঁদতে কাঁদতে বললো।

: না প্রহসন নয়।' আমি বললাম, 'আমি আন্তরিক ভাবেই বলছি। যা হয়েছে। যা ঘটে গেছে, সেসবের জন্যে আমি

সত্যি দুঃখিত!'

: আর কাঁদবে না কিন্তু।' বাচ্চাটা বললো, 'আমার খিদে পেয়েছে। হেনরী আমাকে ওই গাছটায় চড়িয়ে দেবে। তুমিও যাবে আমাদের সঙ্গে।'

আমি বললামঃ মঙ্গে, পুরনো কথা ভুলে যাও। এই নাও একটা স্যাণ্ড উইচ।' কিন্তু মুখে তুলতে গিয়েও সে বললোঃ আমি খেতে পারছি না।'

আমি ওর কাঁধে হাত রেখে বললামঃ খাও, লক্ষ্মীটি!'

: এখন তো খুব ভালো মানুষ সেজেছো। কিন্তু এর পরেই তো তুমি সর্বনাশ ঘটাবে!

: না, ঘটাবো না।' আমি শপথ করে বলছি।

: ওকে আরেকটা চুমু দাও!' বাচ্চাটার গলা শোনা গেলো আবার। আমি ওকে জড়িয়ে ধরে আলতো ভাবে একটা চুমো দিলাম ওর গালে। মনে হলো, ও ধাতস্থ হয়েছে। একটা আলো ফুটে উঠেছে ওর দুই চোখে।

: তুমি কেন যে সব সময় এরকম হও না?'—আস্তে আস্তে উচ্চারণ করলো মঙ্গে।'

: খামোখা ঝামেলা বাড়িয়ে লাভটা কি? আমরা তো আর স্বামী স্ত্রী নই!' আমি বললাম।

: তাহলে আমার সঙ্গে এরকম ব্যবহারের কারণ কি? অমন পিরিতের গান শোনাও কেন? আমাকে একা থাকতে দাও না কেন?

: পিরিতের গান শোনাচ্ছি কোথায়?' আমি ব্যাখ্যা দিই, 'এটা ভালোবাসা নয়—আবেগের ব্যাপার। আবেগাক্রান্ত হওয়াটা কি অপরাধ? ঈশ্বরের দোহাই, আর অমন কম্মটিও নয়। তুমি একটু আদর চাইছিলে, আমি আদর করলাম। এই তো। তোমাকে আর আমি স্পর্শও করবো না।'

: সে কথা নয়। আমি বলিনি যে আমাকে ছুঁয়ো না। কিন্তু আমাকে তুমি তো অপদস্থও করতে পারোনা। আমি জানি, তুমি আর আমাকে ভালো বাসবে না। কিন্তু ভদ্র ব্যবহারে বাধা কোথায়? তুমি জানো, তোমার শূন্য স্থানে আমি কাল-কেই কাউকে না কাউকে বসাতে পারি? আমি চাইলে বিয়ে করতে পারি আগামী কালই। তিনটে প্রস্তাব এখনো আমার হাতে। শেষেরটা এসেছে…'সে উল্লেখ করলো সেই উকিলের নাম—যে আমাদের বিবাহ-বিচ্ছেদের কাগজপত্র তৈরী করছে।

: বটে?' আমি একটি শব্দই উচ্চারণ করলাম।

: হ্যাঁ, তার কাছ থেকেই। আর তুমি তাকে যা ভেবেছো তা নয় সে। আমি তাকে খুবই পছন্দ করি।

: ও, এইবার বুঝতে পারছি। কেসটার ব্যাপারে ওই লোকটার এতো উৎসাহ কেন, তার কারণ বোঝা যাচ্ছে এবার।' বিকেলের দিকে আমরা শহরে ফিরে এলাম। বাচ্চাটা গাড়িতে আমার কোলেই ঘুমিয়েছে। গাড়ি থেকে নামতে না নামতেই বৃষ্টি নামলো। বৃষ্টি দেখে আমি তো খুবই খুশি। আমি মনে মনে কামনা করলাম, চল্লিশ দিন চল্লিশ রাত এই বৃষ্টি থাকুক।

কল্পনার নেত্রে দেখলাম শহর তার নিজের বিষ্ঠার ওপর ভাসছে। ট্রাকের চাকার নীচে পচছে হিসেবের খাতা। হাসপাতালের বাইরে পানির মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছে রোগীরা। জলচিকিৎসা। '৫৮ ।—তে ফিলিপিনোদের ভেতরে যার চল ছিলো। কিন্তু আমাদের অ্যাণ্ডইনালদো কোথায়? সেই ইঁদুর, যে দু'ঠোঁটের ফাঁকে শুষে নেবে এই পানি?

আমি একটা ক্যাবে চাপিয়ে ওদের বাড়িতে নিয়ে গেলাম। ওদের নিয়ে নিরাপদে ঘরে ঢুকলাম প্রচণ্ড বজ্রপাত এড়িয়ে। সামান্য আগে কোণের ওই ক্যাথলিক চার্চের ওপর বাজ পড়েছে। ঘণ্টাটা ভেঙ্গে টুকরো টুকরো। গির্জার ভেতরে এক প্লাস্টার-কুমারী চুরমার। পাদ্রী এতো অবাক হয়েছে যে প্যাণ্টের বোতাম লাগাবারও সময় পায়নি। তার অণ্ডকোষ দু'টো ঝুলছে পাথরের মতো। মঙে ওপর তলায় ঘুম পাড়িয়ে রেখে এলো মেয়েকে। মেলাইন আমাদের দিকে তাকাচ্ছে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে। প্রচণ্ড আওয়াজে বাজ পড়ছে। চমকাচ্ছে বিদ্যুত। মেলাইন খুব ভয় পাচ্ছে তাতে।

আমি একটা বড়ো আয়নার সামনে দাড়িয়ে আমার লম্ফমান শিস্নটিকে আনন্দের সঙ্গে লক্ষ্য করছিলাম। হঠাৎ পাশে দাঁড়ালো মঙে। বললাম, 'কাপড় খোলো।' ও বললো, 'তোমার খিদে পেয়েছে বুঝি?' আমি ওকে দু'হাতে শক্ত করে ধরে আমার দিকে টেনে আনলাম। সে একটা পা উচুঁ করে আমার খানিকটা সুবিধে করে দিলো। আয়নায়

সব দেখা যাচ্ছিলো। ও যাতে ভালোভাবে দ্যাখে, সে জন্যে ওকে আমার কোলের ওপর কায়দা করে বসালাম। এই দৃশ্য দেখে ও যেন ক্ষেপে গেলো। আমাকে পা দিয়ে আঁকড়ে ধরে বললো, 'করো করো!' সে যেন ভিক্ষে চাইছে, 'আমাকে লাগাও, আমাকে লাগাও!' বললে বলতে আর আমার জন্যে অপেক্ষা না করে নিজেই আমার নুনু নিয়ে ওর যোনির মধ্যে পুতে দিলো। আয়নায় দেখা যাচ্ছিলো সমস্ত কিছুই। এক পর্যায়ে সে কামার্ত ধ্বনিতে মুখর হয়ে শুয়ে পড়লো মেঝেতে। বললো, 'ভালো করে লাগাও, পুরোটা ঢুকিয়ে দাও। আমার কোনো ক্ষতি হবে না। যা ইচ্ছে করো। তোমার যা খুশি তাই করো।' ওর কথা রাখতে গিয়ে আমি যে পর্যায়ে পৌছলাম, তাতে মনে হলো, পেশীর গুচ্ছের নীচে আমাকে কবর দেওয়া হয়েছে। আমি ওর স্তন চটকাতে লাগলাম। দুধের বোঁটা নখের মতোই ধারালো।সে শীৎকার করে উঠলো। বললো, 'বের কোরোনা, আমি মরে যাবো, মরে যাবো।' বলতে বলতে একটা আর্তনাদ। এবং সঙ্গে সঙ্গে সে রেতঃস্রোতে ধুলিস্মাৎ। সে পড়েই আছে। তার পা দুটো আমাকে আঁকড়ে ধরে আছে সাঁড়াশির মতো। তার যোনির মুখে ছোট্ট একটি পতাকা উড়ছে পত পত করে।

ধোয়া মোছার পর সে আমার নুনুতে পাউডার দিয়ে দিলো। পাউডার লাগালো নিজের রোমশ যোনিতে। তারপর আমরা ঘর গরম করার জন্যে গ্যাস জ্বালিয়ে মদের পেয়ালা নিয়ে

মুখোমুখি বসলাম। অদ্ভুত একটা অনুভূতি হচ্ছিলো আমার। যেন নতুন করে পরিচয় হচ্ছে আমাদের। সে প্রায়ই আমাকে চুমো খাচ্ছিলো। আমিও যখন তখন আঙ্গুল চালাচ্ছিলাম ওর পুষির মধ্যে। আমি ঘনিষ্টভাবে এগিয়ে গেলে ও আমার হাত ধরে খপ্ করে মুখে পুরে ফেললো আমার পুরুষাঙ্গ। তারপর মুখ দিয়ে কামড়াতে লাগলো দাঁত বাঁচিয়ে।

ঃ তুমি কি এখুনি চলে যাবে?' সে জিজ্ঞেস করলো।

ঃ যদি তুমি যেতে বলো।' আমার জবাব।

আমি কী দোষ করলাম, বলোতো?—মঙে বললো। ওকে কীরকম অচেনা মনে হচ্ছে যেন আমার। বিশ্বাস হতে চায় না, ওর সঙ্গে এতো গুলো বছর আমি কাটিয়েছি।

ঃ মনে হয়, দোষ আমাদের দু'জনেরই।' আর একটু মদ গ্লাসে ঢালতে ঢালতে আমি বললাম।

ঃ যা চমৎকার লাগছে আমার, জানো! ইচ্ছে হচ্ছে ওপর থেকে গ্রামোফোনটা নামিয়ে এনে নাচ জুড়ে দিই।' সে বললো।

আমি বললাম, 'যা বলেছো!'

ঃ আরো খানিকটা মদ খাওয়া যাক। কি বলো?'

ঃ মন্দ কি? কিন্তু এ ছাড়া আর কোনো মদ নেই!'

ঃ ওপর থেকে আনা যাবে। ওপরের মেয়েটার কাছ থেকে! ওর কাছে কনিয়াকও আছে। তুমি পছন্দ করো তো?'

ঃ তুমি যদি খুশি হও—যে কোনো কিছুই আমি খাবো।'

সে মদ আনতে রওনা হলো তৎক্ষনাৎ। আমি লাফ দিয়ে তার হাতের কব্জিটা ধরে ওর পাছার ওপর চুমো খেলাম।

: আমাকে যেতে দাও'—সে অনুনয় করলো, 'এক মিনিটের মধ্যে আমি ফিরছি।'

সে ওপর থেকে নামার সময় কার সঙ্গে যেন ফিস ফিস করে কথা বলছিলো। আমার সামনে পা টিপে টিপে এসে বললো, 'গায়ের ওপর কিছু দাও। এলসি আসছে!'

আমি বাথরুমে গিয়ে গায়ে টাওয়েল জড়ালাম। এলসির তো আমাকে দেখে হাসতে হাসতে প্রায় ফিট হবার দশা। মোনাকে জড়িয়ে ধরে আমাকে একদিন শুয়ে থাকতে দেখবার পর থেকে তার সঙ্গে আমার আর দেখা হয়নি। তার চোখে মুখে সুন্দর এক কৌতুহল ঝলমল করছে। তারা আর ক'-বোতল মদ, কিছু কনিয়াক, একটা গ্রামোফোন আর রেকর্ড নামিয়ে নিয়ে এসেছে।

গ্রামোফোনের সঙ্গীতের সংগে সংগে আমরা তিনজন নাচতে শুরু করলাম। মাঝে মাঝে দু'একটা চুমুক। তার পরেই উদ্দাম নাচ। এলসির পোষাক খুবই সামান্য—তাকে অর্ধনগ্নই বলা চলে। কিন্তু তাতে মঙের কিছুই আসে যায় না। সেই-তো ডেকে নিয়ে এসেছে এলসিকে। এদিকে নাচের ঠ্যালায় আমার তোয়ালে খুলে গিয়ে তা মেঝেয় লুটাচ্ছে। কিন্তু কে তা কুড়িয়ে আনে। আমার নুনু পতাকা-দণ্ডের মতো উদ্যত। কিন্তু আমি খুব স্বাভাবিক ভাবে বোতল থেকে গ্লাসে মদ ঢেলে

নিতে লাগলাম। এলসি একবার আমার দিকে তাকিয়েই চোখ কপালে তুলে চট করে মুখ ঘুরিয়ে নিলো অন্যদিকে। মঙে আমার হাতে তুলে দিলো তোয়ালে। অর্থাৎ নুনুর ওপর ছুঁড়ে দিলো।—'তুমি কিছু মনে করছো না তো, এলসি!' বললো মঙে। এলসির স্তন দু'টো সশব্দে নড়াচড়া করলেও তাকে খুব স্বাভাবিক মনে হচ্ছিলো। সে গিয়ে বারবার রেকর্ড বদলে দিতে থাকলো। মাঝে মাঝে চুমুক দিচ্ছিলো মদের গ্লাসে।

ওর সংগে একটু নাচতে পারো তো তুমি!'—মঙে বললো। 'আমি তোমাকে বাগড়া দেবো না। চালিয়ে যাও। এলসি—এর সংগে নাচো!' মঙের দিকে ঘুরে গিয়ে নাচতে নাচতেই এলসি আমার টাওয়েলটা ফেলে দিয়ে নুনুটা চেপে ধরলো। ওর সারা শরীর কামোত্তেজনায় থর থর করে কাঁপছিলো।

আমি কয়েকটা মোমবাতি নিয়ে আসি।' মঙে বললো, 'আলোটা বড্ড চড়া এখানে।' বলতে বলতে সে পাশের ঘরে অদৃশ্য হলো। সংগে সংগে নাচে ক্ষান্ত দিলো এলসি। আমাকে জড়িয়ে ধরে গভীর চুম্বনে আবদ্ধ করলো সে। আমি আমার আঙুল ঢুকিয়ে দিলাম ওর যোনির মধ্যে। তারপর ঘাটাঘাটি করতে লাগলাম সমানে। সে আমার নুনুটা ধরেই আছে। রেকর্ডটা থেমে গেলো। কিন্তু গ্রামোফোনটা বন্ধ করার ব্যাপারে আমাদের কারো মধ্যে কোনো উৎসাহ দেখা গেলো না। মঙের ফিরে আসার শব্দ শুনতে পাচ্ছি। কিন্তু তখনো এলসির বাহু বন্ধনে আটকে আছি আমি।

আমি ভাবলাম, এই রে, এবার সেরেছে। কিন্তু এ ব্যাপারে মঙের কোনো মনোযোগই দেখলাম না। সে মোম বাতি জ্বালিয়ে বিজলী আলোগুলো নিভিয়ে দিলো। আমি এলসির কাছ থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে যাবার উদ্যোগ নিতেই মঙ্গে বললো, 'আরে, ঠিক আছে, ঠিক আছে। আমি কিছু মনে করছি না। আমিও যোগ দিচ্ছি!' বলতে বলতে সে আমাদের সঙ্গে এসে গা জড়াজড়ি করে দাঁড়ালো এবং চুমোচুমি শুরু করলো।

ঃ উহ্, কী গরম!—বললো এলসি।

ঃ কাপড় চোপর খুলে ফেললেই তো পারো!' বললো মঙ্গে। 'নাও, আমিই খুলে দিচ্ছি।' মঙ্গে একটানে খুলে ফেললো এলসির পরণের এক চিলতে পোষাকটুকু। খুলে ফেললো নিজের টাও। মুহূর্তেই দেখা গেলো, আমরা তিনজনই সম্পূর্ণ উলঙ্গ!

আমি মঙ্গেকে কোলে নিয়ে বসলাম। তার যোনি আবার ভিজে উঠেছে। এলসি আমাদের পাশেই দাঁড়ানো। মঙ্গের গলা জড়িয়ে ধরেছে সে দু'হাতে। সে মঙ্গের চেয়ে খানিকটা লম্বা—দেখতেও ওর চেয়ে ভালো। ওর তলপেটটা এখন ঠিক আমার মুখের কাছে। আমি একহাতে ওর তলপেটে মৃদু চাপড় মেরে আঙুল চালিয়ে দিলাম ওর ঘন রোম রাজির মধ্যে। এ দৃশ্য দেখে মঙ্গের মুখে ফুটে উঠলো অনাবিল খুশির ছাপ। আমি এলসির দিকে আরো খানিকটা ঝুঁকে তার

যোনির ওপর চুমো খেলাম।

ঃ হিংসে না করা যে কতো সুন্দর!'—মঙ্গে বললো খুব সহজ গলায়।

এলসির মুখ রাঙা হয়ে উঠেছে। সে জানেনা, তার সীমানা কতোটুকু। কতোদূর সে যেতে পারবে। আমি এ মুহূর্তে চুমো খাচ্ছি মঙ্গেকে। আমার আঙুল নড়ছে এলসির যোনির ভেতরে। এলসি ক্রমেই আমার দিকে ঘনিষ্ট হয়ে আসছে। নড়াচড়া করছে সে খুব। আমার আঙুল ভিজে যাচ্ছে। এদিকে মঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে তার বিস্ফোরিত যোনি ঠেলে দিচ্ছে আমার শিস্নের দিকে। তার মুখটা ঠেকে আছে এলসির স্তনের ওপর। সে ওর স্তনের বোঁটায় মুখ রাখলো। এলসির শরীরটা খুব জোরে নড়ে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে সাদা রসে ভরে গেলো তার যৌনাঙ্গ-মুখ। আমি আমার হাতটা সরিয়ে নিতেই মঙ্গে চট করে নিজের মুখটা রাখলো এলসির যোনির ওপর। একই সঙ্গে এলসি মঙ্গের ওপর ঝুঁকে পড়ে ঠোঁটটা রাখলো আমার নুনুতে। আমরা তিন প্রানী জড়াজড়ি করতে লাগলাম আদিম তাড়নায়।

বোঝা গেলো, মঙ্গের হয়ে আসছে। আমি নিজেকে শক্ত রাখলাম। মধুটুকু সঞ্চিত রাখতে হচ্ছে এলসির জন্যে। এক্ষুনি বাজে খর্চার কোনো মানে হয়না। মঙ্গের রেতঃপাত হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই আমি এলসিকে জড়িয়ে ধরলাম। মঙ্গে যখন বাথরুমে তখনও আমাদের মধ্যে পুরোদমে কামড়া-

কামড়ি চলছে। সে যখন ফিরে এলো, এলসি তখন আমার কোলে। চুমোয় চুমোয় গরম করে ফেলেছে সে আমার মুখ। মঙ্গে ফিরে এলে, এলসি বাথরুমে গেলো। আমিও সিংকে গিয়ে ধোয়া মোছাটা সেরে নিলাম। অবশ্য সবাই তখনো ন্যাংটো!

ঃ এতো আনন্দ আর কখনো আমি পাইনি!' বললো মঙ্গে। তারপর গ্রামোফোনে আর একটা রেকর্ড চাপিয়ে দিলো। বললো, 'তুমি বাড়ি ফিরে কী ভাববে?' আমি কোনো জবাব দিলাম না। একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললো, 'তুমি আমার ওপর রেগে যাবে।'

ঃ রেগে যাবো? কেন?

ঃ তোমাকে এতোক্ষন আটকে রাখলাম—সেজন্যে!'

ঃ নন্‌সেন্স—যতো সব বাজে কথা।'—আমি বললাম।

মোম বাতি গুলো পুড়ে পুড়ে শেষ। সেগুলো নিভে যাবার সঙ্গে সঙ্গে জানালা দিয়ে ঘরের মধ্যে পড়লো খানিকটা চাঁদের আলো। হঠাৎ টেবিলের জিনিষপত্র নীচে নামাতে শুরু করলো মঙ্গে। তার সঙ্গে সম্মোহিতের মতো হাত লাগালো এলসিও। পাশের ঘর থেকে পাৎলা একটা কম্বল এনে বিছিয়ে দেওয়া হলো টেবিলের ওপর। এমনকি একটা বালিশও। আলো জ্বেলে মদ খাওয়া শুরু হলো আবার। তা, মদ আমরা প্রচুর গিলেছি আজ। আমার মাথাটা বারবার হেলে পড়ছে। মনে হচ্ছে মদ আমার শিরা, আমার অণ্ডকোষ পর্যন্ত পৌঁছে

গেছে আজ। তবুও গিলছিলাম আমি। এলসি হঠাৎ এসে আমার অণ্ডকোষের নীচে হাত রেখে মজা পেয়ে বলে উঠলো, 'আরে, কী আশ্চর্য! এর একটা বিচি দেখছি আর একটার চেয়ে বড়ো। হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ!' একটু থেমে সে আবার বললো, 'আমরা এক সঙ্গে কিছু একটা করতে পারিনা?' সে মঙের দিকে তাকিয়ে ছিলো। মঙ্গে সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো, 'কেন পারবো না।' এলসি বললো, 'তাহলে আলো নিভিয়ে দেওয়া যাক! আলোর আর দরকারই নেই, তাই না?' বলতে বলতে সে মঙ্গেকে টেবিলে নিয়ে শুইয়ে দিলো। তারপর আমার হাত ধরে নিয়ে গেলো মঙ্গের কাছে। তারপর মঙ্গের দিকে তাকিয়ে বললো, 'শুরু করবো?' মঙ্গের মুখ থেকে কোনো জবাব পাবার আগেই সে আমার নুনুর কাছে পৌঁছে খপ্ করে নিজের মুখের ভিতর তা ঢুকিয়ে নিলো। কয়েক মিনিট পর মুখ থেকে ওটা প্রায় উগ্‌রে দিয়ে বললো, 'এখন·····এখন মজা দেখা যাক!' সে আমাকে ধাক্কা দিয়ে মঙ্গের ওপর নিয়ে ফেললো। আমি যখন মঙ্গেকে লাগাচ্ছি—এলসি উবু হয়ে সেই দৃশ্য উপভোগ করছে। তার শ্বাস পড়ছে ঘন ঘন। চোখ দুটি যেন ছানাবড়া। হঠাৎ সে ফিসফিস করে বললো, 'ওটা একটু বের করো না। আমি দেখি!' আমি ওর কথা শুনলাম। ও বললো, 'আবার ঢোকাও!' পরক্ষনে সে জানালার শেড তোলার জন্যে ছুটে গেলো। বললো, 'থেমো না, থেমো না। লাগাও। করো!' বলতে

বলতে সে বসে পড়লো আমার পাশে। এবং আমার অণ্ড-কোষের ওপর চুমো খেতে লাগলো। হঠাৎ মঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলো, 'তোমারটা এক্ষুনি ফুরিয়ে ফেলোনা। এলসি বেচারার জন্যেও কিছু রাখো!' বলতে বলতে সে নেতিয়ে পড়লো। তখন একই ভাবে পরস্পরকে জাপ্টে ধরলাম আমি আর এলসি। এলসির মুখটা মঙ্গের যোনির ওপর। আমি পেছন থেকে চড়াও হলাম এলসির ওপর। এখন মঙ্গে খেলা করছে আমার অণ্ডকোষ নিয়ে। জানালায় চাঁদের হলদে আলো। আমার মুখে যোনির স্বাদ। আমি মাঝে মাঝে শিস্নটা এলসির যোনির ভেতর থেকে বের করে মঙ্গের মুখের ভেতরে ঢুকিয়ে দিচ্ছিলাম। তারপর আবার তা ঢুকিয়ে দিচ্ছিলাম এলসির ফুটোয়। এলসি মঙ্গের যোনির মধ্যে আঙুল নাড়তে নাড়তে কুত্তীর মতো মাথা ঝাঁকাচ্ছিলো। এক সময় ক্ষেপে উঠে আমাকে সজোরে চেপে ধরে গোঙাতে শুরু করলো সে। তারপর খামচাতে আরম্ভ করলো আমাকে।

আরে আরে। কী করছো। রক্তারক্তি হয়ে যাচ্ছে যে!' মঙে বলে উঠেছিলো। আমি চিল্লিয়ে উঠলাম, 'চুপ কুত্তী। রক্তারক্তি হচ্ছে? না?' তুই-ই তো এটা চেয়েছিলি। চাসনি?' বলতে বলতে এলসির যোনির মধ্যে যতোদূর সম্ভব পুরোপুরি ঢুকিয়ে দিলাম আমার পুরুষাংগ। কয়েক মুহূর্তের ভেতরেই একটা ভূমিকম্প। বেদনা আর আনন্দের এক দ্বৈতশিহরণ। এলসি অর্ধ মুর্ছিতের মতো ছিটকে পড়লো মেঝের ওপর।

মৃত কল্প। পূর্ণ ধর্ষিতা।

একটু পরে এলসিকে টেবিলের ওপর শুইয়ে, হাতে একটা গ্লাস নিয়ে আমি ওর যোনিটা খুটিয়ে খুটিয়ে দেখতে লাগলাম।

: দারুন যোনি তোমার এলসি!'—বললাম আমি।

মঙ্গেও মুগ্ধ চোখে জিনিষটা লক্ষ্য করছিলো। আমি বললাম, 'চুমো খাও ওখানে!' তারপর এলসির যোনির ওপর মৃদু হাতে চেপে ধরলাম ওর মুখ। এভাবে চললো বেশ কিছুক্ষণ। যে পর্যন্ত এলসির আর একটা রেতঃপাত না ঘটলো—সে পর্যন্ত। তারপর আমি বললাম, 'আমি ঘুমাবো এখন!'

: তুমি আমার সঙ্গে শুতে পারো।'—মঙ্গে বললো।

: হ্যাঁ, পারবে না কেন? নিশ্চয়ই পারবে!' এলসি বললো, 'আমিও তোমাদের সংগে শুতে পারি। পারি না?' মঙের দিকে চেয়েই সে বললো, 'অবশ্য, তোমার কোনো অসুবিধে ঘটাবো না আমি। আসল কথা হচ্ছে, আমি তোমাকে ছেড়ে যেতে চাইনে এখনি।'

: তোমার বাসার লোকজন কী ভাববে?' মঙে জিজ্ঞেস করলো।

: তারা তো হেনরীর খবর জানেনা! ভাববে তোমার সঙেই শুয়ে আছি।'

: আর ম্যালেইন?'—আমি এবার জিজ্ঞেস করি চিন্তিত গলায়।

:ওহ্, সে তো এখন চাকরি পেয়েছে একটা। চলে গেছে সেই ভোর বেলায়।' জবাব দিলো মঙে।

আমি চিন্তা করছি, মোনাকে কি কৈফিয়ত দেবো। বাইরে রাত কাটানোর কৈফিয়ত। আমি এই ভয়েই কাহিল এখন।
: একটা ফোন করবো নাকি?' আমি বললাম।
: না, এখন নয়।' এলসি বললো, 'বড্ড দেরী হয়ে গেছে।'
আমরা জিনিষ পত্র সরিয়ে ঘরটা পরিস্কার করলাম। তার-পর জড়াজড়ি করে শুয়ে···পড়লাম সবাই। আমি ওদের মাঝখানে। সবাই উলঙ। তখনো ঘুমিয়ে পড়িনি। আমার দু'টি আঙুল খেলা করছে ওদের দু'জনের দুই যোনির ভেতর। ওরা আমাকে নিয়ে খেলছে যেন দড়ি-টানাটানি খেলা। কিন্তু আমার শরীরে আর এক বিন্দু প্রবৃত্তিও অবশিষ্ট নেই। দু'জনেই আমাকে খোঁচাচ্ছে। বিশেষ করে এলসি বলছে আবার একটুখানি লাগাতে। ঘর ভর্তি যৌনতার উপকরণ। বাইরে ভিজে মাটির ঘ্রাণ। আমরা নিঘুম তিনটি প্রানী সরীসৃপের মতো বিচরণ করছি বিশাল বিছানায়।
এক সময় এলসি আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বললো, 'ও কি ঘুমিয়েছে? আবার একটু করো আমাকে, লক্ষীটি তোমার পায়ে পড়ি!'
: এখন না!' আমি নীচু গলায় জবাব দিলাম, 'সকালের দিকে দেখা যাবেখন!'
না, এখনি! সে মাথা কুটতে লাগলো আমার পায়ে। আমার চোপ্‌সানো নুনুটা ওর হাতে। সে তাতে আস্তে আস্তে চাপ দিয়ে বললো, 'দোহাই, আর এক বার, আর মাত্র

একটি বার, হেনরী!'

ওকে ঘুমোতে দাও!' নেশার ঘোরে মঙে বললো।

ঠিক আছে।' বললো এলসি। তারপর মঙেকে জড়িয়ে ধরলো। কিছুক্ষণ পর এলসি আমার কানের কাছে মুখ এনে খুবই নামানো গলায় বললো, 'ও ঘুমিয়ে পড়লে হবে— কেমন?' আমি মাথা নেড়ে সম্মতি জানালাম। কখন একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছি, জানিনা। হঠাৎ মনে হলো, কেউ আমার পুরুষাঙ্গ মুখে পুরে অবিরাম চুষছে। আর আমি যাতে কথা না বলি, তাই আমার মুখের ওপর কারো হাত। ততোক্ষনে চাঙা হয়ে উঠেছে আমার লিঙ্গ। যেন এটা একটা নতুন শিস্ন। এখন ওটা আরো দীর্ঘ, আরো পক্ত আরো তরতাজা মনে হচ্ছিলো আমার। আমি এলসিকে আমার বুকের ওপর টেনে তুললাম। ওর যোনিটা মঙের যোনির মতো নয়। লম্বা এবং সরু। অনেকটা দস্তানার আঙুলের মতো। আমি যখন শুরু করলাম, তখন ও একটা মাদী জন্তুর মতো কঁকাতে লাগলো।

ওহ্ কী দারুন!'—ফ্যাসফেসে গলায় এলসি বললো, 'রোজ রাত্রেই তুমি যদি আমাকে লাগাতে! তুমি থাকো কোথায়? তোমাকে একা পাওয়া যাবে কোথায়!···তুমি কি শুনতে পাচ্ছো? তোমাকে কোথায় পাবো আমি। দোহাই, এখনি শেষ কোরোনা!···সারাজীবন চলবে এরকম!'

আমি এরকম তরতাজা পুষি আর কখনো পাইনি। যা বুঝলাম তাতে মনে হয়, বারো বারের বেশী তাকে কেউ লাগায় নি।

যোনির চুলগুলো কী মসৃন—সুভ্রান। আর তার বুক? ঠিক যেন এক জোড়া আপেল। সে আমার অণ্ডকোষ নিয়ে বারবার খেলা করছিলো। আমার মুখ নিয়ে গুঁজে দিচ্ছিলো তার স্তনের বোঁটায়। যেন দুধ খাওয়াচ্ছে। আর তার শক্ত দাঁতের কামড়? ওই—কী যে মিষ্টি।

: তুমি কি সব রাতেই এভাবে করো?—প্রশ্ন করলো এলসি।

: সব রাতেই নয়!'

: হেনরী—করো করো। আমার আসছে আসছে। লাগাও আমাকে লাগাও। ওহ ঈশ্বর এই তো স্বর্গ।...করো করো করো!'

আমি শুরু করে দিলাম।

১১

রোববারে আমরা বাইরে বেড়াতে যাই। কিন্তু মোনার সংগে আমার দেখা হয় মঙলবার ভোরে। মঙের সংগে ছিলাম বলেই কি? না তা নয়। সোমবার সকালেই আমি চলে গিয়েছিলাম অফিসে। সেখান থেকে দুপুর নাগাদ বাসায় টেলিফোন করে শুনি, মোনা ঘুমোচ্ছে। খবরটা জানালো রেবেকা। বললো, 'সারারাতেই মোনা বাইরে ছিলো। রিহার্সালের জন্যেই নাকি! তা তুমিই বা কোথায় কাটালে রাত?' আমি জানালাম, 'বাচ্চাটার অসুখ। তাই রাতটা কাটাতে হয়েছে ওর ওখানেই।'

ঃ মোনার কাছে অন্য কোনো কৈফিয়ত দিলেই বোধহয় ভালো করবে।' রেবেকা হাসলো।—'সারারাত সে টেলিফোন করেছে। তোমার ওপর ভীষন খাপ্পা।'

ঃ সেই জন্যেই বুঝি সে বাড়ি ফেরেনি?'

ঃ তুমি তোমার গল্প কাউকেই বিশ্বাস করতে দাও না, তাই না।' রেবেকা মৃদু হেসে হেসে বললো।—'তুমি কি আজ রাতে বাড়ি ফিরছো? আমরা খুব বেশি অভাব অনুভব করেছি

তোমার·····বুঝলে হেনরী, তোমার বিয়ে করা উচিত হয়নি।'
আমি কথা বার্তা সংক্ষিপ্ত করলাম। বললাম, 'রাত্রে বাড়িতেই ডিনার খাবো, হ্যাঁ। ও ঘুম থেকে উঠলে ওকে কথাটা বোলো। বলবে তো? আর শোনো, বাচ্চাটার কথা ওর কাছে বলতে গিয়ে হেসো না যেন আবার!' সে টেলিফোনেই হাসতে লাগলো।

: শোনো রেবেকা, আমি তোমাকে বিশ্বাস করছি। গ্যাঞ্জাম বাঁধিও না কিন্তু! আমি তোমার পৃথিবীর খবর রাখি। তুমি তো জানোই, আমি যদি আদৌ অন্য কোনো মেয়েকে বিয়ে করি, তবে সে তুমি!'

আরো হাসি। তারপর: ঈশ্বরের দোহাই, হেনরী, থামো এবার। রাত্রে নিশ্চয়ই আসবে। আমি সবটুকু শুনতে চাই। আর্থার আজ রাত্রে বাড়িতে থাকবে না!'

রাত্রে বাসায় ফেরার সংগে সংগে আমার ঘরে চলে এলো রেবেকা। সারা বাড়ি খালি। মোনা টেলিফোনে জানিয়েছে, তার আরো রিহার্সাল আছে। কখন বাড়ি ফিরবে, সে বলতে পারছে না।

: চমৎকার!' আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'ডিনার তৈরী করেছো তো?'

: কি যে বলো। একেবারে পাগল!'—বলতে বলতে আমার কাঁধের ওপর দুহাত রাখলো রেবেকা।—'আর্থারটাও খানিকটা এরকম। ওকে মাঝেমধ্যে ক্ষমা করে দেয়া সহজ!'

: আশে পাশে কি কোনো জনপ্রানী নেই ?' আমি জিজ্ঞেস করি। এরকম একটা নির্জন বাড়িতে খুবই অস্বস্তি হয়।

: না, সবাই চলে গেছে।' ওভেনে রোস্টের অবস্থা দেখতে দেখতে রেবেকা বললো।—'এখন তুমি খুলে বলতে পারো তোমার সেই বিশাল ভালোবাসার কথা—যার আভাস টেলি-ফোনে দিয়েছিলে।' সে আবার হাসলো। মৃদু, অন্তরঙ্গ হাসি—যা আমাকে রোমাঞ্চিত করলো।

: দ্যাখো, যা ভেবেছো তা নয়। তুমি তো জানোই, আমি হয়তো খামোখাই একটা কথা শুরুত্ব দিয়ে বলে ফেললাম। বুঝতে পারছো কি ?'

: পুরোপুরি। এই জন্যেই তো তোমাকে পছন্দ করি আমি। তুমি একই সঙ্গে বিশ্বাস যোগ্য এবং অবিশ্বস্ত। একটা অদ্ভুত সমন্বয়।'

: আমার কাছে তুমি কতো নিরাপদ—তাই না ?' আমি ওর কাঁধে একটা হাত রেখে বললাম।

: আমি যে তা মনে করিনা, তাতো তুমি জানোই।'—রেবেকা হো হো করে হেসে উঠলো।

আমি একটু লজ্জা পেলেও বললামঃ এখন কিছু খেতে দাও! ওহ্ যা দারুণ ঘ্রান ছুটেছে। কী রাঁধলে—মুরগী ?'

: না, শুয়োর!' সে বললো, 'মুরগী বলতে কী বোঝাতে চাও তুমি ? তার মানে, তোমার জন্যেই রেঁধেছি! বেশ, বলে যাও। ভালো ভালো সব কথা বলতে থাকো। কিন্তু খাবার

কথা নয়। অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্যে। কিন্তু খবরদার, আমার কাছাকাছি আসবে না। কাঁটা দিয়ে একেবারে গেঁথে ফেলবো। ···গতরাত্রে কি হয়েছিলো, ঠিক ঠিক বলে ফেলো তো চাঁদ। একটা কথা বানিয়ে বললে·····

: এটা আর এমন কি কঠিন ব্যাপার, লক্ষ্মী রেবেকা আমার! বাড়িতে যখন অন্য কোনো মানুষজন নেই। তাছাড়া এটা একটা লম্বা গল্প। তুমি কি সত্যি তা শুনতে চাও?

সে আবার হাসতে শুরু করলো।

: কী বিচ্ছিরি হাসি তোমার।' আমি বললাম, 'ঠিক আছে, বলছি তাহলে। আমি কোথায় ছিলাম? হ্যাঁ, সত্যি কথা বলবো—শোনো। সত্যি কথাটা হচ্ছে, আমি আমার বউয়ের সংগে ঘুমিয়েছিলাম।

: আমি এরকমটাই মনে করেছিলাম।' বললো রেবেকা।

: রোসো—এই শেষ নয়। পাশে অন্য এক রমনীও ছিলো।

: কখন ছিলো? বউয়ের সংগে শোবার আগে না পরে?

: একই সময়ে।' আমি বললাম।

: না না! এ কথা আমাকে বোলোনা।' সে বাঁকানো ছুরিটা নামিয়ে রেখে কোমরে হাত দিয়ে আমাকে যেন পরীক্ষা করতে লাগলো।'—আমি বুঝতে পারছি না···অবশ্য তোমাকে দিয়ে সব কিছুই সম্ভব। এক মিনিট অপেক্ষা করো। টেবিলটা সাজিয়ে নিই। আমি সমস্ত ঘটনাটা শুনতে চাই। শুরু থেকে শেষ অব্দি।'

: পান টানের কোনো বন্দোবস্ত···

: কিছু লাল ওয়াইন আছে···ওতেই চলবে।

: চমৎকার। কোথায় রেখেছো?

আমি বোতলের ছিপি খুলবার আয়োজন করতেই রেবেকা আমার গায়ের ওপর ঝুঁকে পড়ে বললো, 'সত্যি কথা না বললে আজ ছাড়ছি না তোমাকে।'

: আমি তো সত্যি কথাই বলছি।

: ঠিক আছে; আগে বসে নিই। তুমি কলিফ্লাওয়ার পছন্দ করো তো? অন্য কোনো সব্জী নেই আজ।

সব রকম খাবারই আমার পছন্দ। আমি তোমাকে পছন্দ করি। আমি মোনাকে পছন্দ করি, আমার স্ত্রীকে পছন্দ করি। আমি পছন্দ করি গরু, মুরগী, ট্যাপিওকা, ব্যাচ, বেনজিন, প্রিকলি হীট···

: তুমি সব কিছুই ভালোবাসো। চমৎকার! তুমি আমাকেও ক্ষুধার্ত করে তুললে। তুমি সব কিছুই পছন্দ করো—তা ঠিক—কিন্তু ভালোবাসো না।

: আমি ভালোও বাসি। আমি ভালোবাসি খাদ্য, মদ্য, মেয়েমানুষ্য! তুমি কি করে ভাবতে পারলে, আমি ভালোবাসি না? আমি ভালোবাসি ঈশ্বরের মতো। তা স্থান কাল পাত্র—সব কিছুর উর্ধে। আমি তোমাকেও ভালোবাসি—ওই রকম-ভাবে। এই কি যথেষ্ট নয়?'

খাওয়া চললো। সেই সঙ্গে চললো আলাপ। যে কোনো মূল্যে

কথাবার্তা চালু রাখতে চায় রেবেকা। আমাদের আলাপ শেষ হলো আর্থার বাসায় ফিরলে। আমি আরো কিছুক্ষন অপেক্ষা করলাম, যাতে আর্থারের মনে কোনো কুচিন্তার উদয় না হয়। তারপর ঘরে ফিরলাম। ভোরের দিকে মোনা ফিরলো। চমৎকার লাগছে ওকে। ঝকঝকে ঝলমলে প্রাণবন্ত। ওর গায়ের ত্বক ক্যালসিয়ামের মতো উজ্জ্বল। এতো ভালো ওকে আর কখনো লাগেনি। আমার বাইরে রাত কাটাবার ঘটনা শুনলো যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও। সে নিজেকে নিয়েই যেন বেশী মগ্ন। নিজের কথা বলেই শেষ করতে পারছে না। ওরা নাকি পরের নাটকেই ওকে প্রধান ভূমিকাটি দেবে। একথা বলেছে স্বয়ং পরিচালক। আর কেউ এখনো জানেনা। গত দু'সপ্তাহে সম্মানীর খামে সে প্রেমপত্রও লিখে পাঠিয়েছে বেশ কয়েকখানা। তাছাড়া নায়কের ভূমিকায় যে অভিনয় করে, সে ও প্রেমে পড়েছে মোনার। সাংঘাতিক ভাবেই পড়েছে বলা উচিত। সে-ই তাকে অভিনয়ের তালিম দিচ্ছে সর্বক্ষন। শিখিয়েছে কি ভাবে নিঃশ্বাস ফেলতে হয়, কি ভাবে বিশ্রাম নিতে হবে, কী ভাবে দাঁড়ানো উচিত। শিখিয়েছে কীভাবে সে হাঁটবে এবং ব্যবহার করবে নিজের কণ্ঠস্বর। নিজের ভিতর কী সম্পদ নিয়ে সে চলাফেরা করছে, তা সে নিজেই জানেনা। শিগগীরই তার পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়বে পৃথিবীটাই। নিউ ইয়র্কে সে ঝড় তুলবে। তারপর ছুটে বেড়াবে সারাটা দেশে। দেশের বাইরেও যেতে হতে পারে···ভবিষ্যতে

কি হবে, তা কে বলতে পারে? অবশ্য এই হুল্লোড় তাকে খানিকটা দুশ্চিন্তায়ও ফেলে দিয়েছে। কাজেই কাজেকর্মে আমার সাহায্য তার দরকার। দীর্ঘ আলাপ আলোচনার পর সে হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞেস করলোঃ তালাকের দিন-তারিখ ঠিক হয়েছে কিনা।

ঃ এ সপ্তাহেই!'—আমি আলোচনার আকস্মিক মোড়-ফেরায় বিস্মিত হয়ে জবাব দিলাম।

ঃ তার পরেই আমাদের বিয়ে, কি বলো?

ঃ অবশ্যই।' আমি জবাব দিলাম।

কিন্তু আমার 'অবশ্যই' বলবার ধরণটি খুব সম্ভব তার ভালো লাগলো না। সে বললো, 'অবশ্য তুমি ইচ্ছে করলে আমাকে বিয়ে না-করলেও পারো।'

ঃ কিন্তু আমি বিয়ে করতে চাই।' আমি বললাম। 'আর তার পরেই আমরা এই বাড়ি ছেড়ে চলে যাবো। নিজেদের একান্ত একটা জায়গায়।'

ঃ সত্যি?'—সে খুশি খুশি গলায় বললো, 'আহ্, আমার কতোদিনের সাধ। কতোদিন ধরে প্রতীক্ষা করছি তোমার এই কথাটির! আমি তোমার সংগে একটা নতুন জীবন শুরু করতে চাই। এই সব মানুষের সংগ ছেড়ে, চলো, অন্য কোথাও চলে যাই। আমি তোমাকে এই বিদঘুটে চাকরিতেও আর থাকতে দেবোনা। এমন একটা জায়গা আমি খুঁজে বের করবো, যেখানে নিরিবিলিতে বসে তুমি লিখতে পারবে।

তোমাকে টাকা রোজগার করতে হবেনা। আমি শিগগীরই অনেক টাকা রোজগার করবো। তোমার যা দরকার, তাই কিনতে পারবে। তুমি যে বই পড়তে চাইবে, তাই কিনে দেবো তোমাকে। হয়তো তুমি একটা নাটকই লিখে ফেললে। আর আমি তাতে অভিনয় করলাম! কী চমৎকার হবে, তাই না?'

কোর্টে হাজির হলাম উৎফুল্ল মনে। ঘটনার সূত্রো এখন আমার হাতে। আমি কেবল হাত তুলবো, একটা বাজে শপথ বাক্য উচ্চারণ করবো, নিজের দোষ স্বীকার করবো এবং তার শাস্তি পাবো। বিচারকটাকে দেখে মনে হচ্ছিলো, পাগুলে-চশমা পরা একটা কাকতাড়ুয়া। স্তব্ধ কক্ষে তার কালো পোষাক কেমন অপ্রাকৃত মনে হয়! ও যতোই গম্ভীর ভাবভঙ্গী করুক—আমার কাছে ওর কোনো গুরুত্বই নেই। পেতলের রেলিং, আর জজের মধ্যে আমি কোনো তফাতই তো খুঁজে পাচ্ছিনা। পেতলের রেলিং, বাইবেল, আমেরিকার পতাকা, ব্লটার, উর্দি পরা উকিল, আইনের কাঠামো, চশমার কাচ, সবকিছু মিলিয়ে এক হাস্যকর নিরর্থকতা। যাই হোক, আমাকে বলা হলো, এত টাকা দিতে আমি রাজি আছি কি না।

ঃ না আমি রাজি নই!—আমি জবাব দিলাম।

ঃ অর্থাৎ?

: ওর দ্বিগুন দিতে চাই আমি।'—আমি আস্তে আস্তে উচ্চারণ করলাম।

: অর্থাৎ!' হ্যাঁ এই 'অর্থাৎ' শব্দটি বারবার বলা উকিলের দস্তুর।

: আমি একই কথা পুনরাবৃত্তি করলাম।

উকিল বিচারকের দিকে ঘাড় নামিয়ে ফিস ফিস করে বললো, 'স্যার, আসামীর মাথা ঠিক আছে কিনা—'

আমি নিশ্চয়তা দিয়ে বললাম, 'বিচারের রায় শোনার দরকার আমার নেই। যা কিছুই হোক, তা এক্ষুনি দিয়ে দেয়া হোক। আমার অবিলম্বে অফিসে যাওয়া দরকার। জরুরী কাজ জমে আছে।'

বাইরে সত্যি খুব চমৎকার দিন। আমি লক্ষ্যহীন ভাবে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। অল্পক্ষনের ভেতরেই আমি ব্রকলিন ব্রীজে। আমি ব্রীজের ওপর বেড়াতে লাগলাম। তারপর আবার নেমে এলাম রাস্তায়। আমার অফিসে ফেরার কোনো ইচ্ছে নেই। আজ ছুটি নিয়েছিলাম আমি।

টাইমস স্কোয়ারে এসে আমি থার্ড এভিন্যুর ফ্রেঞ্চ-ইতালীয়ান রেস্তোঁরার দিকে হাঁটা দিলাম। মুদী দোকানের পেছনে অন্ধকার, ঠাণ্ডা জায়গাটা। এরা খাবার পাঠিয়ে দেয় অর্ডার মাফিক। কাজেই লাঞ্চের সময় হলেও রেস্তোরাঁ জনশূন্য। কেবল আমি। আর একটু দূরেই দেখতে পেলাম এক দীর্ঘ দেহী আইরিশ মেয়েকে—যে মাতাল হয়ে আছে। ক্যাথলিক-চার্চ

সম্পর্কে এক অদ্ভুত ধরণের বাক্যলাপে মগ্ন হলাম আমরা দু'জন। সে বলছিলোঃ পোপ? ঠিক আছে। কিন্তু আমি তাঁর পশ্চাদ্দেশ চুম্বন করতে পারবো না!'

শেষে সে নিজের চেয়ারটা পিছনের দিকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে টলোমলো পায়ে উঠে দাঁড়িয়ে ল্যাভেটরির দিকে এগোতে চেষ্টা করলো। কিন্তু সে যে সেখানে একা একা যেতে পারবে না, তা বোঝাই যাচ্ছিলো। আমি তাকে ধরাধরি করে নিয়ে যেতে লাগলাম তার উদ্দিষ্ট জায়গায়।

ল্যাভেটরির দরজায় দাঁড়িয়ে সে আমাকে অনুরোধ করলো আসনে বসিয়ে দেবার জন্যে। আমি বসিয়ে দিলাম। তখন সে স্কার্ট তুলে প্যান্টিটা খুলে ফেলতে চেষ্টা করলো। কিন্তু কয়েকবার চেষ্টা করলেও পারলো না। পারা সম্ভবও নয়। বললোঃ একটুখানি খুলে দেবে? দাও না লক্ষ্মটি!' তার চোখ দু'টো প্রায় বুজে আছে। আমি ওর প্যান্টি খুলে, পুষির ওপর একটা আদুরে-ঠোনা মেরে ওকে বসিয়ে দিলাম ঠিক মতো। তারপর দরজা ঠেলে বাইরে বেরুতে গেলাম।

ঃ যেও না!'—সে আমার হাত ধরে জড়ানো গলায় বললো। তারপর আমার হাত ধরে থেকেই দিব্যি পায়খানা করতে লাগলো। বেশ জাঁকালো ভাবে হাগতে হাগতে সে আবার বললোঃ 'না। আমি কিছুতেই পোপের পাছায় চুমো খাবো না।' সে বারবার এই কথাটিই উচ্চারণ করতে থাকলো। তাকে এমন অসহায়া মনে হচ্ছিলো যে আমার ধারনা হলো,

ওর পাছাও আমাকে মুছিয়ে দিতে হবে। কিন্তু দীর্ঘদিনের অভ্যাসের দরুন সে কাজটা করতে পারলো একাই। যদিও এই সামন্য কাজে তার সময় লাগলো অনেক। 'আমি উঠবো,' হঠাৎ সেই বললো, 'আমাকে ওঠাও!' আমি যখন ওকে পাঁজা-কোল করে বের করলাম, রেস্তোরাঁর মালিক সন্দেহজনক চোখে তা লক্ষ্য করছিলো। যাই হোক আমরা টেবিলে পৌঁছে অর্ডার দিলাম কালো কফির। কফি খেতে খেতে আমরা কথাবর্তা বললাম খানিক ক্ষণ। নেশা কেটে যাবার পর ও আমার কাছে বারবার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে লাগলো। উষ্ণ আমন্ত্রন জানালো ওর বাসায় যাবার জন্যে। আমি বললাম, 'তোমাকে একটা ট্যাক্সি আমি ডেকে দিচ্ছি। কিন্তু তোমার সঙ্গে রাত কাটাতে পারবো না।'

: সংকোচের শিকার কেন হচ্ছো এখন?' সে বললো, 'কী হয়েছে? আমি কি তোমার জন্যে মানান সই নই? আমাকে পায়খানায় দেখেছো বলে। চলো না, বাড়ি ফিরে গোসলটা সেরে নিই। তখন ভালো করে আমাকে দেখো। একেবারে ফ্যালনা মনে হবে না। শোনো, তোমার হাতটা এগিয়ে দাও না। আমি হাতটা এগিয়ে দিতেই সে তার স্কার্টের নীচে নিয়ে গেলো। তারপর গুঁজে দিলো তার ঝোপে-ঢাকা যোনির মধ্যে।—'মজা নাও!' সে বললো, 'তোমার পছন্দ হয়? ঠিক আছে, এ সব তোমার! দ্যাখো, আমি বেজন্মা নই। একজন পেছনে লেগেছিলো আমার। বড্ড ভালো

বাসতো। সৎ ক্যাথলিক। আমিও একজন সৎ ক্যাথলিক। কিন্তু পোপকে সর্বশক্তিমান যীশুর মতো মনে করিনা বলেই—সে…'

সে একটার পর একটা প্রসঙ্গে যাচ্ছিলো লাফিয়ে লাফিয়ে। যেন একটা ছাগল। কথায় কথায় আমি বুঝতে পারলাম, কোনো বড়ো হোটেলে সে সুইচ বোর্ড অপারেটারের চাকরি করে। মানুষও খারাপ নয়। দেখতেও যে সুন্দরীই ছিলো তা বুঝতে কষ্ট হয়না। কিন্তু মদে ওকে খেয়ে ফেলেছে। গাঢ় নীল চোখ। মসৃন কালো চুল। হাসিটাও বেশ। তার সংগে রাত কাটাবার ব্যাপারে আমার আপত্তি করার তেমন কিছু ছিলোনা। কিন্তু মুশকিল হয়েছে এই, মোনার সংগে ডিনার খেতে হবে। তার জন্যে আমাকে এখন অপেক্ষা করতে হবে ম্যাক আলপিন হোটেলের রোজ-রুমে। তবে হ্যাঁ, ট্যাক্সিতে চেপে তাকে আমি পৌঁছে দিলাম তার অ্যাপার্টমেন্টে। বেশ সাজানো বাসা। আমি যেরকম ভেবেছিলাম, তার চাইতে ভালো। ঘরে ঢুকেই সে জুতো ছুঁড়ে ফেললো। আমি তাকে সাহায্য করলাম পোষাক খুলতে।

প্যান্টি ছাড়া প্রায় নগ্ন হয়ে সে যখন আয়নার সামনে দাঁড়ালো, একমাত্র তখনই আমি বুঝতে পারলাম, তার ফিগারটা খুবই চমৎকার। তার স্তন জোড়া সাদা এবং নিটোল। গোল এবং সূচীমুখ। বোঁটা দুটোর রং উজ্জ্বল স্ট্রবেরীর মতো।

: প্যান্টিটা আবার পরে থাকছো কেন?' আমি বললাম।

'ওটাও খুলে ফ্যালো!'

: না, এখন নয়!' সে বললো। তার মুখটা হঠাৎ রাঙা হয়ে উঠেছে।

: আমি তো আগেই খুলেছিলাম!' আমি বললাম, 'এখন খুললে নতুনত্বটা আর কী হলো?' বলতে বলতে প্যান্টি খোলার জন্যে ওর কোমরে হাত দিতে যেতেই ও বলে উঠলো, 'প্লিজ, এক্ষুনি নয়। আমাকে অন্তত: গোসলটা সেরে নিতে দাও। আর জানো, আমার মাসিক চলছে!'

আঁৎকে উঠলাম কথাটা শুনে। আমার চোখে বিদ্যুৎ চমকের মতো ভেসে উঠলো দগদগে দাগের ছবি। আমি আমতা আমতা করে বললাম: ঠিক আছে। তুমি গোসল করো। আমি আর একদিন এখানে এসে তোমার সংগে দেখা করবো!'

তুমি আমার পিঠ কচ্‌লে দেবে না?'—সেই মারাত্মক হাসিটা হেসে সে বললো।

নিশ্চয়ই…' বলতে বলতে ওর সংগে আমি বাথরুমে ঢুকলাম। আমার শরীরের অর্ধেকটা অবশ্য দরজার বাইরে। কেননা আমার ইচ্ছে, ওকে ঢুকিয়ে দিয়েই আমি কেটে পড়বো। কিন্তু ও প্যান্টিটা খুলে ফেলতেই—কী হেরীলাম প্রভো?—ধবধবে পাছার ওপর কুচকুচে তিল। ওহ্‌ জীবনেও এরকমটি আর দেখিনি হে!…'পোপের পাছায় চুমো খাবো? কখ্‌খনো নয় বাওয়া!'…

সে যখন গায়ে সাবান ঘষতে লাগলো, আমি আরো দুর্বল

হয়ে পড়লাম। আমি ওর হাত থেকে সাবানটা নিয়ে ওর ঝোপঝাড়ের মধ্যে মাখতে শুরু করলাম। সে তার গোপন অঙ্গে আমার আঙুলের পিচ্ছিল, ফেনময় স্পর্শ পেয়ে রোমাঞ্চিত—শিহরিত হয়ে উঠতে লাগলো।

: ব্যাস !—মাসিকটা নেই।' সে বললো। তারপর দু'হাতে যোনিটা ফাঁক করে নিশ্চিত হলো। বললো, 'দ্যাখো তো? কিছু চোখে পড়ছে কি?'

আমি আমার ডান হাতের আঙুল দিয়ে ওর যোনির ওপর মৃদু ম্যাসাজ করতে শুরু করলাম। বলাই বাহুল্য, মেয়েটি এতে উত্তেজিত হয়ে আমার ফ্লাইয়ের ভেতরে হাত চালিয়ে দিলো। তারপর খপ্ করে আমার নুনুটা ধরেই মুখে পুরে ফেললো। তাকে বেশ পেশাদার বলেই মনে হলো এ ব্যাপারে। কেননা আমার বীর্যে তার মুখ ভরে গেলেও, সে খুব স্বাভাবিক ভাবে টাবের মধ্যে চিৎ হয়ে শুয়ে চোখ মুঁদলো। আমি ভাবলাম, এই তো সময়। কেটে না পড়ার কোনো কারণ নেই। যেন সিগারেট খেতে যাচ্ছি, এই রকম ভঙ্গী করে হ্যাটটা হাতে নিয়েই আমি নীচতলায়।

কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট হোটেলের সামনে দীর্ঘ সময় প্রতীক্ষা করেও মোনার দেখা পাওয়া গেলো না। সে আসেনি। কি করে আসবে? কেননা—পরে জানা গেলো—ওর বাবা মারা গেছে!

তারপর সাতদিন সাতরাত চলে গেলো। আমি একা। ভাবলাম, মোনা আর ফিরে আসবে না। দু'বার সে টেলিফোন করেছিলো অবশ্য। কিন্তু অস্পষ্ট, উদভ্রান্ত অপরিচিত সেই গলার আওয়াজ। শোকে মোহ্যমান।

একদিন অফিস ছুটির মাত্র কয়েক মিনিট আগে সে হঠাৎ এসে উপস্থিত। সারা শরীর কালো পোষাকে ঢাকা। বিষণ্ণতা তার অবয়বে একটা আলাদা মাত্রা যোগ করেছে। ওর এই পরিবর্তন আমার কাছে অবিশ্বাস্য মনে হলো। তাকে দেখে মনে হয়, রেনেসাঁ যুগের এক ইতালীর শিল্পীর ক্যানভাস থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে। আমি ওকে আলিঙ্গন করে চমকে উঠলাম। মানুষের শরীর যে এতো বদলে যায়—আমার ধারনার অতীত। মনে হলো, মোনার পুর্ণজন্ম ঘটেছে।

এ অবস্থায় কারো পক্ষে কথা বলা কষ্টকর। অনেক ক্ষন সে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললো: এখানে কী করছো?' বললো, অর্থাৎ সেই রকম আমার মনে হলো। আমি যেন তার দিকে চোখ তুলে তাকাতেও পারছিলাম না।

ওকে নিয়ে বাসায় ফেরার সঙ্গে সঙ্গে হৈ চৈ পড়ে গেলো। যেন সবাই জানতো ওর এই প্রত্যাবর্তনের খবর। ক্রনস্কি ছিলো। ছিলো আর্থারের দুই বোন। রেবেকা আর তার

বান্ধবীরা। মোনাকে ফিরে পেয়ে উল্লাসে ফেটে পড়লো তারা। প্রায় সবার চোখই ভিজে।

বাপ মরার পর থেকেই বিয়ের চিন্তাটা এক রকম পেয়ে বসেছে মোনাকে। সব রকম কথার ফাঁকেই উঠে পড়ে বিয়ের কথা। মনে হয় পিতার মৃত্যু শয্যায় কোনো রকম শপথ সে করে থাকবে। এই শপথ রক্ষা করার জন্যেই বারবার একই কথা উচ্চারণ করছে সে। মোনার ধারনা জন্মেছে, ব্যাপারটাকে আমি গুরুত্ব পূর্ণ বলে মনে করছি না আদৌ। এই নিয়ে তাই খুনসুটি লেগেই আছে আমাদের দু'জনের মধ্যে। একদিন এই রকম এক প্রস্থ ঝগড়ার পর সে তার জিনিষপত্তর গোছাতে শুরু করলো। কী? না, সে আর এক দণ্ডও আমার সংগে থাকবে না। আমাদের কোনো বাক্স প্যাটরা নেই। কাজেই নিজের জিনিষ জড়ো করে ব্রাউন কাগজে মুড়তে লাগলো মোনা। কিন্তুত চেহারার এক একটা বাণ্ডিল।

: উদ্বাস্তুর মতোই মনে হচ্ছে না?—আমি বললাম। মোনা নিরুত্তর রইলো। আমি আধ ঘণ্টার মতো বসে বসে ওর গোছগাছ করা দেখতে লাগলাম। আমি ভাবতেও পারিনি—সে সত্যি সত্যি চাল যাবে। মনে হয়েছিলো, শেষ মুহূর্তের বর্ষনে তার সব রাগ মেঘের মতোই মুছে যাবে।

আমি চুপচাপ বিছানায় বসে ওর কাণ্ডকারখানা দেখছি—

মোনা প্যাকেটগুলো নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সোজা গেটের কাছে পৌঁছে গেলো। আমার দিকে ফিরেও তাকালো না। দরজার পাল্লা ধরে যেই না ও টান দিয়েছে, ভেতরে এসে ঢুকলো আর্থার রেমণ্ড। আমার দিকে তাকিয়ে বললো: 'তুমি কিছুতেই ওকে এইভাবে চলে যেতে দিতে পারো না। পারো কি? আরে মিয়া, মানবিক ব্যাপার বলেও তো একটা জিনিষ আছে!'

: তাই নাকি। আমি একটা দুর্বল হাসি হেসে বললাম।

: তোমাদের কাউকেই আমি বুঝতে পারিনা।' সে বললো। তার কথার ধরনে মনে হচ্ছিলো, সে ক্রোধ সংবরন করছে।

: সম্ভবত কালকেই সে ফিরে আসবে।' আমি বললাম।

: তুমি এতোটা নিশ্চিত হলেও আমি নই।' আর্থার বললো, 'বড্ড অভিমানী মেয়ে ও।···আর তুমি? তুমি একটা ঠাণ্ডা রক্তের বেজন্মা!' আর্থার রেমণ্ডের এই কাতরতার কারণ দুর্বোধ্য নয়। সে ইতিমধ্যে মোনার খুব ন্যাওটা হয়ে পড়েছিলো। সত্যি কথাটি উচ্চারণ করতে গেলে বলতে হয় সে ভালোবেসেই ফেলেছে মোনাকে।

: ওকে ফিরিয়ে আনছো না যে!'—রেমণ্ড হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো, 'তুমি বললে, আমিই না হয় দৌড়ে গিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে আসি ওকে! যীশু—তুমি এভাবে ওকে চলে যেতে দিওনা!'

আমি ওর কথার কোনো জবাব দিলাম না। আর্থার রেমণ্ড

একটু ঝুঁকে পড়ে আমার কাঁধে হাত রেখে বললো, 'ওঠো, ওঠো। কাজটা খুব খারাপ হয়ে যাচ্ছে, বুঝলে?' বললো, 'ঠিক আছে, তুমি বসে থাকো—আমিই ছুটে গিয়ে তাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসছি।'

সে দৌড়ে গিয়ে খুলে ফেললো গেটের দরজা। আমি শুনতে পেলাম: 'হ্যাঁ হ্যাঁ, এই তো, আমার হাতে দাও প্যাকেট গুলো। আমি তো, তুমি চলে গেছো মনে করে ছুটে যাচ্ছিলাম রাস্তায়। ভালোই হলো। এসো এসো। ভেতরে এসো।' বলতে বলতে সে হাসলো। সেই বিচ্ছিরি, বিদঘুটে হাসি।—'এসো ভেতরে এসো। সে তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে। কেন তুমি এমন কাজ করেছিলে। না না তুমি কখ্খনো এভাবে যেতে পারোনা। আমরা সবাই তোমার বন্ধু। আমাদের ছেড়ে এভাবে চলে যেতে পারোনা তুমি!'

তার কথার ধরণে মনে হচ্ছিলো, সে-ই মোনার স্বামী—আমি নই।

ওই ঘটনার পর থেকেই দিন এবং রাত গুলো যেমনই থাকুক—আমাদের দু'জনের জীবনচক্র ঘুরে চললো খুব দ্রুত গতিতে। বিয়ে করবো? নিশ্চয়ই; কেন করবো না! লাইসেন্সের টাকা আছে? নেই; কিন্তু ধার করবো। চমৎকার। সেই জায়গায় দেখা কোরো.....'

হাডসন-টিউবে হবোকেনের দিকে যাত্রা। সেখানেই বিয়ে হবে। হবোকেনে কেন? কী জানি কেন—তবে হ্যাঁ, আমার

মনে হয়, কিছু ধামাচাপা দেওয়ার জন্যে। নিয়মের বাইরে কিছু একটা অগ্রসর হচ্ছি বলে। কেননা আমি আগে একবার বিয়ে করেছি। যাই হোক—হবোকেনে চলো! ট্রেনে বসেও তার মনে সন্দেহ। সেই পুরনো গল্প। আমি হয়তো তাকে বিয়ে করবো না শেষ পর্যন্ত। এই যে এতো সব করছি—তা তাকে স্রেফ খুশি করার জন্যে।

হবোকেনের এক-স্টেশন আগে সে আচমকা লাফিয়ে নামলো ট্রেন থেকে। আমিও ছুটে গেলাম তার পেছনে পেছনে।

: কী হয়েছে। তুমি কি পাগল?

: তুমি আমাকে ভালোবাসোনা। আমি তোমাকে বিয়ে করবো না

: তুমি ও?—ঈশ্বরের দোহাই?

আমি ওর হাত ধরে প্লাটফরমের কিনার ঘেষে দাঁড়ালাম। পরের ট্রেন এসে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠলাম একটা কামরায় তারপর গভীর আবেগে তাকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করলাম।

: সত্যি আমাকে বিয়ে করবে—ভ্যাল?'

আমি তাকে আবার চুম্বন করলাম। বললাম, 'তুমি তা জানো না?'

হবোকেন নামের মতোই বিষণ্ণ। পিকিং অথবা লাসার চাইতেও অচেনা মনে হচ্ছে শহরটাকে। সিটি হল খুঁজে বের করা গেলো দু'জন স্বাক্ষীও পেয়ে গেলাম।

বিবাহ-অনুষ্ঠান তোমার নাম কি? এবং তোমার নাম।

আর তার নাম? ইত্যাদি ইত্যাদি। এই লোকটির সংগে কতোদিনের পরিচয়? আর এই লোকটি কি তোমার বন্ধু? হ্যাঁ, জনাব। একে কোত্থেকে কুড়িয়ে এনেছো—গার্বেজ-ক্যান থেকে? ও. কে। এখানে সই করো। ডুম্‌দাম্‌! তোমার হাতটা তোলো। আমি শপথ করিয়া বলিতেছি যে ইত্যাদি ইত্যাদি। বিয়ে হয়ে গেলো। পাঁচ ডলার। বরকে চুমু দাও। নেক্সট্‌? এদের পরে কারা আছে লাইনে?

সবাই খুশি।

আমি থুথু ফেলতে চাই।

ট্রেনে।···আমি ওর হাত ধরলাম। আমরা দু'জনেই কেমন বিমর্ষ, বিধ্বস্ত।—'আমি খুব দুঃখিত মোনা···আমরা ঠিক এভাবে কাজটা করতে চাইনি।'

ঃ ঠিক আছে ভ্যাল।' ও কিন্তু বেশ স্বাভাবিক। যেন এই মাত্র কাউকে কবর দিয়ে এলাম আমরা।

ঃ কিন্তু আমার কাছে ঠিক নেই। এভাবে কেউ কখনো বিয়ে করে? আমি আর কক্ষনো···'

পরক্ষনে সামলে নিই নিজেকে। সে আমার মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে।

ঃ তুমি কি বলতে যাচ্ছিলে?'—সে জিজ্ঞেস করলো।

আমি মিথ্যে কথা বললাম। বললাম, 'আমি কখনো নিজেকে ক্ষমা করতে পারবো না।'

সে চুপ করলো। তার ঠোঁট জোড়া থরথর করে কাঁপছিলো।

: আমি ঘরে ফিরতে চাই না।' সে বললো।

: আমিও।

নীরবতা।

: উলরিকের সঙ্গে আলাপ করি ফোনে?' আমি বললাম, 'আমরা ওর সঙ্গেই ডিনার খাবো। কি বলো?

: হ্যাঁ!'—সে সংক্ষিপ্ত জবাব দিলো।

আমরা টেলিফোন-বুথে ঢুকলাম। ওর কাঁধে আমার হাত। আমি বললাম, 'এখন থেকে তুমি হচ্ছো মিসেস মিলার! কেমন লাগছে তোমার?'

সে কাঁদতে শুরু করলো।—'হ্যালো হ্যালো', উলরিক বলছো?'

: না, আমি নেড।'

উলরিক নেই। সারাদিনের জন্যে কোথাও গেছে।

: শোনো নেড—এই মাত্র আমাদের বিয়ে হলো।

: কার বিয়ে হলো?

: মোনা আর আমার। অবশ্যই···তুমি কার কথা ভেবেছিলে?' সে তামাসা করতে আরম্ভ করলো। ব্যাপারটা যদিও এখনো তার মাথায় ঢোকেনি।

: শোনো নেড—তামাসার ব্যাপার নয়—। তুমি বোধহয় কোনোদিন বিয়ে করোনি। কাজেই বুঝতে পারছো না। আমরা খুব ক্লান্ত। মোনা কাঁদছে। আমারও চোখে পানি আসছে। আমরা কি খানিকক্ষনের জন্যে তোমার ওখানে আসতে পারি? একটু পান টান হলো—এই আর কি?'—

নেড আবার হাসতে শুরু করেছে। নিশ্চয়ই তোমরা আসবে। তবে কিনা—সে অপেক্ষা করছিলো তার যোনি মার্সেলির জন্যে। কিন্তু তাতে কি আসে যায়। চলে এলেই পারো। ফুর্তি করা যাবে।

: বেশ হবে। মত্ ঘাবড়াও। নেডের টাকা আছে। আমাদের ডিনার খাওয়াবে। মনে হয়, কেউ আমাদের বিয়ের উপহার দেবার কথা ভাববে না। দুস্তোর ব্যতিক্রমী ধারার বিয়ে? এ রকম বিয়ে কেউ করে? ছিঃ!'

: এ রকম ভাবে বোলো না, ভ্যাল!

: আমি দুঃখিত। মনে হয়, আজ মাথা আমার খানিকটা গরম হয়েছে। ওসব আনুষ্ঠানিকতা আমার বারোটা বাজিয়াছে। ওই রেজিস্ট্রার ব্যাটাকে আমার খুন করা উচিত ছিলো।

: ভ্যাল, পায়ে পড়ি তোমার। তুমি থামো!

: ঠিক আছে। এ সব কথা আর নয়। চলো, আনন্দ করা যাক, কেমন? এসো আমরা হাসি…'

নেডের হাসিটা ছিলো উষ্ণ। আমি ওকে পছন্দ করি। মানুষটা সে খুব দুর্বল। দুর্বল কিন্তু ভালোবাসার যোগ্য। তবে বড্ড স্বার্থপর। এই জন্যেই লোকটা এ পর্যন্ত বিয়েই করতে পারলো না। তার মেধা আছে। খুবই মেধাবী। কিন্তু প্রতিভা নেই। সে এমন একজন শিল্পী—যে কখনো একটি মাধ্যম খুঁজে পায়নি। তার শ্রেষ্ঠ মাধ্যম হলো মদ্যপান।

দেখতে অনেকটা সুদিনের জন ব্যারিমোর-এর মতো। গলার আওয়াজ বেশ মিঠে। যে কোনো ফালতু কথা বললেও কান ফেলে শুনতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু আজ পর্যন্ত সে একটি বাক্যও উচ্চারণ করেনি, যা স্মরনীয়।

: ও, তাহলে এজন্যেই ওখানে গিয়েছিলে। বেশ, এসো এসো। ভিতরে এসো। মোনা কেমন আছো? কনগ্রাচুলেশন্‌স! মার্সেলি এখনো আসেনি। বোধ হয় আসবে না আজ!'

ইজেলের পাশে একটা সিংহাসন-মার্কা চেয়ারে চেপে বসে কথা বলছিলো নেড। বললো: উলরিক বড্ড মিস করলো। তোমরা কি একটা ছোট স্কচ্‌ খাবে—নাকি জিন চাও?

: জিন!

: তা বলো, সব খুলে বলো দেখি। কখন ঘটলো ঘটনাটা··· এক্ষুনি? আমাকে জানাও নি কেন? আমি তোমাদের পাশে দাঁড়াতে পারতাম!'—মোনার দিকে ঘুরে জিজ্ঞেস করলো: তুমি নিশ্চয়ই গর্ভবতী নও, তাই না?'

যীশু, আমরা অন্য কথা বলতে পারি বোধ হয়!'—মোনা বললো, 'ওহ্‌, আমি শপথ করছি, আর কখ্‌খনো বিয়ে করবো না···কী ভয়ঙ্কর ব্যাপার!'

: মাতাল হবার আগে ঠিকঠাক বলোতো নেড, তোমার কাছে কতো টাকা আছে?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

সে পকেট থেকে ছ'সেন্ট বের করে বললো: ঠিক আছে; মার্সেলির কাছেও কিছু পাওয়া যাবে।'

: যদি সে আসে। তবেই।

আরে আসবে আসবে, চিন্তা কোরোনা।

অল্পক্ষনের মধ্যেই ডোর-বেলের আওয়াজ। মার্সেলি এসেছে। আমরা চুমোর আওয়াজ শুনতে পেলাম।

: হেনরী আর মোনাকে তো তুমি চেনোই। চেনো না?'

: চিনি না মানে?' মার্সেলি হাসতে হাসতে বললো, 'তোমাকে একবার ন্যাংটো ধরে ফেলেছিলাম···মনে আছে? অবশ্য অনেক দিনের ব্যাপার।'

: শোনো।'—নেড বললো, 'ওরা বিয়ে করেছে। এই তো অল্প কিছুক্ষণ আগে।···হবোকেনে গিয়ে।'

খুব ভালো কথা।' মার্সেলি মোনার কাছে গিয়ে তাকে চুমো খেলো। সে আমাকেও চুমো খেলো।

ওদের বিষণ্ণ মনে হচ্ছে না?' জিজ্ঞেস করলো নেড।

কই, না তো। আমার তো তেমন কিছু মনে হচ্ছে না।'—নেড মদ ঢেলে ওর হাতে দেবার পর জিজ্ঞেস করলো, 'তোমার কাছে কিছু টাকা হবে?'

নিশ্চয়ই হবে। কেন? তোমার দরকার?

না, আমার নয়। ওদের খুব প্রয়োজন। ওরা একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে।

খুবই দুঃখের ব্যাপার।' বললো মার্সেলি, 'টাকা আমার কাছে আছে। তোমাদের কতো দেবো, দশ, কুড়ি—? আর ফেরৎ দিতে হবে না। এ তোমাদের বিয়ের উপহার।'

মোনা ওর কাছে গিয়ে ওর হাত ধরলো। বললো, 'খুব খুশি হলাম। তোমাকে ধন্যবাদ।'

তাহলে আমি তোমাদের ডিনারে নিয়ে যেতে পারি।' আমি বললাম।

না, তুমি নও!'—মার্সেলি বললো, 'ডিনার খাবো এই খানেই। চুপচাপ বসো তো সবাই। বিয়ের অনুষ্ঠান বাড়িতে দেখতেই আমার ভালো লাগে। সত্যি আমি খুবই সুখী আজ। মানুষের বিয়ে দেখতে, তাদের দাম্পত্য-জীবন দেখতে আমার খুব ভালো লাগে। হতে পারি আমি সেকেলে মনোভাবাপন্ন; কিন্তু আমি ভালোবাসায় বিশ্বাস করি। আমি সারাজীবন ভালোবাসাবাসি চাই!'

মার্সেলি, তুমি কোথাকার মেয়ে?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'উটাহ্ থেকে এসেছি আমি।' জবাব দিলো মার্সেলি।

'তুমি খুব লক্ষ্মী মেয়ে। তোমার টাকা দেবার ধরণটি আমার পছন্দ হয়েছে।'

'আমাকে খোঁচা দিচ্ছো?'

'মোটেই না। সিরিয়াস হয়েই বলেছি। চমৎকার মানুষ তুমি। তা, ওকে বিয়ে করে ফেলছো না কেন? করে ফ্যালো! এতে ওর জান হয়তো বেরিয়ে যাবে। কিন্তু ফলও সে পাবে, এক সংগে অনেক গুলো।'

'শুনতে পাচ্ছো, ও কী বলছে?'—নেডের দিকে ঘুরে জিজ্ঞেস করলো মার্সেলি।—'কেন, আমি তোমাকে সব সময় এই

কথাটি মনে করিয়ে দিচ্ছিনা ? কিন্তু তুমি তো একটা কুঁড়ের বাদশা। অকম্মার ধাড়ি। তুমি তো জানোনা, আমি তোমার জন্যে কতোবড়ো একটা পুরস্কার !'

এইটুকু শুনবার সঙ্গে সঙ্গে মোনা অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো হঠাৎ। হাসতে হাসতে যেন সে দম ফেটে মরেই যাবে। একবার কেবল শোনা গেলো—'কী হাস্যকর ব্যাপার—মাগো ভাবা যায়না। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ !'

: তোমার তো নিশ্চয়ই নেশা হয়নি, তাইনা মোনা ?' নেড বিব্রতভাবে বললো।

: না না, তা নয়।' আমি বললাম, 'আমরা একটা জিনিষকে টেনে অনাবশ্যকভাবে লম্বা করছি। তাই ওর মধ্যে একটা প্রতিক্রিয়া—' আমার কথা শেষ হবার আগেই আবার উচ্চ হাসিতে মুখর হলো মোনা।

: তাছাড়া—' আমি বললাম, 'আমি কারো কাছ থেকে ধার টার করলে মোনা বিরক্তি বোধ করে কিনা—!'

আর এক প্রস্থ অট্টহাসি শোনা গেলো মোনার।

এবার মার্সেলি ওর কাছে গিয়ে, আমাদের দিকে তাকিয়ে নীচু গলায় বললো : ওকে আমার হাতে ছেড়ে দাও তো তোমরা। দু'জনেই মাতাল হয়ে পড়েছো। আমরা যাই—কিছু খাবার দাবারের বন্দোবস্ত দেখি !'

খেতে বসে কতো রকম কথা। ছোট কথা, বড়ো কথা। যৌনতার কথা। আধ্যাত্মিক আলোচনা। মার্সেলি এক পর্যায়ে

বললো, 'মুরগির মাংসের ছালওয়ালা টুকরো গুলো আমার জন্যে রেখো। বড্ড ভালোবাসি আমি। মুরগির পাছার স্যাণ্ড উইচ খেয়েছো? ওহ্—জীবনেও ভুলতে পারবে না একবার খেলে। এই দ্যাখো, মুখে পানি এসে গেছে আমার! তবে হ্যাঁ, খেতে বসে নোংরা জিনিষের নাম না নেয়াই ভালো। বরং সেক্স নিয়ে আলাপ করাও যুক্তি সঙ্গত।'

: কী বললে?' মুখিয়ে উঠলো নেড।—'নোংরা জিনিষের পাশা পাশি যৌনতা শব্দটি উচ্চারন করলে? যৌনতা কি নোংরা—হেনরী –তুমি কি বলো?'

: আমরা যদি সবাই হই দেবদুত কিংবা দুতী—আমাদের যৌনতা নেই। কি আছে? না পাখা। অ্যারোপ্লেনের কোনো যৌনতা থাকেনা, যেমন থাকেনা ঈশ্বরের। লোকে বলে, উন্মত্তরাই পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশী যৌনশক্তি সম্পন্ন। তারা স্বর্গে বাস করে; কিন্তু তারা নিজেদের নিস্পাপ সত্ত্বা হারিয়ে ফেলেছে।'—আমি বললাম।

: একটা বুদ্ধিমান মানুষ হয়েও এসব আবোল তাবোল কেন বকছো, বুঝতে পারছি না!'—আমাকে লক্ষ্য করে মার্সেলি বললো—'এমন কথা বলো, যা আমরা সবাই বুঝতে পারি। দেবদুত, ঈশ্বর —ইস্ মাথা ঘোরায় এসব ছাই পাশ কানে এলে। অবশ্য তোমার যদি নেশা ধরে থাকে—সে কথা আলাদা। কিন্তু তুমি তো মাতাল হওনি। কী ব্যাপার বলোতো?'

: চমৎকার মার্সেলি চমৎকার! তুমি সত্যি কথা শুনতে চাও? আমি ফেডআপ। আমি ক্লান্ত। আমি এখানে খেতে এবং কিছু টাকা ধার করতে এসেছি। হ্যাঁ, এসো আমরা সহজ, সাধারণ ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করি। তোমার অপারেশনের খবর কি? ওই যে, সেই শেষ অপারেশনটা? তুমি সাদা আদমী পছন্দ করো, নাকি কালা আদমী? হ্যাঁ, আমরা এমন সব কথা বলবো যাতে সবাই অনুভব এবং চিন্তা থেকে তফাতে থাকতে পারি। তুমি কী লক্ষ্মী মেয়ে— আমাকে বিশটি ডলার ধার দিলে!···ইস কী জঘন্য পরিবেশ। এমন পরিবেশে মাতালও হতে পারে না মানুষ। অথচ আমি সুস্থ মানুষ, নির্মল পরিবেশ চেয়েছিলাম। আমি যেন সেই ভ্রাম্যমান-ইহুদী, নিজের ঘরে যে আগুন লাগাতে চায়!'

১২

ক্লিও এখনো হাউস্টন স্ট্রিট বার্লেস্কের জ্বলজ্বলে আকর্ষন। মিস্টিংগেটের মতো সে-ও পরিণত হয়েছে যেন একটি ইনস্টি-টিউশনে। প্রযোজক মিনস্কি—ভ্রাতৃদ্বয় কী ভাবে তাদের ছাদ-ঢাকা বাগানে প্রতি রাত্রে এতো দর্শক টানছেন, তা বুঝতে কষ্ট হয় না। ম্যাটিনির আগে বক্স-অফিসের সামনে দাঁড়ালে টিকিট-প্রত্যাশীদের হুড়োহুড়ি দেখে যে কোনো লোকের আক্কেল গুড়ুম হতে বাধ্য। সন্ধের দিকে অবশ্য অভিজাত শ্রেনীর দর্শকরা ভীড় জমায়। এরা আসে মান-হাটান, ব্রুকলীন, কুইনস, ব্রনস্ক, স্ট্যাটেন আইল্যাণ্ড আর নিউ জার্সির সব অংশ থেকে। এমনকি আসে পার্ক এভিন্যু থেকেও।

আমি প্রায়ই এই থিয়েটারের সামনে ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াই। আমার তীক্ষ্ণ চোখ সার্চ লাইটের মতো দর্শকের ভীড়ে চেনামুখ খোঁজে। উদ্দেশ্য কয়েক পেনি ধার করে একটা শো দেখা। ঘুরি আর ভাবতে থাকি 'যৌনতা আর অভাব কেমন হাত ধরা ধরি করে চলে।' বার্লেস্ক হাউসের

বিদঘুটে গন্ধ। বিশেষ করে ল্যাট্রিনের ক্যাফর-বল আর প্রস্রাবের মিলিত ঘ্রান। সেই সঙ্গে নানা ধরনের সুগন্ধ এবং দুর্গন্ধ নিঃশ্বাস। মাঝে মাঝে তোমাকে লক্ষ্য করে রকমারি স্প্রে—যেন তুমিও একটা মাছি।

কী জঘন্য পরিবেশ। যেন রেনোয়ারের ঘা শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। আর সেই ঘায়ের সঙ্গে মিশে গেছে গা ঘিন ঘিন করা লালচে আলো। এখানে বসলে নিজেকে গোধূলি আলোয় বসে থাকা উজবুক মঙ্গোলিয়ানের মতোই মনে হয়। আর এটা তো জানাই আছে যে, শো ভাঙ্গলে বাড়িতে ফিরতে হবে পায়ে হেঁটে। তোমার চার পাশে ক্রমশ ভীড় বাড়ছে সেই সব ইডিয়েটদের, যারা ছুঁড়ে ফেলছে বাদামের খোসা, দাঁত বসাচ্ছে চকোলেটের টুকরোয় কিংবা নল ঢোকাচ্ছে কোল্ড ড্রিংকসের বোতলে। যতোসব লুম্পেন—প্রলেতারিয়েত। একটু ওফাতে অ্যাসবেস্টসের পাতে উৎকীন যৌন ব্যাধির প্রতিষেধক, টুথপেস্ট আর ঘড়ির বিজ্ঞাপন—যেন আমাদের জীবনে সময় কতো মূল্যবান। আপনি শোয়ের পর ক্ষিদে পেলে কী করবেন? কোনো চিন্তা নেই। কারও পকেটে যদি পোড়াবার মতো টাকা থাকে, তবে লুইস কিংবা অগাস্টের রেস্তোরাঁয় ঢুকে পড়ুন। ওর ওপর তলাতেই আছে মেয়ে। আপনি তাদের পাছায় টাকা ঘষতে পারেন এবং দেখতে পারেন অরোরা বোরিয়ালিস—অথবা লাল সাদা নীল রঙ। মোটকথা বিন্দুতে সিন্ধুর মতো, পয়সা ফেললেই

মিনিস্কি ভাইয়েরা আপনার সামনে তুলে দেবে বিবিধ উপচার। হ্যাঁ, একই ছাদের নীচে। ফেলো কড়ি, মাখো তেল। যতো অখাদ্য নাটকই হোক, ফ্লপ করার আশঙ্কা নেই। একই নাটক, একই পাত্র পাত্রী এবং হ্যাঁ—দর্শকও সবাই সবার পরিচিত। যেন পারিবারিক সম্মিলন। দেখতে দেখতে তোমার যদি বিরক্ত লাগে, নিজের মুখ দেখবার জন্যে আয়নার দরকার নেই। তুমি তোমার পাশে বসা, প্রতিবেশীর মুখের দিকে তাকাও। তাহলেই হবে। একে তাই বলা চলে আইডেন্টিটি হাউস। পরিচিতি ভবন।

কোনো কিছুতেই মৌলিকতা নেই। এরকম অনুষ্ঠান তুমি আগেও অন্ততঃ এক হাজার বার দেখেছো। এটি এমন এক যোনি, যার প্রতিটি লোম তোমার চেনা। যার ভেতর থুথু ফেলা ছাড়া তোমার নতুন করে আর কিছুই করার নেই। যা দেখলেই তোমার গা গুলিয়ে ওঠে। মনে হবে, এক্ষুনি আগুন ধরিয়ে দেয়া যাক এখানে। কিংবা একটা মেশিন গান চালিয়ে মেরে ফেলা যাক সব্বাইকে। আবার এরকমও মনে হয়, যাই, শুয়ে পড়ি গিয়ে ওই বাদামের খোসা, চকোলেটের রাংতা আর কিচকিচে ধুলোয় ভরা মেঝের ওপর। আমার দেহের ওপর দিয়ে তেলকালির গন্ধ ভরা, গুমসানো জুতো পায়ে হেঁটে যাক দর্শকবৃন্দ। তা ব্যবসা একটা ফেঁদেছে বটে ইহুদির বাচ্চারা। মনে হয়, রোজ রাত্রে লাখ লাখ টাকা গুনবার পর তারা টার্কিশ বাথে মগ্ন হয়, আর তাতে

থাকলে একবার সিনাগগেও যায়।

আবার ফিরে আসি ক্লিওয়ের কথায়। আজ রাত্রে আবার ক্লিও। সে দু'বার নাচতে আসবে মঞ্চে। ইন্টারভ্যালের আগে একবার। এবং শোয়ের শেষ পর্যায়ে আর একবার। মার্সেলি কিংবা মোনা এর আগে কখনো বার্লেস্কে আসেনি। যাই হোক, ক্লিওয়ের প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকে শরীর ঝাঁকাবার জন্যে তৈরী হয়ে গেলো (নির্বিবাদে হস্তমৈথুন করার জন্যে ভারতীয় নবাবরা হলের অর্ধডজন চেয়ারের সারি যেরকম রিজার্ভ করে রাখে)। এক্ষেত্রে অবশ্য যার যার হ্যাটের নিচেই এ কাজটি সমাপন হয়। এমন কি একজন অন্ধের চোখেও জ্বল জ্বল করে ওঠে এক জলজ্যান্ত যোনি! বাড়ি যাবার পর কোনো কোনো দর্শক নিশ্চয়ই সেফ্‌টি রেজরে নিজেদের অণ্ডকোষ কেটে ফ্যালে। কিন্তু এইক্ষুদে-দুর্ঘটনার খবর পরদিনের সংবাদপত্রে ছাপা হয়না।

ইন্টারভ্যালের পর বাদ্যযন্ত্রে ঝংকার তুলে শ্রোতা-দর্শককে সচেতন করতে লাগলো বাদ্যকররা। আমরা তাড়াতাড়ি ফিরে এলাম আমাদের আসনে। মোনা আর মার্সেলি তো আগেই এসে বসেছে। গভীর আলাপে নিমগ্ন উভয়েই। বাজনা ক্রমশঃ চড়ছে। আলো গুলো টিপটিপ করে জ্বলছে আর নিভছে। আমাদের সামনের ছোকরাটা তার আঙুলের ফাঁকে ধরে আছে একটা পোষ্টকার্ড—যেন সে আবিস্কার করবে ব্যাবিলনের বারবণিতা অথবা শেয়ামিজ যমজকে।

পর্দা উঠতেই রাইভিংটন স্ট্রিটের মিশার-সুন্দরীরা মঞ্চে ঢুকে তলপেটে ঢেউ তুললো। পোষাক সংক্ষিপ্ত করছে তারা বাজনার তালে তালে। একজন মাথা ঘুরিয়ে চেষ্টা করছে নিজের পাছাটা কামড়ে ধরতে। এইভাবে একের পর এক আইটেম। ইথুটস্কের রাজপথ 'থেকে সিসেম খোল'। সেখান থেকে ভোলাপুক ভাষায় জবাবদিহি। উড়োজাহাজে ক্যালিডোনিয়া প্রবাসী প্রেমিকার কাছে প্রেমপত্র প্রেরণ। তারপর গান। 'পনি বয়' থেকে 'কাশ্মিরী গীত।' এবং সেখান থেকে 'রেইন ইনদ্য ফেস।' ল্যাটভীয় যুবতীর মাথায় পালকের মুকুট। সে ততোক্ষন ঠায় দাঁড়িয়ে থাকলো যতোক্ষন চললো হেস্টার স্ট্রিটের এক কাউ পাংচারের লেখা এবং বিংক্রসবি জুনিয়রের গাওয়া আমেরিণ্ডিয়ান লোক গীতি। প্রতিটি বিষয় ঘড়ি ধরে তৈরী। এক মিনিট অপচয় হবার যো নেই। রাত সাড়ে দশটা নাগাদ ক্লিওর পুনরাবির্ভাবের সময় হলো। মাদকতাময় যন্ত্র সঙ্গীত এবং আলোর ক্যালোয়াতির ভেতর বিচিত্র ভঙ্গীতে মঞ্চে এলো সে। এবার সে যেন এক গোখরা সাপ! মনে হচ্ছে তার শরীরে হাড় বলে কোনো পদার্থ নেই।

…ঘোর অন্ধকার আফ্রিকা…। এখন আমরা তার অভ্যন্তরে। উবাঙ্গি নদী কলকল করে বইছে। দু'টি সাপ মিথুন মগ্ন। না, মিথুন মগ্ন নয়—লেজের দিক থেকে ছোট সাপটিকে গিলছে বড়ো সাপটি। ছোট সাপটি বিষাক্ত। তার দৈর্ঘ্য বারো ফুট। সে লড়েই গেলো শেষ পর্যন্ত। শেষ মুহূর্ত অব্দি তাকে দেখা গেলো

জিহ্বা নাড়াতে। আফ্রিকা, ক্ষুধার দেশ, মৃত্যুর দেশ। ব্যতিক্রম কেবল গরিলারা।...আফ্রিকা এখনও অন্ধকার মহাদেশ। বাইবেল আর তলোয়ার হাতে শ্বেতাঙ্গরা যখন প্রথম এদেশে এলো, এখনকার অবস্থাও সেই তখনকার মতোই। আর সেই আফ্রিকার পটভূমিতে রচিত এই অশ্লীল নৃত্যনাট্যটি অনুষ্ঠিত হচ্ছে এমন জায়গায়, যেখান থেকে গির্জা খুব দূরে নয়। ক্লিও যদি প্রকাশ্য রাস্তায় এই নাচটিই শুরু করতো, তবে নির্ঘাত তাকে গ্রেফতার করতো পুলিশ। সে যদি কারো বাড়িতে, ঘরোয়াভাবে এই নৃত্য পরিবেশন করতো, তাহলে অবশ্যই হতো ধর্ষিত। আর এ নাচ যদি সে নাচতো কার্নেগী-হলে, তা হলে তো বিপ্লব ছিলো অবশ্যম্ভাবী। এক কথায় তার নাচ আমেরিকার শাসনতন্ত্রের পরিপূর্ণ লংঘন। এখানে একটি মাত্র সততা আছে।—আর তা হলো, মিনস্কি বাদার্সের ব্যাংক ব্যালান্স ফাঁপিয়ে তোলা।

আশ্চর্য! কী করে আমি বিশ্বাস করবো যে দুনিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম এই শহরে নারী পুরুষ—স্বামী স্ত্রী পাশাপাশি বসে এরকম ভয়াবহ নৃত্যনাট্য উপভোগ করছে। এটা কি নাট্যশালা, নাকি নাগাসাকির সেই বাজার, যেখানে কেবল যৌনসম্ভারই বিক্রী হয়। যেন আমরা রাবারের তৈরী সঙ্গমযন্ত্র হাতে নিয়ে নৃত্য উপভোগের সংগে সংগে নিজেদের বিকৃত কাম ক্ষুধা চরিতার্থ করছি। আমি সবচেয়ে বেশী বিস্মিত হলাম এই ভেবে যে আমি নিজেও এবার নিয়ে তৃতীয় বারের

মতো এখানে এসেছি গাঁটের কড়ি খরচা করে। সবান্ধবে—এমনকি সপরিবারে! পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে মার্কুইস দ্য সাদকে মনে হলো শশার মতো যথোচিত। নীল-দেড়েকে মনে হলো ঘুঘুর মতোই ভদ্র!

নাচের শেষ দিকে ক্লিওর অঙ্গভঙ্গী এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছে, যা দেখে মরা লাশও উঠে বসতে বাধ্য। কিন্তু তার কোনো ভয় নেই। শহরের মাতব্বররা আছে তার মাথায় বরাভয়ের হাত নিয়ে। আছে মিনস্কি ভাইদের হিত কামনা। মিনস্ক শহরে পিনস্ক থেকে এসেছিলো এই দুই দূরদর্শী ভাই। অনুষ্ঠানের সামগ্রিক পরিকল্পনা তাদেরই। স্বপ্ন যেভাবে সত্য হয়, ঠিক সেইভাবে তারা গড়ে তুলেছে এই চমৎকার গ্রীষ্ম-কালীন উদ্যান-বাটিকা। ক্যাথলিক-চার্চের ঠিক গা ঘেঁষেই। অনুষ্ঠানে মার্কিন পতাকার উড্ডয়ণ থেকে মাতৃ-সঙ্গীত—এমনকি ল্যাভেটরীতে শ্বেতকুন্তলা জননী—এর সমস্ত কিছু তাদেরই উদ্ভাবন।

একেবারে শেষ দিকে···পুষ্প স্তবকের ওপর দুধ পড়ছে। সিলভারবার্গ নামের একটি লোক চিবিয়ে খাচ্ছে মাদী ঘোড়ার ঠোঁটা। নামহীনা এক নারী পায়ের নীচে বাদামের খোসা ছুঁড়ে পাহাড় বানিয়ে ফেলছে।

এবং একই সময়ে—বলা চলে ওই মুহূর্তেই ; ট্রপিকালের স্যুটের সঙ্গে হলদে টাই পড়া আর বাটন হোলে সাদা কার্নেশন গোঁজা কালো মতো লোকটি দাঁড়িয়ে আছে হোটেল অ্যাস্টরের

সামনের সিঁড়ির তৃতীয় থাকে। তার হাতে একটা বেতের ছড়ি। নাম ওসমান আলী। খুবই উল্লেখযোগ্য মানুষ। তার পকেট ভর্তি দশ, বিশ আর পঞ্চাশ ডলারের প্রচুর নোট। তার বুক-পকেটের রুমাল থেকে যে ঘ্রাণ আসছে, তাতে বুঝতে মোটেই অসুবিধে হয়না, কী দামের প্রসাধনী ব্যবহারে সে অভ্যস্ত। সে একটা ডেইজির মতোই টাটকা। একজন সত্যিকারের জিম ডাণ্ডি। তাকে দেখে কেউ কল্পনাও করতে পারবে না, সে একটি যাজক-সম্প্রদায়ের বেতনভুক কর্মী। তার দায়িত্ব হলো চারদিকে কুৎসা, দ্বেষ আর বিষ ছড়ানো। এই সব কাজ করতে সে আনন্দ পায়। তারপর আরামে ঘুমায় এবং ফুটে ওঠে একটা গোলাপের মতোই।

আগামীকাল দুপুরে সে যথারীতি হাজির হবে ইউনিয়ন-স্কোয়ারে। দাঁড়াবে একটা সোপ-বক্সের ওপর। আমেরিকার পতাকা তাকে নিরাপত্তা দেবে। তার কথার তুবড়ি ছুটবে পূর্ণ বেগে, মুখ থেকে বেরুতে থাকবে ফেনা। তার প্রতিটি বক্তব্যেই কম্যুনিজমের আবেদনকে ধ্বংস করার যুক্তি ঝলসে উঠবে বারংবার। যেন ওই মতবাদকে রাখা বা না-রাখার ভার দেয়া হয়েছে তার ওপরেই। সস্তা যাদুকরদের মতো, টুপিতে ঝাঁকি দিলেই সেগুলো অদৃশ্য হবে। কেবল যুক্তি প্রদর্শন করেই সে ক্ষান্ত হবে না। কেবল ছড়াবে না বিষ আর কুৎসা। সে ওখানে একটা হাঙ্গামা বাঁধাবে। যাতে পুলিশকে ছুটে আসতে হবে ঘটনাস্থলে। ব্যাপার গড়াবে কোর্ট-কাছারি পর্যন্ত।

আর জাতীয় পতাকার ওপর আক্রমনের দায়ে গ্রেফতার করা হবে নিরীহ জনসাধারনকে।

ইউনিয়ন স্কোয়ারে গণ্ডগোল বাঁধিয়ে লোকটা চলে যাবে বোস্টন অথবা অন্য কোনো মার্কিন নগরীতে, যেগুলো সব সময় জড়ানো থাকে জাতীয় পতাকা দিয়ে। যেখানে রক্ষা কবচের মতো মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকে অসংখ্য গির্জা। সে এমন একজন মানুষ, যার নিজস্ব সত্ত্বা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। যে বহুবার বদলে ফেলেছে নিজের নাম। লোকটা কাজ করেছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে। লাল, সাদা, নীল—সব দলেই। কখনো আলাদা সময়ে, কখনো আবার একই সঙ্গে। সে একজন দেশহীন মানুষ। তার কোনো নীতি নেই, কোনো আদর্শ নেই, কোনো বিশ্বাস নেই। সে যেন বীলজেবারের ভৃত্য—পায়রার বিষ্ঠা—বিশ্বাসঘাতক। মানুষকে বিভ্রান্ত করার ব্যাপারে তার জুড়ি নেই।

সে অনাত্মীয়। নির্বান্ধব। যখন অদৃশ্য হয়—পেছনে কোনো চিহ্নই সে রেখে যায়না। প্রভুদের সঙ্গে এক গোপন সূতোয় তার আঙুল বাধা। সোপ বক্সের মঞ্চে দাঁড়ালে তাকে মনে হয় চূড়ান্ত ধর্মান্ধ। আবার প্রতি সন্ধ্যায় অ্যাস্টের হোটেলের সামনে দাঁড়িয়ে সে যখন চলমান জনস্রোত অবলোকন করে, তখন তার অন্য রূপ। স্থির ধীর নম্রতা আর গাম্ভীর্যের প্রতীক। শান্ত অথচ আত্মনির্ভর। সে গোসল করেছে। নখগুলো সুন্দর করে কাটা। জুতো জোড়া চকচক করছে।

অত্যন্ত ব্যয়বহুল রেস্তোরাঁয় আহার সেরে, এই তো খানিকটা হেঁটে এলো পার্ক থেকে। প্রায় বুদ্ধিদীপ্ত, সংপ্রশংস দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে আছে। খানিকটা যেন আত্মমগ্ন। যেন পৃথিবী আর আকাশের সৌন্দর্য থেকে অনেক দূরে আটকে আছে সেই দৃষ্টি। প্রচুর পড়াশুনো। ব্যাপক ভ্রমণের অভিজ্ঞতা রয়েছে। গান এবং ফুল ভালোবাসে।

কিন্তু এ মুহূর্তে সে হোটেলের সিঁড়ি থেকে নেমে ভীড়ের মাঝখান দিয়ে সামনের দিকে ছুটে চলেছে কেন? তার গন্তব্য আত্ম বিনাশ। তার কোনো সমস্যা নেই, দ্বন্দ্ব নেই। চলমান অবস্থায় সে যান্ত্রিকভাবে দেহ-ভঙ্গী করছে। যেমন, একটা গার্বেজ ক্যানের পাশ দিয়ে ছুটে যাবার সময় সে নোটের তাড়া ছুঁড়ে ফেললো। যেন কলার খোসা ফেলে দিচ্ছে। রাস্তার এক কোনে সে ঝেড়ে ফেললো কোটের ভিতর-পকেটে রাখা প্রতিটি জিনিষ। তার ঘড়ি এবং চেন, আংটি, পকেট-ছুরি—সব পড়ে রইলো রাস্তায়। সে সব কিছুর মালিকানা থেকে অব্যাহতি নিচ্ছে—এ আনন্দে নিজেকে বারবার আদর করছিলো। এমনকি শেষ বারের মতো নাক মুছে সে তার হাতরুমালটাও নর্দমায় ছুঁড়ে ফেললো। সে পালকের মতো হালকা শরীর নিয়ে রাস্তার ওপর দিয়ে যেন উড়ে চললো। তাকে দেখে কেউ কেউ মনে করবে, সে ইতি মধ্যে পৌঁছে গেছে অন্য পৃথিবীর সীমান্ত—রেখায়।

তার মাথার ওপর আইনের খড়্গটি ঝলসে উঠেছে এবং গর্জন

করছে। একটি লোক দ্রুত দৌড়ে তাকে পেরিয়ে যাচ্ছে। তার পেছনে রিভলভারধারী এক পুলিশ। পুলিশও ছুটতে শুরু করলো। এখন তিন জনই দৌড়ুচ্ছে। সে তার পেছনে কারো অস্তিত্বই অনুভব করছে না। কিন্তু মাথার খুলির পেছনে বুলেটের আঘাত খেয়ে, সে যখন ভূপাতিত হলো, তখনই তার মুখ মণ্ডলে ফুটে উঠলো সমস্ত ঘটনার মূলীভূত প্রতিচ্ছবি।

মৃত ওসমান আলী তার আবাসিক হোটেলে না-ফিরে পেছনের দরজা দিয়ে ঢুকলো ছিমছাম সেই পল্লীকুটিরে, যেখানে সে কথা বলতো ভিন্ন ভাষায়। সে খাবার টেবিলে বসে দুধের গ্লাসে চুমুক দিলো। মনে হলো, ঠিক এই টেবিলে বসে গত কাল যখন সে দুধ খাচ্ছিলো, তার স্ত্রী এসে জানালো, সে তাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে। কথাটা শুনে সে এমন চমকে গেলো যে তার মুখ থেকে একটি শব্দও বের হলোনা। ওর বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার সময় সে স্পষ্ট করে বললোঃ আমি তোমাকে কখনো ভালোবাসিনি।' কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সে সম্পূর্ণ অন্য মানুষ। সে এমন রহস্যজনক স্বচ্ছন্দ বোধ করতে লাগলো, যে স্বপ্ন দেখছে কিনা সন্দেহ হচ্ছিলো তার। সে ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে কুকুর-শালার সামনে গেলো। তার ডাক শুনে কুকুরটা মাথা বের করতেই সে এক কোপে তার গলাটা নামিয়ে ফেললো। সে স্বাধীন। সে যা খুশি তাই করতে পারে। হাঃ হাঃ করে হেসে উঠলো। বাড়ির

ভেতরে গিয়ে চাকরানীকে ডাকলো। সে তার নতুন দৃষ্টি নিয়ে তাকালো চাকরানীর মুখের দিকে। এক ঘণ্টা পর মেয়েটিকে ধর্ষন করে সে ব্যাঙ্কে গিয়ে টাকা তুলে সোজা স্টেশনে চলে গেলো। প্রথম ট্রেনেই চেপে বসলো ওসমান আলী।

সেই তখন থেকে এখন পর্যন্ত সে একাধিক খুন করেছে অন্য মনস্ক-ভাবে। সে প্রেমও করছে একই ভাবে। ভয় কিংবা সাবধানতা ইত্যাদি শব্দ তার অভিধান থেকে মুছে গিয়েছিলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তুর্কী-যুবক ওসমান আলী মৃত্যুর মধ্য দিয়ে স্পর্শ করতে পেরেছিলো নিজের গন্তব্যকে।

ক্লিও তার নৃত্যে বিরতি দিতে যাচ্ছে। তার নাচের ভয়াবহ শেষ মুদ্রাটি ছিলো ওসমান আলীর মৃত্যু-জ্ঞাপক মুদ্রা।

ওসমান আলীর মৃত্যু যেন আমার নিজের জীবনেরই এক ভবিষ্য-চিত্র। বিভীষিকার পাত্রের মধ্যে তাহলে আমরা এক বার ঝাঁপ দিয়ে পড়ি।

রাত। আমি একটা খুপরির মধ্যে বসে আছি। এটা আমাদের বাড়ি। মেঝের সঙ্গে শিকল দিয়ে বাঁধা বন্দীর মতো আমি রাতের পর রাত অপেক্ষা করি। আমার স্ত্রী তার সঙ্গের মেয়েমানুষটিকে বন্ধু বলে ডাকে। তারা আমাকে ঠকাবার জন্যে এবং পরাস্ত করবার জন্যে চক্রান্ত করেছে। আমাকে ওরা এখানে রেখেছে খাদ্য, আলো এবং উত্তাপ থেকে বঞ্চিত করে। বলেছে, তারা ফিরে আসার আগে পর্যন্ত একা একাই আমি যেন আনন্দিত থাকি।

মাসের পর মাস ধরে এই লজ্জাকর জীবন যাপন। বাইরের দুনিয়া থেকে কোনো রকম সাহায্য আসবে, আমি তা আশাও করিনা। দোর-ঘন্টি বাজলেও দিই না কোনো সাড়া। নিজস্ব আতঙ্কের ভেতরে আমার একাকী বসবাস। আমি নিজের জালে বন্দী। অপেক্ষা করছি, কবে প্লাবন হবে এবং আমার মেঝে পর্যন্ত পানি উঠে আমাকে বের করে নিয়ে যাবে।

যখন তারা আমাকে অত্যাচার করার জন্যে ফিরে আসে, আমি যে পশুতে পরিনত হয়েছি সেই রকম আচরণ করি। আমি ক্ষুধার তাড়ায় মুখ ডুবিয়ে দিই খাদ্য ভাণ্ডে। আমি আমার আঙ্গুল দিয়ে খাই। খাবার সময় ওদের দিকে তাকাই ক্ষমাহীন দৃষ্টিতে, যেন আমি একটা পাগল, হিংসুক জার। আমি গর্জন করে তাদের বুঝিয়ে দিই যে আমি ক্রুদ্ধ। রাতের পর রাত আমি এই রকম করি। আমি অনুভব করবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছি। কোনো কোনো রাতে আমি আহত সিংহের গলায় গর্জন করে তাদের চিত্ত বিনোদন করি। কখনো বা মখমল-থাবায় আঘাত করে তাদেরকে ভূপাতিত করে ফেলি। হাসতে হাসতে তারা যখন মৃগী রোগীর মতো মেঝেয় গড়াগড়ি করতে থাকে—আমি তাদের শরীরে প্রস্রাবও করি।

তারা বলে, আমাকে একটা ভাঁড়ের মতোই দেখায়। এক-দিন বন্ধু বান্ধবদের দাওয়াত করে এনে হাসি মস্করা দেখাবার ইচ্ছেও আছে ওদের। আমি দাঁত বের করে সম্মতির ভঙ্গী করি। আমি চিড়িয়াখানার তাবৎ কায়দা শিখছি। আমার

সেরা খেলা হচ্ছে হিংসা। ছোটোখাটো বিষয় নিয়ে হিংসা। কখনো তলিয়ে দেখিনা সে কার সঙ্গে কোথায় শুলো। বরং জানতে চাই কে তার হাতে চুমো খেলো। ওরকম ছোট্ট একটা ভঙ্গীতেই আমি প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হয়ে উঠি। আমি ছুরি তুলে নিতে পারি তার গলা কাটবার হুমকি দেবার জন্যে। আমি এতদূর অগ্রসর হই যে ওর বন্ধুর গায়ে থাবা পর্যন্ত মেরে বসি। আমি তার অবিচ্ছেদ্য বন্ধুর জন্যে আয়োডিন আর প্লাস্টার নিয়ে এসে তার পাছায় চুমো পর্যন্ত খাই।

আমাদের বলতে দাও, যে একদিন সন্ধের সময় বাড়ি ফিরে ওরা দেখে, আগুন নিভে গেছে। আমরা বলতে চাই যে সেদিন আমি খুব মুডে আছি। আমাদের বলতে দাও যে বন্দীশালায় প্রবেশ করে তারা আমার আনন্দ সম্পর্কে অনবহিতই থেকে গেলো। তারা কেবল আঁচ করতে পারলো ঘরের অবিশ্বাস্য শীতলতাকে। তারা একবারো খোঁজ নিলো না ঠাণ্ডায় আমার কোনো অসুবিধে হয়েছে কিনা। তারা স্রেফ উচ্চারণ করলো, খুব ঠাণ্ডা পড়েছে তো!

: ঠাণ্ডা বুঝি, আমার ছোট্ট রানীরা? তাহলে তো দাউ দাউ আগুনেরই দরকার তোমাদের। আমি চেয়ার তুলে নিয়ে পাথরের দেয়ালে ঠুকে তা চুরমার করলাম। তারপর পাথর ঠোকাঠুকি করে টুকরো কাগজে আগুন জ্বালিয়ে বানিয়ে ফেললাম একটা অগ্নিকুণ্ড।

খানিকটা খাবার এলো এবারে। এক বোতল ঠাণ্ডা বীয়ার

—'তাহলে বিকেলটা বেশ ভালোই কাটিয়েছো আজ!' বাইরেও খুব ঠাণ্ডা, তাই না! কিছু টাকার যোগাড় হয়েছে নাকি? বাঃ, কালকেই জমা দিয়ে ফ্যালো ডাইম সেভিংস ব্যাঙ্কে। আর তুমি, হোগোরোবুরো—দৌড়ে গিয়ে নিয়ে এসো এক ফ্লাস্ক রাম্। আমি কাল বেরিয়ে পড়ছি।···বেড়ানোর দরকার হয়ে পড়েছে আমার।

আগুন স্তিমিত হয়ে এলে আর একটা চেয়ার ভেঙ্গে জ্বালানি যোগাই। আগুন চাঙ্গা হয়ে ওঠে। হোগোরোবুরো বাইরে থেকে বোতল নিয়ে আসে। ছিপি খুলতে সময় লাগে এক মিনিট। তারপর সতৃষ্ণ চুমুক। আগুনের শিখা ম্লান হয়ে এলে আমি চেঁচিয়ে উঠি, আমাকে আরেকটা চেয়ার দাও। প্রতিবাদ। গর্জন। চীৎকার। আমি ডাস্টবীন থেকে তুলে নিয়ে আসি একটা কুড়োল। টেবিলটা কুপিয়ে টুকরো টুকরো করে ফেলি। তারপর ভাঙ্গি কমোড। সব জিনিষ স্তূপাকার করি মেঝের ওপর। আমি সব কিছু ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করবো। আমি তাদের হুমকি দেই—এমন কি বাসনপত্রও ভেঙ্গে ফেলবো। আমরা এমন ভাবে নিজেদের দেহ গরম করবো, যেভাবে আর কখনো গরম করিনি।

রাত কাটলো মেঝের ওপর। নির্ঘুম, যন্ত্রনাদায়ক। আমাদের তিনজনের অবস্থাই ছিলো পোড়া ছিপির মতো।

: সে কখনো এখান থেকে যাবে না···সে অভিনয় করছে।

আমার কানে এরকম ফিসফিস আওয়াজ এলো: তুমি কি

সত্যিই চলে যাবে ?

: হ্যাঁ, আমি শপথ করে বলছি।

: কিন্তু আমি চাইনা, তুমি চলে যাও।

: তুমি কি চাও—তাতে আমার কিছুই যায় আসে না আর।

: কিন্তু আমি তোমাকে ভালোবাসি।

আমি বিশ্বাস করিনা একথা।

: বিশ্বাস করতেই হবে তোমাকে।

আমি কাউকে বিশ্বাস করিনা। কোনো কিছুতেই না।

তুমি অসুস্থ। তুমি কী করছো, তা জানোনা। আমি তোমাকে যেতে দেবো না।

: কীভাবে আমাকে থামাবে ?

প্লিজ, প্লিজ, ভ্যাল, এভাবে বোলো না···তুমি চিন্তায় ফেলে দাও কেন আমাকে ?

নীরবতা/

চাপা গলা : তুমি আমাকে ছাড়া বাঁচবে কী ভাবে ?

: আমি জানিনা। আমি জানতেও চাইনা।

কিন্তু আমাকে তোমার দরকার। নিজের যত্ন কী ভাবে নিতে হয়, তুমি তা জানোনা।

আমার কারুর দরকার নেই।

: আমার ভয় করছে ভ্যাল, আমার মনে হচ্ছে—কিছু একটা অঘটন তোমার ঘটবে।

ভোর বেলাতেই আমি বেরিয়ে পড়লাম। যখন তারা অঘোরে

নিদ্রা যাচ্ছে ঠিক তখন। খবরের কাগজের কানা হকারের কাছ থেকে পয়সা মেরে দিয়ে আমি চলে এলাম নিউ জার্সিতে। তারপর রওনা দিলাম হাইওয়ের দিকে। নিজেকে অসম্ভব রকম হালকা আর স্বাধীন মনে হচ্ছিলো। ফিলাডেল ফিয়াতে আমি ঘুরতে লাগলাম টুরিস্টের মতো। আমার খিদে পেয়েছিলো। একটা লোকের কাছে কিছু পয়সা চাইলে সে আমাকে তা দিলো। আমি আর একজন—তারপর আরো একজনের কাছে চাইলাম। স্রেফ মজা করার জন্যে। একটা সেলুনে ঢুকে এক মগ বীয়ার সহ একটা লাঞ্চ সাঁটালাম বিনে পয়সায়। তারপর আবার হন হন করে হাঁটা দিলাম হাইওয়ে বরাবর।

পিটসবার্গের পথে আমাকে একটা লিফ্‌ট দিলো এক ড্রাইভার। লোকটা চাপা স্বভাবের—ঠিক আমার মতো। যেন আমারও একটা ড্রাইভার ছিলো। অবাক হয়ে ভাবলাম, তাই তো, আমি কোথায় যাচ্ছি? আমি কী একটা চাকরী খুঁজছি? না। আমি কি তাহলে নতুন করে জীবন যাপন শুরু করবো? না। আমার কি একটা ছুটির দরকার? না। আমি কিছুই চাইনা।

: তাহলে তুমি কী চাও?—আমি জিজ্ঞেস করলাম নিজেকে। কিন্তু জবাব ওই একই ধরনের, কিছুই না।

বহুদূর যাবার পর ড্রাইভার বললো: এবার আমি বাঁক ঘুরবো। তুমি কোন দিকে যাবে?

: তুমি আমাকে এখানে নামিয়ে দিতে পারো—ধন্যবাদ।
অজানা অচেনা জায়গা। অন্ধকার নেমে এসেছে। কোথাও না কোথাও তো আমাকে যেতেই হবে। কিন্তু শয়ে শয়ে গাড়ি যাচ্ছে—আমার দিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করে। আমার একটা বাড়তি হাত রুমালও নেই। চশমার কাচ মোছা দরকার। অবশ্য কাচ মুছে হবেই বা কি? ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়লাম পথের পাশে খোলা জায়গাতেই। পশুরা বৃষ্টির মধ্যে ঘুমোতে পারে। মানুষ পারবে না কেন? আমি যদি একটা পশু হতাম, তা হলে কোথাও না কোথাও পৌঁছে যেতে পারতাম।
একটা ট্রাক এসে থামলো আমার পাশে।
: তোমাকে একটা লিফ্‌ট দিতে পারি?'
আমি কোনো জবাব না দিয়ে উঠে পড়লাম ট্রাকে। বৃষ্টি নেমে এলো প্রবল ধারায়। এ লোকটা বেশ আলাপী। একটা বড়ো শহরের কাছে লোকটা বললো—'ফিলিতে এসে গেছি আমরা। তুমি এটাকে কোন্ জায়গা মনে করেছিলে?'
: কিছুই মনে করিনি। আমার কোনো ধারনা নেই।
: তুমি অন্ধের মতো পথ হাতড়াচ্ছো মনে হচ্ছে?
: ঠিক বলেছো।
: কিন্তু এভাবে চললে, কোথাও পৌঁছা যায়না। তা জানো। এটা ব্যর্থতারই স্বীকারোক্তি।'
এই লোকটার সঙ্গে কথা বলতে বলতে আমার কাছে আশ্রয়ের চিন্তাটা আবার বড়ো হয়ে উঠলো। মনে হলো, খুপরিটা

খুব খারাপ ছিলোনা। মানুষ বাইরে বেরোয় কেন, কোনো না কোনো প্রয়োজনে। তারা একজন অন্য জনকে ঠকায়, একজন আরেকজনের সঙ্গে ঝগড়া করে, রক্তারক্তি পর্যন্ত গড়ায়। আমার ওসব সমস্যা নেই। আমার একমাত্র সমস্যা নিজের সঙ্গে দিবানিশি যাপন।

কিন্তু আবার ওই খুপরির মধ্যে আমি ফিরে যাবো কীভাবে? কোন্ মুখে? গেলেও, আমাকে সেখানে যেতে হবে একটা কুকুরের মতো ল্যাজ গুটিয়ে। আমি আর তাদের বিরক্ত করবো না। এঁটোকাঁটা যা ছুঁড়ে মারবে, তাই চাটবো খুশি মনে। সে যদি তার প্রেমিকদের বাড়িতে ডেকে আনে এবং আমার সামনেই প্রেম করে তাহলেও কিছু মনে করবো না আমি। যে হাত খেতে দেয়, সে হাতে কেউ কামড়ায় না। গন্তব্য সম্পর্কে ধারনা না-থাকা কিংবা অন্ধকারে বৃষ্টিতে ভেজার চাইতে নিঃশর্ত আশ্রয় অনেক ভালো। অন্তত: আমার একটা মন তো ছিলো। মন আছেও। আর মন থাকলেই চিন্তা শক্তি থাকে। আর কিছু না পারি – চিন্তা তো করতে পারবো। বাইরের লোকেরা অবিরাম ছোটাছুটি করছে। এটা ওটা নাড়াচাড়া করছে, কিনছে, বেচছে, ব্যাঙ্কে টাকা রাখছে—আবার তুলছে। ভয়ানক ব্যাপার! আমি কখনো এসব করতে চাইনা। বরং আমি একটা পশু হিসেবে নিজেকে ভাবতেও রাজি। ধরা যাক—কুকুর। আমার প্রভূ আমার ওপর খুশি থাকলে হাড় টার ছুঁড়ে দেবে, আদর করবে

এমনকি বাইরে পর্যন্ত বেড়াতে নিয়ে যাবে। সেখানে হয়তো বা আমি, একটা মাদী কুকুরও পেয়ে যেতে পারি। এক কোনে এক ছোট্ট ডেরা আমার জন্যে বরাদ্দ হলে ক্ষতি কি ? কিন্তু ওরাও তো বাড়ি ছেড়ে চলে যায়নি ?—এই দুশ্চিন্তা হঠাৎ পেয়ে বসলো আমাকে। আমি যদি ফিরে গিয়ে দেখি বাড়িটা শূন্য ?……

এলিজাবেথের কাছাকাছি কোনো জায়গায় আমরা থাকলাম। ট্রাকের ইঞ্জিনে যেন কী একটা গোলমাল। এ অবস্থায় অন্য একটা গাড়ির তত্ত্ব তল্লাশ করাই বোধহয় আমার জন্যে সুবিধা জনক। নইলে সারারাত আট্‌কে থাকতে হতে পারে। আমি নিকটবর্তী গ্যাস স্টেশনে গিয়ে একজনকে ধরলাম। তার কারে যদি আমাকে সে নিউ ইয়র্ক পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। সে আমাকে তুলে নিলো। ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই আমি শহরে পৌঁছে গেলাম। খুশিতে গুন গুন করে গান গাইছিলাম। আমার গলা ক্রমশঃ চড়ছিলো, যাতে ওরা বোঝে, আমি ফিরে আসছি। যদিও বাড়িতে ঢুকে আমি কখনো গান গাইবোনা। তাহলে ভয়েই মরবে ওরা। গান গেয়ে আমার খিদে পেয়েছে। আমি পথের পাশের একটা ছোট্ট দোকান থেকে এক চাকলা বাদামের বার কিনলাম। দারুন মজা। তারপর একটা ট্রাকে চেপে পৌঁছে গেলাম নিজেদের এলাকায়।

বাড়িটা খা খা করছে। একটা আলোও নেই কোথাও। অবশ্য ওরা বেশ দেরী করেই বাড়ি ফেরে, জানি। আমি

পা টিপে টিপে উপরে উঠলাম। তারা বাড়ির পেছন দিকে নেই তো? কখনো কখনো তারা হেগোরোবুরোর ছোট্ট শোবার ঘরেও বসে। আমি আলতো হাতে দরজা খুললাম। তারপর গিয়ে দাঁড়ালাম সেই ঘরের সামনে। চাপা গলার কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে। আমি খুশি না হয়ে পারলাম না। তারপর আস্তে আস্তে দরজাটা ফাঁক করে সেখানে কান খাড়া করে দাঁড়ালাম। হ্যাঁ—বড়োজন, মানে হেগোরোবুরো কথা বলছে। মনে হয় বদ্ধ মাতাল হয়েছে সে। অদ্ভুত অঙ্গ-ভঙ্গী করে দু'জন জড়াজড়ি করছে। বড়োজন যেন ছোটটাকে জড়িয়ে ধরে উপভোগ করছে। হঠাৎ সে আবেগজড়িত গলায় বলে উঠলো, 'তুমি ওকে এখনো ভালোবাসো। তুমি আমার কাছে মিথ্যা কথা বলেছো!'

: না না! আমি শপথ করে বলছি। আমি তাকে কখনো ভালোবাসিনি।

: মিথ্যে কথা।

: তোমার গা ছুঁয়ে বলছি। কোনোদিন তাকে ভালো বাসিনি আমি। সে ছিলো আমার কাছে একটা শিশু!

একটা চাপা হাসি শোনা গেলো। একটা শীৎকার; তারপর নীরবতা। মনে হয়, এখন তারা চুম্বনাবদ্ধ। ও, তাহলে তারা লেসবিয়ান। আমার হাত থেকে রেহাই পেয়ে সম-কামিনীর ক্ষুধা মেটাচ্ছে নিজেরা নিজেরাই?

আমি আর কিছু শুনতে চাই নি। আমি দরজাটা ভেজিয়ে

দিয়েই বাইরে বেরিয়ে এসেছি। অন্ধকার। আমার ক্ষুধা তৃষ্ণা যেন শূন্যে মিলিয়ে গেছে। আমি এখনই তিন ঘণ্টায় পায়ে হেঁটে সান ফ্রান্সিসকোয় চলে যেতে পারি। আমাকে এক্ষুনি কোথাও যেতে হবে। নইলে আমি পাগল হয়ে যাবো। আমি জানি, আমি একেবারে শিশু নই। জানিনা, আমি পুরো মানুষ হতে পেরেছিলাম কিনা। কিন্তু কোনো ক্রমেই আমি শিশু নই।

বৃষ্টি থেমে গেছে। আকাশে মিট মিট করছে অসংখ্য তারা। মৃদু বাতাস বইছে। এখন আমি কী করবো। কুকুর-জীবন থেকে তো বেরিয়েই এসেছি। বরং এখন বিড়ালের মতোই মনে হচ্ছে নিজেকে। বিড়ালরাই তো শাসন করে রাত্রিকে। তবে?

হাঁটতে হাঁটতে আমার ছেলেবেলার স্কুল-শিক্ষিকার বাড়ির কাছাকাছি এলাম। তিনি বলেছিলেন, তুমি অনেক বড়ো হবে। কিন্তু আমি তাঁর ভবিষ্যৎবানীকে মিথ্যা করেছি। বড়ো হয়ে তাঁর কাছে একদিন হাত পাতলে তিনি আমাকে কিছু দিয়ে-দিলেন ঠিকই; কিন্তু এমন একটা দৃষ্টি নিয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন, যা আমি কখনো ভুলতে পারবো না। যেন আমি বিচরণ করছি নক্ষত্র থেকে নক্ষত্রে। এক ঘণ্টা পরে হঠাৎ বাড়ির কথা মনে হলো আমার। ওরা কি উঠেছে? নাকি জড়াজড়ি করে শুয়ে আছে এখনও? পা টিপে টিপে লাভলেন পেরিয়ে এলাম আমি। সম্ভবতঃ বিপ্লবের সময়েই গলিটার এই নাম দেয়া হয়। কিন্তু কিছুক্ষণ হেঁটে এমন এক বিদঘুটে

জায়গায় এলাম, যার মতো আবর্জনাময় এবং লম্পট অধ্যুষিত রাস্তা শহরে কমই আছে। আশে পাশে কেউ নেই। এক সশস্ত্র ডাকাত হঠাৎ আমাকে হামলা করলো। প্রথমে আমি ঘাবড়ে গিয়ে আঘাত করলে সে রাস্তায় পড়ে গিয়েছিলো। তারপর আমাকে যা মারটাই সে মারলো। ছেঁচা ছেঁচা হয়ে গেলো আমার সারা শরীর। আমার পকেটে সে কিছুই পেলোনা। চিবিয়ে চিবিয়ে বললো, 'মাথা নীচু করে দাঁড়া!' বলার সঙ্গে সঙ্গে রিভলভার বের করে আমাকে গুলি করলো। আমি পড়ে যাবার সময় শুনতে পেলাম তার দৌড়ে পালাবার আওয়াজ। সে অদৃশ্য হবার পরপরই পাহারাঅলা এলো ঘটনাস্থলে। আমার দিকে সন্দেহের চোখে তাকিয়ে বললো: এতো রাত্রে এখানে কি?

আমি অবাক হয়ে ভাবলাম, বরাত জোরে বেঁচে গেছি। গুলিটা লাগেনি! তার এক সেকেণ্ড আগে, সম্ভবতঃ ভয়েই আমি ভূপাতিত হয়েছিলাম। আস্তে আস্তে উঠে আমি বললাম, 'ওহ্, একজন লেখকের ওপর এরকম হামলা। বাবাহ্; একেবারে শেষ করে ফেলেছে। একটু টাট্‌কা হাওয়া খাবার জন্যেই না এতো রাত্তিরে এখানে এসেছিলাম। হায়— পকেটটা একেবারে সাফ করে নিয়ে গেছে! ভাগ্যিস বাপু, তুমি এসেছিলে?'

পাহারাঅলা পকেট থেকে একটা ডলার বের করে আমার হাতে দিয়ে বললো, 'এই নাও, একটা ট্যাক্সি নিয়ে বাড়ি চলে যাও।

আমি বাবা এখন তোমাকে পৌঁছে দিতে পারবো না—আমার সময় নেই।' আমি একটা হোটেলের সামনে থেকে ট্যাক্সি নিলাম। ড্রাইভারকে বললাম, লাভ লেনে চলো। পথে এক জায়গা থেকে এক প্যাকেট সিগারেট ও কিনে নিলাম আমি। বাড়ির আলো নেভানো। কান পাতলাম আমি। না, কোনো শব্দ নেই। অন্ধকারে এক রকম হাতড়াতে হাতড়াতে গিয়ে আমি ঢুকে পড়লাম সেই কুঠরির মধ্যে। বিছানায় কেউ নেই। কাপড় চোপর খুলে শুয়ে পড়লাম। শোয়ার সঙ্গে সঙ্গে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হলাম আমি। স্বপ্ন দেখালামঃ আমি কুকুর হয়ে গেছি। একটা লোক এসে ঘরে ঢুকলো এবং আমাকে লাথি মারলো। সে ভাবলো, এক্ষুনি আমি গর্জন করে উঠবো। কিংবা আমার সামনে রেখে দেয়া হাড়টা ফেলে দিয়ে দৌড়ে পালাবো। কিন্তু আমি বসেই রইলাম।

ঃ উঠে দাঁড়া!—' লোকটা হুকুম দিলো। তারপর পেছনে লুকোনো চাবুক বের করে সামনে আনলো। আমি খুব দুর্বল। নড়তে খুব কষ্ট হয়। আমি এমন একটা দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালাম যেন, সে আমাকে দয়া করে শান্তিতে থাকতে দেয়। এখান থেকে শিগগীর চলে যায়।

ঃ কী হলো? বেরো এখান থেকে?'—বলতে বলতে লোকটা শূন্যে চাবুক তুললো। কিন্তু আমি বেরুবো কি ভাবে। আমার মেরুদণ্ডটাই যে ভাঙ্গা। নড়ে চড়ে বসতেই পারিনা —তো বাইরে বেরুবো! সে তখন আমার মাথার ওপর চাবুক

দিয়ে বাড়ি মারলো। আমি ব্যাথায় কঁকিয়ে উঠলাম। রেগে গর্জনও করলাম। কিন্তু আমার যে উঠবার শক্তি নেই। লোকটা প্রচণ্ড ভাবে চাবুক পেটো করতে লাগলো আমাকে।

অনেক ক্ষন পর। চোখ মেলতেই দেখিঃ দুই রমনী আমার ওপর ঝুকে পড়ে আমাকে ঝাকাচ্ছে। চাবুক তো যথারীতি চলছেই।

: থামো, দোহাই থামো! ঈশ্বরের দোহাই থামো!—বড়ো মেয়েটি বলে উঠলো।

ছোট মেয়েটি বললোঃ 'হা ঈশ্বর! ভ্যাল, কী হয়েছে? ওঠো!'

: কোথায় গিয়েছিলে? কী হয়েছে?'—দু'জন প্রশ্ন করলো সমস্বরে।

: মনে হয় স্বপ্ন দেখছিলাম।' আমি হাসতে চাইলাম। কিন্তু যন্ত্রনায় আমার মুখটা বিকৃত হয়ে গেলো। তারা আমার ভাঙ্গা মেরুদণ্ড এবং সারা শরীরের অজস্র কাটা ছেড়া দেখে আঁৎকে উঠলো।

: কে মেরেছে এমন করে?

আমি মনে করবার চেষ্টা করতে লাগলাম। কিন্তু স্বপ্নটা কেমন যেন অস্পষ্ট, ঝাপসা হয়ে যায় বারবার। মনে করতে পারিনা।

: ওকে ঘুমোতে দাও!—বড়ো মেয়েমানুষটার গলা শুনতে পেলাম।

: আমি অ্যাম্বুলেন্স ডাকি'—বললো অন্যজন।

আমি আবার স্বপ্ন দেখছি। যেন আমাকে নিয়ে আসা হয়েছে কুকুর প্রদর্শনীতে। আমার গলায় একটা নীল ফিতে বাঁধা। পরের সারিতেই আর একটা একই জাতের কুকুর। তার গলায় গোলাপী রিবণ। আমাদের দু'জনের মধ্যেই প্রতিযোগিতা এখন। সবার প্রশ্ন, কে পাবে পুরস্কার? এমন সময় বিচারক এসে আমার কাঁধে তাঁর হাত রাখলেন। আমি জয়ী হওয়ায় বড়ো মেয়েমানুষটা ক্ষেপে গেলো। কিন্তু বড্ড খুশি হলো ছোটজন। আমার ঘাড়ে হাত বুলিয়ে বললো, 'আমি জানতাম, আমার জন্যে প্রথম পুরস্কারটা তুমিই জয় করবে।' সে ফিস ফিস করে বললোঃ 'তুমি এতো চমৎকার জীব!' আমার ঘাড়ে মৃদু টোকা দিতে দিতে ছোট মেয়েমানুষটি আবার বললোঃ 'একটু অপেক্ষা করো লক্ষ্মীটি। তোমাকে দারুণ একটা জিনিষ দেবো আমি!'

একটু পরে একটা টিস্যু কাগজের প্যাকেট হাতে নিয়ে সে এলো। প্যাকেটটা সুন্দর ফিতেয় বাঁধা। ওটা এনেই সে আমার সামনে রাখলো। আমি আমার লুকোনো পা বের করে উঠে দাঁড়িয়ে ঘেউ ঘেউ করে ডেকে উঠলাম।

: ঘেউ ঘেউ ঘেউ!

: হয়েছে হয়েছে, এবার থামো লক্ষ্মীটি!

কিন্তু আমার আর তর সয় না। কী আছে ওই প্যাকেটের মধ্যে। নিশ্চয়ই খুবই মূল্যবান কোনো জিনিষ? সে প্যাকেট

খুলে বস্তুটি হাতে নিয়ে শুনো তুলে বললো : 'ওঠো, ওঠো, উঠে দাঁড়াও…'

আমি লাফাতে শুরু করলাম।

: এখন ভিক্ষে চাও, ভিক্ষে চাও।'

: ঘেউ ঘেউ ঘেউ। আমি খুশিতে যেন ফেটে পড়বো এবার। অবশেষে সেই দুর্লভ বস্তুটি সে আমার চোখের সামনে মেলে ধরলো। আঙুলের হাড়। সেই হাড়ে মজ্জা মাখানো এবং সোনায় বানানো বিয়ের আংটি পরানো। আমি ওটা ওর হাত থেকে ছিনিয়ে নেবার জন্যে প্রাণ পন চেষ্টা চালালাম। কিন্তু সে জিনিষটা উচুঁতে তুলে ধরে রাখলো। কিছুতেই আমার হাতে দেবে না। শেষে—কী আশ্চর্য—মজ্জা-সিক্ত আঙুলের হাড়টা খপ্ করে মুখের মধ্যে পুরেই সে চুষতে লাগলো অবিরাম। চুষতে চুষতে হাড়ের ভেতরে তৈরী হয়ে গেলো একটা গর্ত। সে আংটি সুদ্ধ ওই হাড়টা ছুঁড়ে ফেললো কাঁচা ওলকপির ওপর। বললো: 'এখন, ছোট্ট সোনা আমার। আমি এখন তোমাকে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দেবো।' তারপর আমাকে তুলে নিয়ে সোজা হাঁটা দিলো। সবাই হাত তালি দিয়ে হেসে উঠলো এ দৃশ্য অবলোকন করে।

আমরা দরজার কাছাকাছি পৌছুতেই হাড়টা ছিট্‌কে পড়ে গেলো মাটিতে। আমি তার কোল থেকে লাফিয়ে নেমে যেতে চাইলাম। কিন্তু সে আমাকে তার স্তনের ওপর শক্ত করে

চেপে ধরে রাখলো। আমি গর গর শব্দ করে আপত্তি জানাতে থাকলাম।

: চুপ চুপ!'—সে জিহ্বা বের করে আমাকে চুমো খেয়ে বললো : 'ছোট্ট সোনা জন্তু-মনি আমার!'

ঘেউ ঘেউ ঘেউ ঘেউ!—আমি আহ্লাদে ডেকে উঠলাম ঘেউ ঘেউ ঘেউ ঘেউ!

—০—